উইংস-এর আড়ালে

দেবনারায়ণ গুপ্ত

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা-৭৩

উৎসর্গ

লোকনিন্দা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য উপেক্ষা করে,
অনাহারে অর্দ্ধাহারে থেকেও যাঁরা বঙ্গ
রঙ্গমঞ্চকে তিলে তিলে তিলোত্তমা করে
তুলেছেন, তাঁদের পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

দেবনারায়ণ গুপ্ত

ভূমিকা

উইংস-এর আড়ালে যা ঘটে, যাঁরা অন্তরালবর্ত্তী কেবল তাঁরাই তা দেখতে পান। আমি উইংস-এর আড়ালের মানুষ। সুদীর্ঘ ৩১ বছর অবিচ্ছিন্নভাবে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সেবা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বহু শিল্পীর সংস্পর্শে এসেছি। তাঁদের আনন্দ-বেদনার অংশীদার হয়েছি; আবার যাঁদের দেখার সৌভাগ্য হয় নি, বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রথম এবং মধ্যযুগের এমনতর বহু বিশিষ্ট শিল্পীর কাহিনী আমি শুনেছি। এই দেখা ও শোনা কাহিনীগুলি এক সময়ে 'সাপ্তাহিক বসুমতী' পত্রিকায় 'নটনটীদের বিচিত্রকাহিনী' নামে ধারাবাহিক লিপিবদ্ধ করি। 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমার এই ধরণের আরো কিছু রচনা প্রকাশিত হয়। সেই সকল রচনার একত্রিত ফলশ্রুতি— "উইংস-এর আড়ালে"।

শিল্পকে আমরা মর্য্যাদা দিলেও শিল্পীকে আমরা ভুলে যাই। সেই বিস্মৃতির কবল থেকে, শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশে, একসময়ে এই বিক্ষিপ্ত কাহিনীগুলি রচনা করেছিলাম।

এর মধ্যে 'জোয়ার ভাঁটা' নামক প্রথম কাহিনীটি ছাড়া, আর কোন কাহিনীতেই কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিনি। 'জোয়ার ভাঁটা' কাহিনীটি ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। উক্ত কাহিনীটির ঐতিহাসিক সত্য যথাযথ বজায় রেখে, আমি শুধু স্থান ও কাল সম্পর্কে 'গিরিশচন্দ্র' চিত্রনাট্য রচনাকালে যে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলাম, এখানেও সেইটুকুই নিয়েছি। অগণিত শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সমীপে এর জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি।

॥ জোয়ার-ভাঁটা ॥

থিয়েটার শেষ হয়েছে। গিরিশচন্দ্র মত্ত অবস্থায় থিয়েটার থেকে সোজা গিয়ে উঠেছেন অভিনেত্রীর বাড়ি। পকেটের চাবির গোছা দেরাজের ওপর রেখে টল্‌তে টল্‌তে যেমন এসেছিলেন, তেমনি বেরিয়ে গেলেন। অভিনেত্রী অবস্থা দেখে বেশ শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। ছুটে গেলেন বাধা দিতে। গিরিশচন্দ্র তখন নাগালের বাইরে—রাজ-পথে। অভিনেত্রী হতাশ হয়ে ফিবে আসেন। গিরিশচন্দ্র টল্‌তে টল্‌তে চিৎপুর রোড ধরে তখন চলেছেন বাগবাজারের দিকে। নিস্তব্ধ নিশুতি রাত। দূরে শ্মশানঘাটগুলোয় চিতা জ্বল্‌ছে দাউ দাউ করে। শ্মশানযাত্রীরা চিতাকে ঘিরে বসে আছে। নশ্বর দেহ কতক্ষণে পঞ্চ-ভূতে বিলীন হবে তারই আশায়। দুটো-একটা পান-বিড়ি আর চায়ের দোকান তখনো খোলা আছে শ্মশানযাত্রীদের জন্যে।

দিনের গিরিশ ঘোষ প্রখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা। রাত্রের গিরিশ ঘোষ মদমত্ত প্রমত্ত। গিরিশচন্দ্র সোজা এসে উঠলেন বাগবাজারের ঘাটে। ভাড়া করলেন একটা পানসি।

মাঝিদের হুকুম করলেন—চল্‌ দক্ষিণেশ্বর। মাঝিরা চেনে গিরিশ ঘোষকে, জানে গিরিশ ঘোষের প্রকৃতি তারা ভালোভাবেই। সংকোচে বলে, বাবু, এখন উজানে বেয়ে যেতে হবে।

গিরিশ ঘোষ উত্তর করেন—পানসি ছাড়, উজানেই ত যেতে চাই।

মাঝি বলে, দেবেন বাবু পুষিয়ে।

গিরিশচন্দ্র বলেন, দেব বৈকি, উজানে যাবি জোয়ারে স্রোতের মুখে ভেসে আসবি। যাওয়ার কষ্ট আসায় পুষিয়ে দেব। নে চল্‌।

বদর, বদর।

মাঝিরা নৌকো ছাড়ে, উজানে দাঁড় বেয়ে চলে—দক্ষিণেশ্বরে।

চতুর্দশীর একফালি চাঁদ আকাশে, আর তাকে ঘিরে অসংখ্য তারার মেলা। গঙ্গাবক্ষে ছপ্ ছপ্ করে দাঁড় বেয়ে চলেছে—পান্‌সি। গিরিশচন্দ্রের আর সবুর সইছে না। মধ্যে মধ্যে মাঝিদের তাড়া দিচ্ছেন, কি রে, নৌকো চলে না কেন?

মাঝিরা বলে, উজানে যাওয়া।

দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরের সংলগ্ন বাঁধা ঘাট। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ, শুধু ঘাটের ওপরে সিঁড়িতে কোঁচার কাপড়টা কাঁধে ফেলে কে যেন হাতে তালি দিয়ে নেচে নেচে গাইছেন—

'সুরা পান করিনে আমি
সুধা খাই, জয় কালী বলে—'

এরই মাঝে মাঝিদের দাঁড় ফেলার আওয়াজে গান থেমে যায়। গায়ক আপন মনে হাসতে থাকেন।

নৌকো ততক্ষণে ঘাটে এসে ভিড়েছে। মত্ত গিরিশ টল্‌তে টল্‌তে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকেন।

ওপরের সিঁড়ি থেকে গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে আওয়াজ ভেসে আসে,—কি রে শালা! এত রাত্তিরে? জ্বালাপোড়া ধরেছে বুঝি?

গিরিশচন্দ্র বলেন—না, তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এলাম।

—কি কথা?

—তোমাকে আমার ছেলে হতে হবে।

—তোর ছেলে হবো? বলিস্ কি রে শালা?

—কেন, ছেলে হতে আপত্তি কি?

—তোর ছেলে হবো কি রে! জানিস, আমার বাবা কি রকম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন?

—হ্যাঁ, ভারী আমার নিষ্ঠাবানের ব্যাটা! তোমার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি যে, তোমাকে আমার ছেলে হতে বলেছিলাম।

গিরিশচন্দ্র যেমন এসেছিলেন, সেইভাবেই টল্‌তে টল্‌তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে সোজা এসে উঠলেন পানসিতে। পানসি ছেড়ে দিল।

গিরিশচন্দ্র উজানে এসে, এবার স্রোতের মুখে গা ভাসালেন। সিঁড়ির ওপর্রের মানুষটি তখন স্তম্ভিত, চিন্তিত! গিরিশ কি শুধু এই কথা ক'টা বল্‌বার জন্যে এসেছিল? গিরিশ চরিত্রহীন নটো, মোদ-মাতাল, কিন্তু একি তার বিচিত্র খেয়াল! কেন ও আমার বাপ হতে চায়? ওকি বয়সে বড় বলেই—

পরের দিন সকাল। রাতের মানুষটির মুখে আজ আর হাসিখুশি নেই, শেষের রাতটুকু তার দেহমনের ওপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে। কারুর সঙ্গে আজ তিনি তেমন প্রাণ খুলে কথা কইছেন না।

ভক্তরা জিজ্ঞাসা করে—তাঁর এ ভাবান্তরের কারণ কি? একে একে প্রশ্ন কবেন দেবেন, সুরেন, আরও কত ভক্তজন। গতকাল রাত্রের সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন ভক্তদের কাছে। ভক্তরা চটে যান।

কেউ বলেন, ওকে আর এখানে আসতে দেওয়া হবে না। তোমাকে এত বড় কথা বলবারও সাহস পায় ঠাকুর?

কেউ বলেন, নেটো মাতাল তার আর কত ভাল হবে?

কেউ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুযোগ করে বলেন, আপনার আস্কারাতেই ও এত বড় কথা বলতে সাহস পায়। আপনি আবার ওকে ভৈরব বলেন?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের অনুযোগের মাঝেই রাম দত্তকে বলেন, কিরে রাম, তুই চুপ করে আছিস কেন? কিছু বল্‌ছিস না যে?

রাম দত্ত বলেন—কি আর বলবো?

—কেন, গিরিশ আমায় বাপ-চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে গালাগালি দিয়ে গেল, তা শুনেও তুই চুপ করে থাকবি?

—গিরিশ অন্যায় আর কি বলেছে?

—সে কিরে! অন্যায়-নয়? বাপ-তুলে গালাগালি দিয়ে গেল—

—তা কি করবে? তুমি তাকে যা দিয়েছো, সে তাই তোমায় দিয়ে গেছে।

—তার মানে?

—শ্রীকৃষ্ণ কালীয় নাগকে একদিন ভৎর্সনা করে বলেছিলেন, তোমার কি ছোবল্ মেরে বিষ ঢালা ছাড়া আর কোন কাজ নেই ? উত্তরে কালীয় নাগ বলেছিল, কি করবো ঠাকুর, তুমি বিষ দিয়েছ, তাই তো বিষ ঢালি।

রাম দত্তর কথায় দয়াল ঠাকুরের মুখ খুশীতে ভরে যায়। বলেন—বেশ বলেছিস রাম, বেশ বলেছিস্। চল্ তোর গাড়ি করে এখুনি গিরিশের বাড়ি যাই। সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ঠাকুর ওঠেন রাম দত্তর জুড়ি-গাড়িতে। গাড়ি ছেড়ে দেয়। গিরিশের পানসির মতই গাড়ি ছুটে চলে—বাগবাজারের দিকে।

জোয়ারের জলে গা ভাসিয়ে আসা গিরিশের মনে এখন ভাঁটার টান। গতরাত্রে নেশার ঘোরে তিনি এ কি গর্হিত কাজ করেছেন!

গিরিশজায়া প্রমদাসুন্দরী স্বামীকে ভৎর্সনা করে বলেন—নেশা করলে কি কোন জ্ঞানই থাকে না তোমার ? একি করলে ? যাও, ঠাকুরের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে এসো। নইলে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে আজ থেকে আমি আর জলস্পর্শ করবো না।

সহসা বাইরে থেকে ঠাকুরের কণ্ঠ ভেসে আসে—গিরিশ আছিস্ ?

গিরিশচন্দ্র প্রমদাসুন্দরী চমকে ওঠেন। এ কার কণ্ঠ ? নীলকণ্ঠ কি স্বয়ং নরাধমকে ক্ষমা করতে এলেন ?

সব সংশয় ঘুচিয়ে সত্যি সত্যি সপার্ষদ ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন গিরিশের কাছে। আর গিরিশচন্দ্র তখন ঠাকুরের পদতলে লুটিয়ে পড়েছেন। অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে—গিরিশের গণ্ড বেয়ে। দয়াল ঠাকুর গিরিশকে বুকে তুলে নেন। পিতাপুত্রের অপূর্ব মিলনে সেদিন গিরিশচন্দ্রের বাগবাজারের বোস পাড়া লেনের বাড়িটি চিহ্নিত হয়ে থাকলো অনন্তকালের ইতিহাসে।

॥ মুক্তি ॥

ঠাকুরের স্নেহ-সান্নিধ্যে ও আশীর্বাদলাভের পর গিরিশচন্দ্রের চাওয়া-পাওয়ার আর যেন কিছু বাকী নেই। এখন সব সময়েই ঠাকুরের কাছে কাছে থাকার তাঁর প্রবল বাসনা। একদিন মুখ ফুটে ঠাকুরকে বলে ফেল্‌লেন—তোমায় পেয়েছি, এখন আর ও সব করা কেন? উত্তরে ঠাকুর বলেন—না রে না, থিয়েটারের কাজই তোকে করতে হবে। ও কাজ ভাল। জমি ভালভাবে পাট করতে পারলে, তাতে যা রুইবি, তাই ফল্‌বে।

ঠাকুরের আদেশে গিরিশচন্দ্রের থিয়েটাবের কাজ ছাড়া আর সম্ভব হয় না। মানুষের মনের জমির পাট করার কাজে তাঁকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত লেগে থাকতে হয়। তাই ঠাকুরের দেহাবসানের পরেও প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল থিয়েটারের কাজ করেন গিরিশচন্দ্র। শেষ জীবনে গিরিশচন্দ্রের মুখে একটি কথা যখন তখন শোনা যেত, ঠাকুর যা করাচ্ছেন, তাই করছি। ঠাকুর যা করাবেন, তাই হবে। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনি ঠাকুরের ওপরেই ছেড়ে দিয়ে নির্লিপ্ত ছিলেন।

ঠাকুরের দেহাবসানের কয়েক বছর পরে গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয়া স্ত্রী প্রমদাসুন্দরীর গর্ভে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে শিশু পুত্রটি রোগে ভুগতে থাকে। নানান চিকিৎসা এবং দৈব করেও ছেলেটিকে রোগমুক্ত করা সম্ভব হচ্ছিল না। বছর আড়াইয়ের ছেলে না পারে সোজা হয়ে বসতে দাঁড়াতে, না পারে ভালভাবে হামা দিতে। কথা বলার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তবুও ছেলে কথা বলে না। রুগ্ন ছেলেটিকে নিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়লেন গিরিশচন্দ্র। নিজের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ওপর খুব বিশ্বাস ছিল।

পাড়া প্রতিবেশীকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধও দিতেন তিনি। তাই ইউনিয়ান সাহেবকে নিয়ে এসে ছেলের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কোন ফলই হোল না। সপরিবারে ছেলেকে নিয়ে গেলেন দেওঘরে—বায়ু পরিবর্তনের জন্যে। সেখানে গিয়েও ছেলের স্বাস্থ্যর কিছুমাত্র পরিবর্তন হোল না।

মাঠাকরুণ শ্রীশ্রীসারদাদেবী এসেছেন, কাশীপুরের বাগানে। প্রমদাসুন্দরী ছেলেকে নিয়ে গেলেন মাঠাকরুণের কাছে। প্রমদা-সুন্দরীর বিশ্বাস, মাঠাকরুণের পায়ের ধুলো ছেলের মাথায় পড়লে, ছেলে তাঁর ভাল হয়ে যাবে।

কাশীপুরের বাগানে সেদিন ভক্তজনের মেলা। প্রমদাসুন্দরী রুগ্ন ছেলেকে কোলে করে এক পাশে বসে আছেন। যে ছেলে মায়ের কোল ছেড়ে কোন সময়েই মাটিতে নামতে চায় না, সেই ছেলে আজ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। মায়ের কোলে আর থাকতে চায় না। বায়না ধরে, অস্থির করে তোলে মাকে। প্রমদাসুন্দরী মাটিতে বসিয়ে দেন ছেলেকে। কিন্তু এ কি! যে ছেলে নড়তে পারে না, হামা দিতে গেলে পড়ে যায়, সে কিনা মাঠাকরুণের কোলে গিয়ে উঠে বসেছে! যে ছেলে রোগের যন্ত্রণায় দিবারাত্র কেবল কাঁদে, সেই ছেলের মুখে কিনা আজ হাসি ফুটেছে? আশ্চর্য!

প্রমদাসুন্দরী বাড়িতে ফিরে এসে গিরিশচন্দ্রের কাছে সব কথা জানান। গিরিশচন্দ্র শুনে বলেন—"দয়াল ঠাকুর কোন বাসনাই আমার অপূর্ণ রাখেননি।" গিরিশচন্দ্রের দু'চোখ দিয়ে তখন অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

একদিন সকাল ৯-১০টা থেকে শিশুটি অসম্ভব কান্না শুরু করল। শিশুকে কত রকমে ভোলাবার চেষ্টা করা হোল কিন্তু কিছুতেই আর কান্না থামে না। প্রমদাসুন্দরী কখনও ভাবেন, শিশুর পেট কামড়াচ্ছে, কখনও বা ভাবেন, ক্ষিদে পেয়েছে। বেলা ১২টা বেজে গেল, একভাবেই কেঁদে চলেছে ছেলেটি। ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্র আসেন দুপুরের স্নান

আহার করতে বাড়িতে। ছেলের কান্না দেখে তিনি বিচলিত হ'ন। চেষ্টা করেন ভোলাবার। কিন্তু তাঁরও সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। গিরিশচন্দ্র লক্ষ্য করেন, ছেলেটি কাঁদছে কিন্তু একদৃষ্টে চেয়ে আছে যেন কিসের দিকে। কোন্ দিকে তার দৃষ্টি? গিরিশচন্দ্র লক্ষ্য করেন, দৃষ্টি তার অন্য কোন দিকে নয়,—দেওয়ালে টাঙ্গানো শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবিটির দিকে। ছবির কাছে এগিয়ে যান গিরিশচন্দ্র। দেখেন, ছবিটিকে সারিবদ্ধভাবে পিঁপ্ড়ে ঘিরে রয়েছে। গিরিশচন্দ্র জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ডেকে বলেন—ছবিটাকে নামিয়ে পিঁপ্ড়ের চাক্‌টাকে ভেঙ্গে দে ত' দানী। দানীবাবু ছবিটিকে নামান, দেখেন ছবির পিছনে একটা টিক্‌টিকি মরে রয়েছে আর তাকে ঘিরে অসংখ্য পিঁপ্ড়ে।

পিঁপ্ড়ের চাক্‌টাকে ভেঙ্গে দিয়ে, ঝেড়ে মুছে ছবিটাকে যথাস্থানে টাঙ্গিয়ে দিতেই ছেলের কান্না থেমে যায়। গিরিশচন্দ্র শিশুকে বুকে চেপে ধরেন, চোখে তখন তাঁর অশ্রু টল্‌মল্ করছে।

এর কিছুদিন পরে বিশ্ব-জয় করে ফিরে এলেন স্বামী বিবেকানন্দ। কথা প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র স্বামীজীকে বললেন—দেখ নরেন, ঠাকুরের কাছে আমি যা চেয়েছিলাম, সবই পেয়েছি। নেশার ঘোরে ঠাকুরকে একদিন সন্তানরূপে পেতে চেয়েছিলাম, ঠাকুর সে আশাও আমার পূর্ণ করেছেন। কিন্তু বাপ হয়ে সন্তানের রোগ-যন্ত্রণা এ আর আমি সহ্য করতে পারছি না। বহু চিকিৎসা, বহু চেষ্টা আমি করেছি কিন্তু ছেলেকে সারিয়ে তুলতে পারছি না। তুমি ওর কানে সন্ন্যাস-মন্ত্র দাও, ও মুক্তিলাভ করুক। গিরিশচন্দ্রের কথা শুনে স্বামীজী চমকে ওঠেন। বলেন—তুমি কি বলছ জি.সি.? শিশুর কানে সন্ন্যাস-মন্ত্র দেব?

—ও সামান্য শিশু নয়, ও গৃহীর সংসারে—সন্ন্যাসী। ভোগীর সংসারে—যোগী। ওকে মুক্তি দিয়ে, আমায় তুমি মুক্ত করো। কথা ক'টি বলে গিরিশচন্দ্র দ্রুত বাড়ির মধ্যে চলে যান এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই শিশুকে নিয়ে ফিরে আসেন।

স্বামীজীর কোলে শিশুকে তুলে দেন। স্বামীজীর দু'টি গণ্ড বেয়ে

অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তিনি বলেন—তুমি কি মনে কর জি. সি., আমি সন্ন্যাসী বলে আমার শরীরটাও প্রস্তরে গড়া? স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা, এসব কি আমার কিছুই নেই? এ দেহটা কি আমার রক্ত-মাংসে গড়া নয়?

গিরিশচন্দ্র তখন কাঁদছেন, তাঁর মুখে তখন একটি মাত্র কথা—ওকে মুক্তি দিয়ে, আমায় মুক্ত কর নরেন। তোমার দু'টি পায়ে পড়ি।

অনন্যোপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত স্বামীজীকে সন্ন্যাস-মন্ত্র শোনাতে হয় শিশুর কর্ণে। এব কয়েকদিন পরে চিরমুক্তি লাভ কবে শিশুটি।

॥ জরিমানা মকুব ॥

অমর দত্ত মহাশয় তখন স্টার থিয়েটারের মালিক, প্রযোজক ও পরিচালক। সে যুগে অমর দত্ত মহাশয় দিকপাল অভিনেতা ছিলেন। শুধু অভিনেতা হিসাবেই তিনি জনপ্রিয় ছিলেন না, নাট্যকার হিসাবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। রঙ্গালয় পরিচালনার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সুদক্ষ। নাটককে লোকপ্রিয় করে তোলার জন্যে একাধারে তিনি যেমন বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন, অপর দিকে তেমনি থিয়েটারের ব্যবসার প্রসার কল্পে নানারকম প্রাচীর-পত্র, হ্যাণ্ডবিল, দর্শকদের মধ্যে উপহার সামগ্রী বিতরণের ব্যবস্থা করে, জনসাধারণকে থিয়েটারের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা কবে গেছেন। অমরবাবুই সর্বপ্রথম নাটক ও নাট্য-মঞ্চ সম্পর্কে 'নাট্যমন্দির' নামক মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। সেদিন তাঁর এই সকল প্রচেষ্টা সার্থক না হলেও, পরবর্তীকালে সেগুলি যে সর্বাংশে সার্থক হয়েছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

থিয়েটারের অধ্যক্ষ হিসাবে অমরবাবু অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক ব্যক্তি ছিলেন। কোন বিষয়ে ব্যতিক্রম হওয়ার উপায় ছিল না।

তখনকার দিনে প্রত্যেক থিয়েটারের দু'একখানা করে নিজস্ব ঘোড়ার গাড়ি থাকত। সেই গাড়িতে করে অভিনেত্রীদের থিয়েটারে নিয়ে আসা হোত। সহিস-কোচ্‌ম্যানদের উপর অমরবাবুর হুকুম ছিল, মেয়েদের থিয়েটারে নিয়ে আসা বা বাড়িতে পৌঁছে দেবার সময় গাড়ির দরজা পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে হবে এবং থিয়েটারের সাজঘরের দরজায় গাড়ি এসে দাঁড়ালে, মেয়েরা একগলা ঘোম্‌টা দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে সোজা সাজঘরে চলে যাবে।

সেদিন জন্মাষ্টমী। সন্ধ্যা ৭টা থেকে সারারাত্রিব্যাপী অভিনয়। বুকিং-এর অদূরে লবীতে ইজিচেয়ারে বসে আছেন অমরবাবু। আর ঘণ্টা দেড়েক বাদেই অভিনয় আরম্ভ হবে। লবীতে বসেই অমরবাবু লক্ষ্য করলেন, কয়েকজন অভিনেত্রীকে নিয়ে থিয়েটারের গাড়ি এলো। কিন্তু এ কি! গাড়ির দরজা খানিকটা খোলা! তখুনি সরকারকে ডেকে সহিস-কোচ্‌ম্যানের নামে আট আনা করে খাতায় খরচ লিখতে হুকুম করলেন।

মাস কাবারে সহিস-কোচ্‌ম্যান মাইনে নিতে গিয়ে দেখে, তাদের মাইনের টাকা থেকে আট আনা করে কাটা হয়েছে। সরকারকে জিজ্ঞাসা করে তারা সদুত্তর পায় না। শেষে তারা হাজির হয় অমরবাবুর কাছে। অমরবাবু জানান, জন্মাষ্টমীর দিন মেয়েদের গাড়ির দরজা খুলে আনা হয়েছিল বলে, আট আনা করে জরিমানা করা হয়েছে। সহিস-কোচ্‌মান জানায়, গাড়ির দরজা তারা খোলেনি। সম্ভবত মেয়েরা খুলে থাকবে। অমরবাবু বলেন, মেয়েরা যদি সেকথা স্বীকার করে, তা'হলে তাদের জরিমানা অবশ্যই মাফ্‌ করা হবে। সহিস-কোচ্‌ম্যান ফিরে যায়।

পরের অভিনয় তারিখে মেয়েদের কাছে সহিস-কোচ্‌ম্যান তাদের জরিমানার কথা জানায়। মেয়েরা দলবদ্ধভাবে অমরবাবুর কাছে এসে বলে, গাড়ির দরজা খোলার জন্যে সহিস-কোচ্‌ম্যান দায়ী নয়। দায়ী তারা।

অমরবাবু মেয়েদের বলেন, কেন তোমরা গাড়ির দরজা খুলে এসেছিলে?

—বড্ড গরম হচ্ছিল।

—সাজ-পোশাক পরে স্টেজে যখন অভিনয় করো, তখন গরম হয় না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তা হয় বৈকি।

—তবে? এখান থেকে এইটুকু আসতে এত গরম লাগ্‌লো—যে গাড়ির দরজা না খুললে চল্‌ছিল না?

—আর এমন কাজ কোনদিনই আমরা করব না।

—গাড়ির দরজা কেন বন্ধ করে তোমাদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছি জান? রাস্তার লোক হামেশাই যদি তোমাদের দেখতে পায়, তাহলে তোমাদের দেখার জন্যে তারা পয়সা খরচ করে থিয়েটারে আসবে কেন? তাছাড়া তোমাদের স্বাভাবিক চেহারার ওপর রং চড়িয়ে সাজ-পোশাক, গয়না-গাঁটি পরিয়ে ফুট্‌লাইটের সামনে আমরা ছেড়ে দিই। যাঁরা এখানে পয়সা খরচ করে থিয়েটার দেখতে আসেন, তাঁরা তোমাদের এ চেহারা দেখলে আর কোনদিনই থিয়েটারের দরজা মাড়াবেন না। যাও—এমন কাজ তোমরা আর কখনও করবে না।

মেয়েরা লজ্জায় মাথা নীচু করে চলে যায়। সহিস-কোচ্‌ম্যানের জরিমানা মাফ্‌ করে দেন অমরবাবু।

॥ টিকিট অমনি বেচলেই হোল? ॥

১৯১১ সাল। স্টার থিয়েটারে 'বাজীরাও' নাটক খুব নাম করেছে। স্থানাভাবে দর্শক ফিরে যাচ্ছে। অমর দত্তের অভিনয়ের সুখ্যাতি লোকের মুখে মুখে। যেদিন 'বাজীরাও' নাটক খোলা হয়, সেই দিনই মোহনবাগান ক্লাব আই. এফ. এ শীল্ড লাভ করে। অমরবাবু তার পরের শনিবারের থিয়েটারের বিজ্ঞাপনে লেখেন 'Mohan Bagan has won the Shield, Baji Rao has gained the victory.' বিজ্ঞাপনে ও-কথা লেখার অবশ্য একটু তাৎপর্য ছিল।

'বাজীরাও' নাটকের সেদিন উদ্বোধন হওয়ার কথা ছিল সাড়ে আট-টায়। সাড়ে সাতটা বেজে গেল তখন পর্যন্ত মাত্র কয়েকজন দর্শক টিকিট কিনেছেন। অমরেন্দ্রনাথ মুষড়ে পড়েছেন। কিন্তু সহসা সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে, আই. এফ. এ শীল্ড পাওয়ার আনন্দে সমস্ত প্রেক্ষাগৃহটি দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়—সেই প্রথম রাত্রির অভিনয়েই 'বাজীরাও' দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসাও অর্জন করলো।

এই 'বাজীরাও' নাটক চলাকালীন একদিন সকালে অমরেন্দ্রনাথ বুকিং-এর অদূরে ইজিচেয়ারে বসে কাগজ পড়ছেন। মধ্যে মধ্যে দু'একজন দর্শক আসছে, বুকিং অফিস থেকে অগ্রিম টিকিট কিনে নিয়ে চলে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে একজন দর্শক টিকিট কিনতে এলো। তার পরণে হাঁটুর ওপর তোলা ময়লা ধুতি, গায়ে সন্ত কেনা ধোপ্-দুরস্ত একটা ফতুয়া, কাঁধে তেলচিটে একটা গামছা। অমরবাবু আড়চোখে লক্ষ্য করলেন, লোকটি বেশী দামেরই একটি টিকিট কিনে নিয়ে গেল। অমরবাবু বুকিং-ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করলেন—লোকটাকে কত দামের টিকিট বিক্রী করলে হে?

—আজ্ঞে পাঁচ টাকার।

বুকিং ক্লার্কের উত্তরে অমরবাবু বেশ বিচলিত হয়ে পড়েন। চীৎকার করে দারোয়ানকে ডাকেন। দারোয়ান কাছে এসে হাজির হয়। অমরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে, যে লোকটি টিকিট কিনে নিয়ে গেছে তাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলেন,—ওকে ডেকে নিয়ে এস।

দারোয়ান ছুটে চলে যায়। অমরবাবু যথারীতি চেয়ারে এসে বসেন। বুকিং ক্লার্ক সবিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকে।

লোকটি ততক্ষণ হাতীবাগান বাজারে ঢুকে গেছে। দারোয়ান লোকটিকে গিয়ে ধরে এবং ডেকে নিয়ে এসে হাজির করে অমরবাবুর সামনে।

অমরবাবু সস্নেহে লোকটিকে জিজ্ঞেস করেন,—ক'টাকার টিকিট কিন্‌লে বাবা?

—আজ্ঞে পাঁচ টাকার।

—এত দাম দিয়ে টিকিট কিন্‌লে কেন?

—আজ্ঞে, এর আগে এক টাকার টিকিট কিনে দেখেছি দু'বার।

—এবারই বা এক টাকার টিকিট কিন্‌লে না কেন?

—আজ্ঞে ভাবছি, কাছ থেকে ভাল করে দেখবো, শুন্‌বো।

—দূর থেকে কি ভাল করে দেখতে শুন্‌তে পাওনি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, তা পেয়েছি বৈ কি!

—তবে?

—আপনাকে আরও কাছ থেকে দেখতে চাই।

—এখন তুমি আমায় যত কাছে দেখছো, তখনও ত' তুমি আমায় তত কাছে থেকে দেখতে পাবে না।

—তা হয়ত পাবো না। কিন্তু তখন তো 'বাজীরাও'-এর সাজ-পোশাকে আপনাকে খানিকটা কাছ থেকে দেখতে পাবো।

অমরবাবু একটা সাদা কাগজের টুক্‌রো টেনে নিয়ে তাতে কি লিখে নাম সই করে লোকটির হাতে দিয়ে বলেন—এই কাগজের টুক্‌রোটা দারোয়ানকে দেখালেই সে তোমায় সঙ্গে করে সাজঘরে নিয়ে যাবে। এখন যত কাছ থেকে তুমি আমায় দেখতে পাচ্ছ, তখনও তত কাছ থেকেই তুমি আমায় 'বাজীরাও'-এর বেশে দেখতে পাবে। আমার কথা শোন, দম্‌কা পাঁচ পাঁচটা টাকা খরচ না করে, ও টিকিটটা ফেরত দিয়ে একখানা এক টাকার টিকিট কিনে নিয়ে যাও।

লোকটি খুশী মনে বুকিং কাউণ্টারে গিয়ে দাঁড়াল।

অমরবাবু বুকিং ক্লার্ককে বল্‌লেন—দাও হে! ওকে চার টাকা ফেরত দিয়ে দাও।

লোকটি চারটি টাকা ফেরত নিয়ে, একখানা এক টাকার টিকিট হাতে করে চলে গেল।

অমরবাবুর ব্যাপার দেখে বুকিং ক্লার্ক তো অবাক! সহসা গম্ভীর

কণ্ঠে বুকিং ক্লার্কের উদ্দেশে অমরবাবুকে বল্‌তে শোনা যায় —তোমাদের আক্কেল বিবেচনা কিছুই নেই। টিকিট বললেই অমনি টাকা নিয়ে টিকিট কেটে দাও। বুকিং ক্লার্কেরও টিকিট বিক্রীর একটা সুষ্ঠু জ্ঞান থাকা চাই, বুঝলে।

বুকিং ক্লার্ক বলে—আজ্ঞে কি করবো? ও যে পাঁচ টাকার টিকিটই চাইলে।

—চেয়েছে তা আমিও জানি। কিন্তু চাইলেই যে দিতে হবে তার কি মানে আছে? তোমাদের বিবেচনা-বুদ্ধির অভাবে এখুনি আমরা দু-দু'টো দর্শককে হারাচ্ছিলাম। ওর সাজপোশাক দেখেও কি বুঝতে পারলে না যে, পাঁচ টাকার টিকিট কেন্‌বার মত লোক ও নয়। নিতান্ত খেয়ালের বশেই পাঁচ্‌টা টাকা ও খরচ করে ফেলেছিল। ও যদি ঐ বেশে, চুনোট্‌ করা ধুতি-পাঞ্জাবিপরা দর্শকের পাশে গিয়ে বসতো, তাহলে বাবু দর্শকটিও যেমন স্বস্তি পেতেন না, তেমনি গামছা কাঁধে নিয়ে দর্শকটিরও সঙ্কোচের সীমা থাকতো না। ফলে, পাঁচ পাঁচ টাকা দম্‌কা খরচ করে, ও যেমন পাঁচ বছর আর থিয়েটার মুখো হতো না, তেমনি বাবু দর্শকটিও তেলচিটে গামছার ভয়ে আর সহসা থিয়েটারের দরজা মাড়াতেন না।

॥ ব্যর্থতার বেদনা ॥

১৯৪৬ সালের শেষের দিকে, অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসে একদিন ইন্দ্রপুরী স্টুডিয়োর একটা ফ্লোরে ডি-জি-পিক্‌চার্স-এর 'শেষ নিবেদন' চিত্রের স্যুটিং হচ্ছে। শরৎচন্দ্রের 'আলো ও ছায়া' নামক কাহিনীকে অবলম্বন করে 'শেষ নিবেদন'-এর চিত্র-নাট্য রচিত হয়। আমি তখন ডি-জি-পিক্‌চার্স-এর কর্ণধার প্রবীণ পরিচালক ডি. জি. অর্থাৎ ধীরেন গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহকারী। তাঁর প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চিত্র-নাট্য

রচনা করি, ফ্লোরে শিল্পীদের সংলাপ পড়াই। ধীরেনবাবুর নির্দেশানুসারে কখন কখন পরিচালনার কার্যে সহায়তা করি। যেদিনের ঘটনা বল্‌ছি—সেদিন শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মলিনা দেবী, আশা দেবী, কয়েকজন extra এবং প্রবীণা অভিনেত্রী হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)। হরিসুন্দরী যে ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন, সে ভূমিকাটি তাঁর সে সময়কার বয়সের সঙ্গে অত্যন্ত খাপ খেয়ে গিয়েছিল। ভূমিকাটি ছিল—বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রধানা সেবাদাসী। যিনি আজীবন বৃন্দাবনে থেকে, বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা করে, এখন বৃন্দাবনচন্দ্রের চরণাশ্রয়ের জন্যে দিন গুনছেন।

হরিসুন্দরীর বয়স তখন সত্তরের ঊর্ধ্বে। চোখে কম দেখেন, কানে কম শোনেন। শেষ জীবনে সবাক চিত্রে যে কোন একটি ভূমিকায় অভিনয় করে যাওয়ার তাঁর প্রবল বাসনা। যদিও সবাক চিত্রের গোড়ার যুগে তিনি কয়েকখানি ছবিতে অভিনয় করেছেন, তবুও তাঁর শিল্পী-মন বার্ধক্যেও টেনে এনেছিল স্টুডিয়োর ফ্লোরে।

হরিসুন্দরী একাধারে সু-গায়িকা ও সু-অভিনেত্রী ছিলেন। বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ে তিনি দীর্ঘকাল ধরে সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করে গেছেন। নানারকম চরিত্রে রূপদান করায় তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। এককালে দর্শকদের কাছে তিনি অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছেন। কিন্তু আজ শেষ বয়সে স্টুডিয়োর ফ্লোরে তিনি হতাশায় ভেঙে পড়েছেন। একসঙ্গে চার-পাঁচ লাইন সংলাপও তিনি গোছ করে বলতে পারেন না। বার বার সংলাপ পড়িয়ে শোনাই। বার বার ভুলে যান।

অনেক চেষ্টার পর, যেটি সবচেয়ে বড় সংলাপ সর্বাগ্রে সেটি তাঁকে বার বার বলিয়ে রপ্ত করালাম। প্রথমে শটের সংলাপের মহলা দিয়ে, 'মনিটর' নেওয়া হোল। 'মনিটরের' সময় কথাগুলি ঠিকই বললেন হরিসুন্দরী। শুধু বলা নয়, সেই সঙ্গে তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠল চমৎকার প্রকাশ ভঙ্গি। প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রী আজ বৃদ্ধা, জরাগ্রস্তা হলেও—তিনি যে জাত শিল্পী, তা মনিটরের সময় প্রমাণিত হোল।

আমরা সবাই উৎফুল্ল হলুম তাঁর অভিনয় দেখে। এবার ফাইন্যাল টেক্ অর্থাৎ চিত্রগ্রহণ করা হবে। ডিরেক্টর ডি. জি. উৎসাহের সঙ্গে ঘোষণা করলেন—'কোয়ায়েট এভ্রি বডি'। স্টুডিয়ো চত্বর নিঃশব্দ হলো। বড় বড় আলো জ্বলে উঠ্লো। বৃন্দাবনচন্দ্রের প্রধানা সেবাদাসীর তুলসী-মঞ্চ আলোকিত হয়ে উঠ্ল। পরিচালক ডি. জি. আলোকচিত্র-শিল্পী ও শব্দ গ্রহণকারীকে নির্দেশ দিয়ে বললেন—Start. ক্যামেরা ও শব্দগ্রহণ যন্ত্রে ফিলিমের ফিতা ঘুরতে শুরু করলো। কিন্তু হরিসুন্দরীর মুখ দিয়ে সংলাপ বেরুলো না। রুদ্ধ ব্যথায় ভেঙ্গে পড়লেন প্রবীণা অভিনেত্রী। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠ্লেন। ক্যামেরা ও শব্দগ্রহণের যন্ত্র বন্ধ হোল। আলো নিভে গেল।

ব্যস্তভাবে ছুটে গেলাম প্রবীণা অভিনেত্রীর কাছে, জিজ্ঞাসা করলাম—কি হোল ? অমন করে কাঁদছেন কেন ?

—কথাগুলো ভুলে গিয়েছি বাবা ! বলতে পারলাম না। তোমাদের ফিলিম্ নষ্ট করলাম।

—তাতে কি হয়েছে ? এই ত' খাসা 'মনিটর' দিলেন। ভুলে গিয়েছেন, আবার বলে দিচ্ছি। ঠিক বলতে পারবেন।

—আজ এই ক'টি কথা বলতে গিয়ে ভুল করে বসলাম বাবা ! অথচ একদিন স্টেজের ওপর কত বড় বড় পার্টই না করেছি। আগাগোড়া মুখস্থ থাকতো। Prompter-এর তোয়াক্কা করতাম না।

—তখন আপনার বয়স ছিল, শক্তি ছিল। এখন আপনার বয়সের কথা ভাবুন ? এই বয়সে যে আপনি সাহস করে স্যুটিং করতে এসেছেন, এইটেই ত' আনন্দের কথা, আশ্চর্যের কথা।

যাইহোক, অনেক করে বুঝিয়েসুঝিয়ে বৃদ্ধাকে শান্ত করলাম। সংলাপ পড়িয়ে রপ্ত করলাম। ধীরেনবাবু চুপি চুপি আলোক-চিত্রশিল্পী ও শব্দগ্রহণকারীকে নির্দেশ দিলেন, 'মনিটর' ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা যেন চিত্র ও শব্দগ্রহণ করেন। প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধাকে জানতে দেওয়া হোল না যে, final take করা হচ্ছে। ধীরেনবাবু যথারীতি

'মনিটর' ঘোষণা করলেন। হরিসুন্দরীও প্রথমবারের মনিটরের মত সুন্দর অভিনয় করলেন। শটের শেষে ধীরেনবাবু ঘোষণা করলেন—কাট্।

হরিসুন্দরী বললেন—বাবা এইবার তোমরা তাড়াতাড়ি নিয়ে নাও। এরপর আবার যদি ভুলে যাই।

ধীরেনবাবু বললেন—শট্ নেওয়া হয়েছে, আর ভুলে গেলেও ক্ষতি নেই।

হরিসুন্দরী বলেন—তবে যে বল্‌লে 'মনিটার' ?

ধীরেনবাবু বললেন—হ্যাঁ, মনিটরই বলেছিলাম, কিন্তু ওদের বলে দিয়েছিলাম, আমি 'মনিটর' বল্‌লেও তোমরা ক্যামেরা-সাউণ্ড চালাবে।

ধীরেনবাবুর কথায় হরিসুন্দরীর পাণ্ডুর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। আবার চিত্রগ্রহণ পর্ব শুরু হয়। এবার এক সঙ্গে অভিনয় করেন, আশা দেবী, মলিনা দেবী আর হরিসুন্দরী। আশা দেবী ও মলিনা দেবীর কিছু সংলাপের পর হরিসুন্দরীর দু'একটি মাত্র কথা আছে। চিত্রগ্রহণের সময় হরিসুন্দরী পুনরায় ভুল করে বসেন্ তাঁর সংলাপ। এবার আর হরিসুন্দরী শুধু হাউ হাউ করে কাঁদেন না, সেইসঙ্গে দু' হাতে নিজের মুখ চাপ্‌ড়াতে থাকেন। অনেক করে তাঁকে শান্ত করা হয়।

কুঞ্চিত দু' গণ্ড বেয়ে তখন অঝোর ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে! আর হরিসুন্দরী বলছেন—এভাবে বেঁচে থাকার কোন মানে হয় না, মরাই ভাল, মরাই ভাল।

অনেক করে বুঝিয়ে, আমরা সকলে মিলে তাঁকে শান্ত করি। হরিসুন্দরী বলেন—মরেছি আমি অনেক আগেই। বেঁচে আছি মনে করে এখানে আসাই আমার ভুল হয়েছে।

যাইহোক্, নানারকম কৌশল করে শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধা অভিনেত্রীকে নিয়ে আমরা সেদিনের মতন চিত্রগ্রহণ পর্ব শেষ করেছিলাম। কিন্তু সৃষ্টির ব্যর্থতায় প্রবীণা শিল্পীর যে বেদনা সেদিন আমরা লক্ষ্য করেছিলাম, স্মৃতি-পটে তা আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

॥ ওোজা এঁকে নিগে যা ॥

তুলসী চক্রবর্তী মশাই বাংলার নাট্যামোদীদের চার যুগ ধরে আনন্দ দিয়ে গেছেন। পনের-ষোল বছর বয়েসে তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগদান করেন। বেশ কিছুদিন হোল তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। কি ছায়াছবি, কি রঙ্গ-মঞ্চ, উভয় ক্ষেত্রেই তিনি সমান জন-প্রিয়তা অর্জন করে গেছেন। রঙ্গ-লোকে তিনি ছিলেন একক, অদ্বিতীয়, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তুলসীবাবু ছিলেন জাতশিল্পী। রঙ্গজগতের সঙ্গে দীর্ঘদিন সংশ্লিষ্ট আছি, কিন্তু তুলসীবাবুর মত অমন সর্বগুণসম্পন্ন অভিনেতা আমি দেখিনি। কি হাস্যরস, কি বীভৎস রস, কি করুণ রস, এক কথায় সবরকম রস-সৃষ্টির তাঁর ক্ষমতা ছিল। শুধু তাই নয়, তিনি নাচতে পারতেন, গাইতে পারতেন, বাজাতে পারতেন। এই সদাহাস্যময় মানুষটি ছোট বড় সকলেরই 'দাদা' ছিলেন। অজাত-শত্রু। তাঁর কোন শত্রু ছিল না। বাজিয়ে আসেনি, তুলসীদাকে বলা হোল, বললেন—ঠিক আছে। দেব বাজিয়ে। গাইয়ে আসেনি, বলা হোল—দিলেন গান গেয়ে। তুলসীদা'র সবচেয়ে বড় গুণ ছিল, তিনি মহলায় রীতিমত যোগদান করতেন এবং প্রতিটি ভূমিকা কি ভাবে বলান হচ্ছে, কোন্ চরিত্রের কি রূপ হওয়া উচিত, এ সব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দৃষ্টি রাখতেন; এবং সেইসঙ্গে গানের আসরে বসে গানগুলোও রপ্ত করে রাখতেন। তুলসীদা যখন যে থিয়েটারে কাজ করেছেন, সেই থিয়েটারের পরিচালকেরা অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকতেন। তাঁরা জানতেন, যদি কোন দায়-অদায় ঘটে ত' তুলসীদা যখন আছেন, তখন যাহোক একটা ব্যবস্থা হবেই।

স্টার থিয়েটারেই তুলসীদা'র শিল্পীজীবন শুরু হয়। ইদানীং তুলসীদা প্রায়ই বলতেন—এই থিয়েটারে আমার হাতে খড়ি। এই থিয়েটারেই যেন আমার শিল্পীজীবনের অবসান ঘটে। তুলসীদা'র শেষ জীবনের আশা পূর্ণ হয়েছিল। স্টার থিয়েটারে কাজ করতে

করতেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন।

বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। স্টার থিয়েটারের গ্রীনরুমের লবীতে বসে শিল্পীদের সঙ্গে গল্প করছি। তুলসীদা'ও আছেন। ড্রেসার অর্থাৎ বেশকার এসে জানাল, অমুকবাবুর গেঞ্জিটা ছিঁড়ে গেছে। ওটা পাল্টে দিতে হবে।

বললাম—যদি পরার মত না থাকে ত' পাল্টে দাও।

ড্রেসার জানায়—ছিঁড়েছে সামান্যই, কিন্তু উনি পরতে চাইছেন না।

বললাম—নিয়ে এসো গেঞ্জিটা, দেখি। ড্রেসার গেঞ্জি নিয়ে আসে। দেখলাম, সামান্য একটু ছিঁড়েছে। ওটুকু ছেঁড়া বা ঐ রকম ছেঁড়া গেঞ্জি আমরা অনেকেই পরে থাকি। তাই একটু বিরক্তভাবেই বললাম—ঐটুকু ছেঁড়া আর পরা যায় না? গেঞ্জির ওপরে সার্ট, তার ওপর কোট চাপবে। যাও, ঐ গেঞ্জিই পরতে বলোগে—।

ড্রেসার ভয়ে ভয়ে জানায়—আজ্ঞে ওঁকে ত' জানেন, বড্ড রাগারাগি করেন। আপনাকে কিছু বলবেন না, কিন্তু আমাদের গালাগালি করবেন।

ড্রেসার বড় মিথ্যে বলেনি। সত্যিই। বড্ড বদমেজাজী শিল্পী। কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলতে হোল—তাহলে দাও একটা নতুন গেঞ্জি।

ড্রেসার চলে গেলে তুলসীদা সহসা বলে উঠলেন—চাইলে যখন পায়, তখন চাইবে না কেন?

—কিন্তু না দিয়ে উপায় কি? সামান্য ব্যাপারে চেঁচামেচি আমার ভাল লাগে না তুলসীদা।

—আমি যখন থিয়েটারে ঢুকেছি ভাই, তখন টুঁ শব্দটি করার উপায় ছিল না। গেঞ্জি ত' দূরের কথা, কত দিন আমরা মোজা এঁকে নিয়ে স্টেজে নেমেছি।

—মোজা এঁকে নিয়েছেন? সে কি!

—হ্যাঁ ভাই, তাহলে বলি শোন। সেদিন থিয়েটারের গেঞ্জি

দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। ফতুয়া বা গেঞ্জি, যে যা পরে আসতো, তারই ওপরে সাজ-পোশাক চাপাতে হতো। যাঁরা বড় অভিনেতা ছিলেন, তাঁরা অবশ্য মোজা পেতেন। আর আমাদের মত যারা অর্থাৎ গ্রামবাসী কি সৈনিক সাজি বা কোরাসে গান গাই, তাদের সকলকেই মোজা এঁকে নিতে হোত। আজকের মত সেদিন মেক্-আপের রঙ্ বা সাজ-সরঞ্জামও ছিল না। ভুসোর কালি, সবেদা আর লাল আলতা, আমাদের ভাগ্যে এই জুটতো। আর যাঁরা বড় অভিনেতা ছিলেন, তাঁদের জন্যে বিলাতী পাউডার বা বড়জোর একটা চোখ আঁকা পেন্সিল্ জুটতো। আর সেই সঙ্গে রঙ তোলার জন্যে ছিল নারকেল তেল। রুজ-লিপ্স্টিক্ এসবের নামই আমরা শুনিনি তখনও। এখন তোমাদের হয়েছে রঙ্ তোলার ক্রীম, রঙ্ মাখার ক্রীম। কত রকমের তুলি বুরুশ—

—হ্যাঁ তা ত' হয়েছে। এখন মোজা আঁকলেন কি করে তাই বলুন।

—হ্যাঁ সেই কথাই এইবার বল্‌বো। একদিন থিয়েটারে এসে শুনি, একজন মাঝারি রকমের শিল্পী আসেননি। দু'টো সিনে কিছু কথা আছে। তাঁর পার্টটা আমাকে করতে হবে। কতদিন পরে একটা chance এসেছে। মহা উৎসাহ। তাড়াতাড়ি হেড্ ড্রেসারের কাছে গিয়ে জানালাম, অমুক লোক আজ আসেনি, তার জায়গায় আমায় সাজতে হবে। জুতো, মোজা, সাজ-পোশাক আমাকে দাও। বৃদ্ধ হেড্-ড্রেসার সকলেরই শুধু দাদা নন, গার্জেনও।

সাজ-পোশাক আর জুতো-মোজার কথা শুনে তিনি ত' গর্জে উঠ্‌লেন। বললেন—এগার টাকার এ্যাপ্রেন্টিস্, চল্লিশ টাকা মাইনের আর্টিস্ট্-এর সাজ-পোশাক, জুতো, মোজা পরতে এসেছিস্? যা যা, এ্যাপ্রেন্টিস্-এর ঘরের সাজ পরে, মোজা এঁকে নিগে যা। হেড্-ড্রেসারের কথাগুলো শুনে মনে বড় কষ্ট হোল। Chance যদিও বা পেলাম কিন্তু ভাল সাজ-পোশাক পেলাম না। ফিরে এলাম

নিজেদের সাজঘরে অর্থাৎ এ্যাপ্রেন্টিস্‌দের ঘরে। যা সাজ-পোশাক পেলাম তাই পরে, পুরু করে সবেদা গুলে, হাঁটু থেকে পায়ের চেটো পর্যন্ত লাগালাম। তারপর পায়ের ডিমের ওপর লাল আল্‌তা দিয়ে বর্ডার এঁকে নিলাম। ব্যাস্‌! মোজা হয়ে গেল।

তুলসীদা'র কথা শুনে লবীতে যাঁরা বসেছিলেন সকলেই হেসে উঠলেন। তুলসীদা বললেন—আজ একথা শুনে তোমরা হাসছ বটে, কিন্তু থিয়েটারের সেদিনগুলো যে আমাদের কি ভাবে কেটেছে, তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।

॥ হকিমের বিপদ ॥

সেদিন ছিল থিয়েটারের দিন। অভিনয় চল্‌ছে। ওপর থেকে কি কাজে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নাম্‌ছি, সহসা মঞ্চের অভ্যন্তর অন্ধকার হয়ে গেল। বুঝলাম, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাবার জন্যে মঞ্চ ঘুরছে। একটু থেমে অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে লবীর দিকে এগিয়ে গেলাম। দেখি, রিভল্‌ভিং মিউজিকের তালে তালে তুলসীদা অর্থাৎ তুলসী চক্রবর্তী মশাই নাচছেন। আর তাঁর সেই নাচ অন্যান্য শিল্পীরা পরমানন্দে উপভোগ করছেন।

মঞ্চের আলো জ্বলে উঠ্‌লে জিজ্ঞাসা করলাম—কী তুলসীদা, ব্যাপার কি?

তুলসীদা মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন—একটু নাচছিলাম ভাই, সবরকম প্র্যাকটিস্‌ রাখা ভাল। নাচ তো ভুলেই গেলাম। নাচগানের তো নাটকই হয় না আজকাল। বুঝলে ভায়া, কসরতি ব্যাপারে আজকাল আর কেউ এগোতেই চায় না। সব কিছুই ক্রমশ হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। আমাদের চড়-চাপড় খেয়ে এ কাজ শিখ্‌তে হয়েছিল।

—সে কি দাদা, চড়-চাপড়ও দিত না কি?

—দিত না আবার! চড়-চাপড় গালাগালি কত কিছুই না সহ্য করতে হয়েছে আমাদের। একদিন তো মার খাবার ভয়ে, হকিম সেজে গোঁফ, দাড়ি, পরচুল নিয়ে এই স্টার থিয়েটার থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম।

—সে কি! পালিয়ে গিয়েছিলেন? কেন?

—সে এক কাণ্ড করে বসেছিলাম। তাহলে বলি শোন, সেদিন ছিল 'দুর্গেশনন্দিনী' অভিনয়। আমার বিশেষ কোন পার্ট ছিল না। দু-একটা জায়গায় সৈন্য সেজে বেরুই। সেদিন এসে শুনি, যিনি হকিমের ভূমিকায় অভিনয় করেন, তিনি আসেননি। হুকুম হোল, আমায় হকিম সাজতে হবে। মহা উৎসাহে হকিমের যা কিছু সামান্য সংলাপ ছিল, তা বার বার পড়ে মুখস্থ করে ফেল্লাম। তারপর হকিমের সাজ-পোশাক পরে প্রস্তুত হয়ে রইলাম। সেদিন আয়েষা করছিলেন তারাসুন্দরী আর জগৎ সিংহ তারক পালিত। তারক পালিতকে সকলে 'পালিত সাহেব' বলতো। বিডন স্ট্রীট পোস্ট অফিসে চাকরি করতেন। সাহেব ত' সাহেবই। মেজাজটাও ছিল সেইরকম। পান থেকে চুন খস্‌বার উপায় ছিল না। যাইহোক, যথাসময়ে আমার সিন্ এলো। অসুস্থ জগৎ সিংহ শুয়ে আছেন। আয়েষা অদূরে। আমি হকিম সেজে মঞ্চে প্রবেশ করলাম। তারপর জগৎ সিংহকে পরীক্ষা করে বল্‌বো—আর চিন্তা নাই বেগম সাহেবা, কুমার এ যাত্রায় রক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু ঐ দুই নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীর মাঝে পড়ে, আমি যেন কি রকম নার্ভাস্ হয়ে গেলাম। ফস্ করে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আর রক্ষা নাই বেগম সাহেবা, কুমার এ যাত্রায় চিন্তা পেয়েছেন। যাঁরা অভিনয় দেখছিলেন, তাঁরা তো হো হো করে হেসে উঠলেন। আমি কোন রকমে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসে অপরাধীর মত উইংস-এর পাশে দাঁড়ালাম।

তারাসুন্দরী মঞ্চ থেকে ফিরে এসে বললেন—এমন সিন্‌টা মাটি করে দিলে বাবা! ভাল করে দেখও না, কথাগুলো পড়ও না।

সহসা গুরুগম্ভীর কণ্ঠের আওয়াজ ভেসে এলো—কোথায় গেল সে?

যারা আমার কাছে ছিল, তারা বল্‌লে—যে অবস্থায় আছিস্‌ এই অবস্থায় পালা। নইলে পালিত সাহেবের হাতে মার খেয়ে আজ মরে যাবি। শুভানুধ্যায়ীদের কথায় হকিমের পোশাকেই পাঁচিল টপ্‌কে স্টার লেন দিয়ে ছুটে পালালাম। তখন আমাদের বাড়ি ছিল, গিরিশ পার্কের কাছে। সোজা বাড়ি গিয়ে সাজ-পোশাক দাড়ি-গোঁফ খুললাম। পরেব দিন সকালবেলা থিয়েটারে এসে সেগুলো ড্রেসারকে জমা দিলাম।

সকলে পরামর্শ দিল, বিডন স্ট্রীট পোস্ট অফিসে গিয়ে পালিত সাহেবের কাছে ক্রুটি স্বীকার করে আয়। নইলে, ওঁর রাগ সহজে পড়ে না। থিয়েটারে দেখলে, হয় তোকে মার লাগাবেন, না হয় কর্তাদের বলে, তোকে তাড়াবেন। কি করি, গেলাম বিডন স্ট্রীট পোস্ট অফিসে।

কর্মব্যস্ত পালিত সাহেব কাগজ থেকে মুখ তুলে আমায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার ? এখানে কেন ?

বললাম—আজ্ঞে, বড্ড ভুল করে ফেলেছি গতকাল। এবারের মত আমায় মাফ্‌ করুন।

পালিত সাহেব কাগজপত্রে সই দিতে দিতে বললেন—যাও। আর কখনও যেন এমন হয় না। মনে রেখো, হাতের তীর ছুঁড়ে দিলে, তা আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

সত্যিই তাই। থিয়েটার-যাত্রায় সংলাপ বলাও তীর ছোঁড়ারই সামিল।

॥ AT YOUR RISK ॥

অভিনেতা শরৎ চট্টোপাধ্যায় মশাই তখন রঙ্‌মহলের স্বত্বাধিকারী। অহীন দা (অর্থাৎ নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী) রঙ্‌মহলের কেবলমাত্র প্রধান অভিনেতাই নন, নাটক নির্বাচন থেকে শুরু করে,

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের শিক্ষাদান সবই তিনি করতেন। যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে বুধবারে, বৃহস্পতিবারে, শনিবারে এবং রবিবারে বিভিন্ন নাটক অভিনয় হচ্ছিল। কোনদিন 'কর্ণার্জুন', কোন-দিন 'মেবার পতন', কোনদিন বা 'সাজাহান'। এই সময়ে অহীনদা বহু পুরাতন নাটককে নতুনভাবে সম্পাদনা করে মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনবোধে পুরাতন নাটকের জন্য বহু নতুন দৃশ্যপটও তিনি তৈরী করিয়েছিলেন। নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে অহীনদা'র সূক্ষ্ম রুচিবোধ এবং নিষ্ঠার কথা আজও আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

সে সময়ে কৌতুক-অভিনেতা আশু বোস রঙ্‌মহলের শিল্পীগোষ্ঠী-ভুক্ত ছিলেন। 'সাজাহান'-এ জয়সিংহ ছাড়া, অন্য কোন নাটকে তাঁর পার্ট ছিল না। একদিন সন্ধ্যায় অহীনদা'র ঘরে বসে আছি, স্বত্বাধিকারী ও অভিনেতা শরৎ চাটুজ্জ্যে মশাই এসে অহীনদা'কে জানালেন, 'কর্ণার্জুন' নাটকে অংশ গ্রহণকারী কয়েকজন অভিনেতা অসুস্থ। সুতরাং আশুবাবুকে 'কর্ণার্জুন' নাটকে কোন ভূমিকায় নামালে ভাল হয়। শেষ পর্যন্ত আলাপ আলোচনায় ঠিক হোল, আশুবাবু 'কর্ণার্জুনে' শল্য সাজবেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে অহীনদা আশুবাবুকে ডেকে পাঠালেন। আশুবাবু যথাসময়ে অহীনদা'র ঘরে এলেন। অহীনদা জানিয়ে দিলেন আসছে সপ্তাহ থেকে তাঁকে 'কর্ণার্জুন' নাটকে শল্য সাজতে হবে। আশুবাবু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন এবং বললেন— 'সাজবো। At your risk'. কথা ক'টি বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন আশুবাবু।

পরের সপ্তাহে 'কর্ণার্জুন' অভিনয় হচ্ছে রঙ্‌মহলে। কর্ণ— শরৎ চট্টোপাধ্যায়, শকুনি—অহীন্দ্র চৌধুরী, অর্জুন—মিহির ভট্টাচার্য, ভীম—বিজয়কার্তিক দাস প্রভৃতি। আশুবাবু মাথাজোড়া দীর্ঘ টাকটি পরচুলে ঢেকেছেন, মেকআপ করে, সাজ-পোশাক পরে দ্রৌপদীর

স্বয়ম্বর সভায় বসেছেন শল্য সেজে। ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীকে নিয়ে সভায় প্রবেশ করলেন এবং সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করে বললেন ঃ

ধৃষ্টদ্যুম্ন ॥ শুন শুন নৃপতিমণ্ডল,
শুন সভাজন,
শূন্যপথে অবস্থিত মীন
নিম্নে ঘোরে চক্র অনিবার—
স্বচ্ছ নীরে স্ফটিক-আধারে
হের প্রতিবিম্ব তার
করিয়াছি পণ,
মম দত্ত এই ধনু ধরি'
চক্র ছিদ্র-পথে করিয়া সন্ধান
বাণবিদ্ধ কবিবে যে তাহে
তার করে করিব অর্পণ
সর্বসুলক্ষণা ভগ্নি মম
এই যাজ্ঞসেনী—
যজ্ঞ হতে উদ্ভব যাহাব।
হও আগুয়ান
বীর-গর্বে গর্বী মহাশূর,
করি লক্ষ্যবেধ বরমাল্য সনে
জয়লক্ষ্মী করহ গ্রহণ।

ধৃষ্টদ্যুম্নের উপরোক্ত কথার পর শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনকে প্রথমে লক্ষ্যবেধ করার জন্যে আহ্বান জানালেন। দুর্যোধন ব্যর্থ হলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'এবার কে অগ্রসর হবেন?' শল্য বললেন—'আমি একবার চেষ্টা করে দেখি।' 'ধৃষ্টদ্যুম্ন শল্যের পরিচয় দিয়ে দ্রৌপদীকে বললেন—'ভগ্নি! ইনি মদ্র অধিপতি শল্য।' শল্য লক্ষ্যবেধের চেষ্টা করলেন। কিন্তু অকৃতকার্য হলেন। তীর ধনুক রেখে আসন গ্রহণ করতে করতে বললেন—

'হয় অনুমান—
চক্র ছিদ্রশূন্য।'

অহীনদা শকুনির ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। উপরোক্ত কথার পরেই তাঁর কথা। তিনি বললেন—'হাঁ, আপনার চরিত্রেরই মত।' আর কোথায় আছে। সমস্ত প্রেক্ষাগৃহে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। সেই সঙ্গে কাউকে কাউকে বলতেও শোনা গেল—'ওরে! টাক ঢেকে আজ শল্য সেজেছে আশু বোস।'

মঞ্চের ওপর শিল্পীদের মধ্যে জনান্তিকে কথা বল্‌তে শোনা গেল—শল্যই আজকের অভিনয়ের দফা রফা করলে।

যাই হোক, কোন রকমে দৃশ্যটি শেষ হোল। বাইরে এসে অহীনদা আশু বোসকে বললেন—'এমন সিন্‌টা মাটি করলি।'

আশুবাবু নির্বিকার। তাঁকে শুধু একটি কথাই বলতে শোনা গেল—"আমি ত' তোমাকে আগেই বলেছিলাম ভাই, at your risk।"

॥ ও আমার রামলাল ॥

১৯৪২ সালে অভিনেতা শরৎ চট্টোপাধ্যায় মশাই রঙ্‌মহল থিয়েটারে লেসি হন। তাঁর কর্তৃত্বাধীনে রঙ্‌মহলে পর পর কয়েকটি নাটক বেশ জমে যায়। এক এক সময় শরৎবাবু থিয়েটার থেকে যেমন প্রচুর অর্থ লাভ করেছেন, অপর দিকে তেমনি এক এক সময় তাঁকে প্রচুর লোকসানেরও সম্মুখীন হতে হয়েছে। তা ছাড়া শরৎবাবু অত্যন্ত বিলাসী মানুষ ছিলেন। প্রচুর খরচ করতেন তিনি বিলাস-ব্যসনে। নাটক জমে গেলে তিনি দিল্‌দরিয়া। নাটক না জমলে বাইরে থেকে টাকা ধার করতে তিনি এতটুকু দ্বিধাগ্রস্ত নন্। তাঁর খরচের বহর দেখে এক এক সময় তাঁকে সাবধান করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ফল কিছু হয়নি। বরং উল্টে তিনিই আমায়

কতদিন বলেছেন,—'ছিলাম অভিনেতা, মায়ের কৃপায় আজ থিয়েটারের মালিক হয়েছি। মা যে ক'দিন গদিতে বসিয়ে রাখবে, থাকবো। গদি কেড়ে নিলে, যে পান্নালাল, সেই পান্নালাল! তুমিও যেমন—'। এ কথার আর কি উত্তর দেবো? চুপ করে গেছি।

শরৎবাবুব মস্তবড় গুণ ছিল এই যে, থিয়েটারের মালিক হয়েও তিনি কোনদিন তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে মালিকের মত ব্যবহার করেন নি। বিপদে আপদে তিনি তাঁর সহকর্মীদের যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেছেন। হয়ত কোন থিয়েটারে কোন অভিনেতার সঙ্গে তিনি কোন সময়ে কাজ করেছিলেন, শুনলেন অর্থাভাবে তার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, সঙ্গে সঙ্গে একটা সম্মিলিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করে তাঁর মেয়ের বিয়ের টাকা তুলে দিলেন। এমনতর সৎকাজ তাঁকে আমি বহু সময়ে করতে দেখেছি।

এক সময়ে শরৎবাবুর খান-দুই মোটর গাড়ি ছাড়া একটা ঘোড়ার গাড়িও ছিল। ঘোড়াটা ছিল অত্যন্ত বেয়াড়া, বদমেজাজী! প্রত্যহ সকালে তার জন্যে শরৎবাবু এক সের করে জিলিপী বরাদ্দ করেছিলেন। একদিন সকালে থিয়েটারে গিয়ে দেখি, সহিস্‌টা ঘোড়াটাকে জিলিপী খাওয়াচ্ছে। শরৎবাবুর ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি? ম্যানেজার বললেন—কর্তার হুকুম।

—বলেন কি?

—হাঁ।

—কতগুলো জিলিপী খায়?

—পাক্কা একসের।

ইতিমধ্যে শরৎবাবু থিয়েটারে এলেন। আমায় দেখে সহাস্যে বলেন—এসো। ওপরে যাই। তোমার সঙ্গে অনেক পরামর্শ আছে। আমি বললাম—তার আগে আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে।

—বলো।

—ঘোড়াকে জিলিপী খাওয়াচ্ছেন কেন।

—ওকে মানুষের খাদ্য খাইয়ে মানুষ করে তুলেছি। তুমি জান না, ও বড্ড বেয়াড়া হয়ে উঠ্‌ছে দিনদিন। আমি গাড়িতে উঠ্‌লে বেশ টানে। আমি ছাড়া অন্য কোন লোক গাড়িতে উঠ্‌লে গাড়ি টান্‌তে চায় না। মেয়েরা গাড়িতে উঠ্‌লে চার পা তুলে লাফাতে থাকে। সে দিন রিহার্শালের পর রাণীকে (রাণীবালা) গাড়ি করে পৌঁছে দিতে গিয়েছিল, গাড়োয়ান এসে বললে, 'ইচ্ছে করে একটা বাড়ির দেওয়ালের সঙ্গে ধাক্কা মারলে।' রাণী ত' ভয়ে অস্থির! শেষে মাঝ পথ থেকে একটা রিক্সাভাড়া করে সহিস্‌ রাণীকে বাড়ি পেঁাছে দিয়ে আসে। ওর ঐ গোঁয়ার্তুমির জন্যে সকলে ওকে বিক্রি করে দিতে বল্‌ছে। কিন্তু কি করে ওকে বিক্রি করি বল তো ভাই? ও আমার কাছে আসার পর থেকে থিয়েটারটা ভালই চল্‌ছে। বেশ দু-পয়সা পাচ্ছিও।

—তা বেশ তো। ঘোড়াটা যদি এতই পয়মন্তর, তাহলে ওকে এমনি রেখে দিন। আর একটা ঘোড়া কিনে গাড়িটা চালানোর ব্যবস্থা করুন।

—তা কি করে হয়? দুটো ঘোড়া পোষা কি যে সে কথা! খরচ কত! তাছাড়া, ঘোড়াকে না খাটালে, বাতে ধরবে যে!

—জিলিপী খাওয়ালে কি ঘোড়া শান্ত হবে?

—না না, তা নয়। শান্ত করার জন্যে জিলিপী খাওয়ানোর ব্যবস্থা করিনি। ব্যাপারটা কি জান, একদিন সকালে হরি ঘোষ ষ্ট্রীটে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। ভদ্রলোকের বাড়ি যেতে গেলে বড় রাস্তায় গাড়ি রেখে একটা সরু গলি দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে হয়। কাজেই রাস্তায় গাড়ি রেখে, ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসে দেখি বেশ একটি ছোটখাট জনতা আমার গাড়িটি ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ভয় হোল, কি জানি কি বিপদ ঘটেছে! যাই হোক, কাছে এসে শুনি, গাড়িটা যেখানে দাঁড় করানো ছিল, তার পাশের খাবারের দোকানে একঝুড়ি জিলিপী ভেজে রেখেছিল দোকানী। ও ঝুড়িটিকে মুখে করে টেনে এনে সবটাই নাকি উদরস্থ

করেছে! কি করব? দোকানদারকে জিলিপীর দাম মিটিয়ে দিয়ে সেইদিন থেকে ওর জন্যে এক সের করে জিলিপী বরাদ্দ করে দিয়েছি যাতে ও আর পরের জিনিস কেড়েকুড়ে না খায়।

—বেশ করেছেন। বুঝেছি। আপনার ঘোড়ারোগে ধরেছে।

—একথা কেন বল্‌ছ ভাই, 'রামের সুমতি' তুমিই ত নাটক করেছিলে—ও আমার রামলাল! নইলে থিয়েটার শুদ্ধ লোক ওর বিপক্ষে, ওকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। কিন্তু আমি ত ওকে তাড়াতে পাচ্ছিনে। কথাক'টি শেষ করে শরৎবাবুর চোখদু'টি ছল্‌ছলিয়ে উঠ্‌লো।

॥ টাকার জোগাড় ॥

যে সময়ের কথা বল্‌ছি, সে সময়ে শরৎবাবুর রঙ্‌মহল থিয়েটারের অবস্থা বড় ভাল নয়। পর পর কয়েকটি নতুন নাটক জমেনি। অথচ production-এর জন্য বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে। থিয়েটারকে চালু রাখার জন্যে বাইরে থেকে প্রচুর ধারদেনাও করতে হয়েছে। শরৎবাবু বড়ই বিব্রত। নানা শলা-পরামর্শের মাঝে তাঁকে একদিন বলেছিলাম—কিছু লোক ছাঁটাই ক'রে, অল্প চরিত্রের কোন নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করুন। তাতে আর কিছু হোক আর না-হোক, এ সময়ে অন্ততঃ খরচপত্র তো কিছু কমবে।

উত্তরে শরৎবাবু বলেছিলেন—না ভাই, তা পারবো না। যাদের সঙ্গে একদিন সাধারণ শিল্পী হিসেবে কাজ করেছি, তাদের আজকে মালিক হিসেবে ছাঁটাই করি কি করে? তা'ছাড়া তোমাকে তো একদিন বলেছিলাম, ঘোড়াকে বসিয়ে রাখ্‌লে বাতে ধরে, তেমনি শিল্পীদেরও বেকার করে দিলে, তাদেরও সত্তা নষ্ট হয়ে যায়। কোন রকমে একটা নাটক যাতে জমানো যায়, তার ব্যবস্থা করো।

শরৎবাবুর কথামত নতুন নাটক খোলা হয়েছিল। নাটক যাতে

দর্শকদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয় তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টাও করা হয়েছিল, কিন্তু সে নাটকও জমেনি। পয়সা দেয়নি। মাঝে মাঝে combination play অর্থাৎ সম্মিলিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করে কিছু অর্থের জোগাড় হচ্ছিল বটে, কিন্তু একটা সাধারণ রঙ্গালয় চালানোর পক্ষে সে অর্থ যথেষ্ট নয়। প্রত্যহ সন্ধ্যায় পরামর্শ-সভা বসে। আলোচনা হয়। কোন কোনদিন বা নতুন নাটকের পাণ্ডুলিপি পড়ে শোনা হয়। কিন্তু কোনটাই পছন্দ হয় না। শরৎবাবু দু-পাঁচদিন অন্তর এক একটা উপন্যাস আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেন—পড়ে দেখো ভাই।

পড়ে, যথারীতি ভাল লাগেনি বলে ফেরৎ দিই।

এমনি পাঁচ-সাতখানা উপন্যাস ফেরৎ দেওয়ার পর শরৎবাবু একদিন আমায় বলেন—কোনটাই কি তোমার পছন্দ হচ্ছে না? অথচ প্রত্যেক বইটার ছ'টা-সাতটা করে সংস্করণ হয়েছে।

—আপনি Title page-এর পেছন দিকে সংস্করণ ক'টা হয়েছে তাই দেখে বই কিনে আনছেন নাকি?

—হ্যাঁ। তাই ত' আনছি।

—যে বইগুলো আমায় পড়তে দিয়েছেন, তার একটাও কি আপনি পড়েননি নাকি?

—না। আমার পড়ার সময় কোথায়? সারাদিনই তো হা-টাকা, জো-টাকা করে বেড়াচ্ছি। তুমি পড়ে ভাল বল্‌লে, তোমার ভাল লাগ্‌লেই হোল। নাটক করবে তুমি, আমি পড়ে আর কি করবো?

—আপনি আর edition দেখে বই কিনবেন না। আমি লাইব্রেরী থেকে বই এনে পড়্‌বো।

—Edition দেখে কি আর সাধে বই কিন্‌ছি ভাই, অনেক ভেবেচিন্তে কিন্‌ছি।

—কি রকম?

—এই ধরো, সাতটা edition হয়েছে, কোন্ বইয়ের, সে বইটা অন্ততঃ সাত হাজার ছাপা হয়েছে।

—হ্যাঁ। তা হয়েছে।

—ঐ সাত হাজার বই, অন্ততঃ দু'জন করে লোকও যদি পড়ে থাকে, তা'হলে চৌদ্দ হাজার লোক ঐ বইটা পড়েছে। চৌদ্দ হাজার লোকের মধ্যে যদি সাত হাজার লোককেও দর্শক হিসেবে পাই, তাহলে এই দুঃসময়ে কিছুদিন তো থিয়েটারটাকে চালু রাখতে পারবো।

শরৎবাবুর কথা শুনে সেদিন সত্যিই আমি ব্যথিত হয়েছিলাম। থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কত রকম চিন্তাই না তাঁকে পেয়ে বসেছে।

উপরোক্ত আলোচনার মাঝে হঠাৎ শরৎবাবু ব্যস্তসমস্তভাবে হেঁকে বলেন—'সন্তোষ'। সন্তোষ অর্থাৎ সন্তোষ বাঁড়ুজ্যে। শরৎবাবুর থিয়েটারের ম্যানেজার। হন্তদন্ত হয়ে সন্তোষবাবু হাজির হলেন।

শরৎবাবু গ্রীনরুমের দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্‌লেন—দেখ তো, দেখ তো, কে যেন গ্রীনরুমের দিকে যাচ্ছে।

সন্তোষবাবু গ্রীনরুমের দিকে চেয়ে উত্তর দিলেন—অমুকবাবু, সেদিন যাঁর কাছ থেকে আমরা আড়াই হাজার টাকা নিয়ে এসেছিলাম।

—*টাকা এনেছিলাম তাই কি?*

—আজ্ঞে, ওঁর কাছে আমরা ঋণী, তাই—

সন্তোষবাবুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে শরৎবাবু বল্‌লেন—ঋণ তো মাত্র আড়াই হাজার টাকা। তারজন্যে ওকে গ্রীনরুমে যেতে দেবে? তোমাদের কি মতিচ্ছন্ন হোল নাকি? আমরা এর চেয়েও থিয়েটারের দুদিন দেখেছি। তখুনিই দশহাজারের কম গ্রীনরুমে যাওয়ার পারমিট্ মিল্‌তো না, আর এখন কি না তোমরা আড়াই হাজারে পারমিট্ দিচ্ছ?

শরৎবাবুর কথায় আমি বিস্মিত। মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছি। ইতিমধ্যে শরৎবাবু সন্তোষবাবুকে গ্রীনরুমে পাঠালেন, ঋণদাতাকে ডেকে আনবার জন্যে। আর আমাকে বল্‌লেন—যাক্ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। সামনে ১০ তারিখ। মাইনের দিন, টাকাটা এবার জোগাড় হয়ে যাবে।

আমি বল্‌লাম—জোগাড় হবে? কি করে?

শরৎবাবু বল্‌লেন—ঐ আড়াই হাজার দিয়ে যিনি আজ গ্রীনরুমের চৌকাঠ্ পেরিয়েছেন, বাকী সাড়ে সাত হাজার তিনিই দেবেন।

এই ঘটনার দিন দুই পরে শুনেছিলাম, ভদ্রলোক ঐ টাকাটা দিয়েছিলেনও।

॥ মাইনে কি দাঁতের জন্য বাড়াবো ? ॥

শরৎবাবু থিয়েটারের শিল্পীদের প্রতি যেমন সহানুভূতিশীল ছিলেন, অপরদিকে তেমনি কোন কারণে তাদের প্রতি বিরক্ত হলে যা মুখে আস্‌ত তাই বলে বস্‌তেন। রঙ্‌মহল থিয়েটারের অবস্থা তখন খুবই খারাপ। শরৎবাবু ধার-দেনায় জর্জরিত। দেনার দায়ে দু'একটা মামলাও রুজু হয়েছে হাইকোর্টে। কিন্তু নানা অসুবিধা সত্ত্বেও কাউকে তিনি জবাব দেন নি।

অদ্ভুত চরিত্রের লোক ছিলেন শরৎবাবু। স্নেহপ্রীতির বশে এক দিকে যেমন তিনি সকলকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইতেন, অন্যদিকে তাদের যে তিনি পোষণ করছেন, সময় সময় একথা প্রকাশ করতেও দ্বিধা করতেন না। এক এক সময় বড্ড বিরক্ত হতাম তাঁর কথায়। পাঁচদিন শুনতে শুনতে একদিন বলেছিলাম—ভারবোঝা বলেই যদি মনে করেন, তাহলে সে ভার বহন করারই বা দরকার কি ? আর সে কথা এইভাবে প্রকাশ করে নিজেকে ছোট করারই বা দরকার কি ? উত্তরে শরৎবাবু বলেছিলেন—আমি না হয় মুখ ফুটে কাউকে জবাব দিতে পারিনে, মনের দুঃখ না হয় মুখেই প্রকাশ করি। কিন্তু কই, তাই' বলে ওরাও ত' কেউ আমায় জবাব দেয় না ?

—ওরা জবাব দেবে কেন ? ওরা পেটের দায়ে কাজ করতে এসেছে। জবাব দিতে হয়, আপনি দেবেন।

—আমি তা পারব না।

—তা যদি না পারেন, তা'হলে যখন তখন এমন করে ওদের বল্‌বেনও, না।

—চলা পথ আর বলা মুখ বন্ধ করা যায় না। অভ্যেসটা বড় খারাপ হয়ে গিয়েছে। তা'ছাড়া নানাভাবে জড়িয়ে পড়েছি। দুর্ভাবনা-দুশ্চিন্তারও শেষ নেই। তাই সময় সময় ভেতরের জ্বালা মুখ দিয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

উপরোক্ত আলোচনার মাঝে শরৎবাবুর থিয়েটারের ম্যানেজার সন্তোষবাবু এসে জানান—অমুক দেবী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

—কেন ?

—তা তো জানি না।

—তুমি জান না। কিন্তু আমি জানি। ক'দিন ধরেই তুমি ওর কথা আমায় বল্‌ছ।

—কি করি বলুন, আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে ও যে খুব ব্যস্ত হয়েছে।

—ও ব্যস্ত হয়েছে বলে' তুমিও ব্যস্ত হবে ? তুমি না থিয়েটারের ম্যানেজার ? থিয়েটারের ম্যানেজারকে সাত বুদ্ধি নিয়ে চল্‌তে হয়। ব্যস্ত মানুষকে শান্ত করতে হয়, আবার দরকার হলে শান্ত মানুষকে ব্যস্ত করে তুল্‌তে হয়। থিয়েটারের আমি মালিক অর্থাৎ থিয়েটারের হাইকোর্ট আমি। তুমি ম্যানেজার, অর্থাৎ তুমি হলে ছোট আদালত। ছোট আদালত থেকে মামলার যত নিষ্পত্তি হয়, ততই ভাল। হাইকোর্ট পর্যন্ত যাতে না গড়ায় তুমি কোথায় সেই চেষ্টা করবে, তা নয়, ক'দিন ধরেই তোমার মুখে শুন্‌ছি, অমুক দেবী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। যাও নিয়ে এস, দেখি কি বলে।

বেচারা সন্তোষবাবু। শরৎবাবুর কাছে ধমক্ খেয়ে চলে গেলেন, অভিনেত্রীটিকে ডেকে আন্‌তে।

অভিনেত্রীটির বয়স তখন চল্লিশের ঊর্ধ্বে। এখন বয়স্কার ভূমিকায় অভিনয় করেন। এক সময় বহু নাটকে নায়িকার ভূমিকায়

সুনামের সঙ্গেই অভিনয় করেছেন। নাচতে গাইতে পারতেন। চেহারাটি মোটামুটি ভালই ছিল। কলকাতা শহরের ওপর নিজস্ব বাড়ি। গয়না-গাঁটি, টাকা-পয়সা কোন কিছুরই অভাব নেই অভিনেত্রীটির। যাই হোক, অভিনেত্রীকে শরৎবাবুর সামনে হাজির করে দিয়ে সরে পড়লেন সন্তোষবাবু। শরৎবাবু অভিনেত্রীটিকে সামনের চেয়ারে বসতে নির্দেশ দিয়ে বল্লেন—দেখা করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ কেন? বল কি ব্যাপার?

—আমার ত' আর চলছে না দাদা!

—আমিও অচল। ক'দিন ধরে কথাটা তোমাকে বলবো বলবো মনে করছিলাম।

—আমাকে ছেড়ে দেবেন?

—সময়মত মাইনে দিতে পারছিনে, ছেড়ে না দিয়ে আর উপায় কি?

—আমার ত' খাঁই বেশী নয়। সামান্য দু-দশ টাকা।

—ও দু-দশ টাকাও আর আমার ঝাড়ানোর ক্ষমতা নেই। এখন আমার বড়ই দুর্দিন।

—আমার বেলাতেই দুর্দিনটা বেশী হোল দাদা? এই ত সেদিন অমুক বাবুর দু'শো টাকা মাইনে বাড়ালেন।

—বাড়ালাম। কারণ, অমুক বাবুকে যা দিই, তার চতুর্গুণ তিনি পাইয়ে দেন। তাঁকে না হলে থিয়েটার চলে না। আচ্ছা, এর-ওর কথা না বলে তোমার নিজের কথাটাই ভাবো না কেন? তুমি কি মনে কর, তুমি যখন নায়িকা সাজতে তখন তোমার যে Box office ছিল, এখনও কি তাই আছে। সামনের দাঁতগুলো বরাবরই তোমার একটু উঁচু ছিল, এখন তা আবার ঝুলে পড়েছে। মাইনেটা কি এখন আমি দাঁতের জন্যে বাড়াবো? তোমাদের জবাব দিতে কষ্ট হয়, এই আমার অপরাধ—সে অপরাধের জন্যে আর আমি জরিমানা দিতে রাজী নই।

শরৎবাবুর উপরোক্ত কথার পর আমরা সকলেই চুপ করে গেছি। অভিনেত্রীটিও বোধহয় উত্তর খুঁজে পাননি। মুখ ভার করে কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি চলে গেলেন।

এই ঘটনার তিন-চারদিন পরে অভিনেত্রীটি শরৎবাবুকে জবাব দিয়ে থিয়েটার ছেড়ে দেন।

॥ নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের মহলায় ॥

শ্রীরঙ্গম-এ শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে'র নাট্যরূপ যে সময়ে মঞ্চস্থ হয়, তার কিছুদিন আগে থেকেই নাট্যাচার্য শিশিরকুমার অসুস্থ হয়ে পড়েন। 'বিন্দুর ছেলে'র আমি নাট্যরূপ দিয়েছিলাম। তখন 'ভারতবর্ষ' মাসিক পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে আমি কাজ করি। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার পরিচালক স্বর্গত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে জানান যে, শিশিরকুমারের ইচ্ছা 'বিন্দুব ছেলে'র নাট্যরূপ আমি রচনা করি। হরিদাসবাবুর কাছে কথাটা শুনে সেদিন যতটা আনন্দ পেয়েছিলাম, ততোধিক নিরুৎসাহিত ও দুঃখিত হয়েছিলাম যেদিন শিশিরকুমার স্বয়ং আমাকে জানালেন, 'বিন্দুর ছেলে' নাটকে তিনি কোন অংশগ্রহণ করবেন না এবং নাটকটিকে মঞ্চস্থ করে দিয়েই বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে দেওঘরে চলে যাবেন। কেন জানি না, নাট্যাচার্যের কথা শুনে হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—আপনি না থাক্‌লে নাটক কি চল্‌বে? উত্তরে নাট্যাচার্য বলেছিলেন—নাটক যদি ভাল হয়, নিশ্চয়ই চল্‌বে। তা'ছাড়া তুমি ত' আমার স্ট্যাম্প চাইছো? তা সে স্ট্যাম্প আমি নাটকের মধ্যে রেখে যাবো।

একটি মাত্র অঙ্ক লিখে এক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নাটকটি শিশির-কুমার এবং মঞ্চের অন্যান্য শিল্পীদের শুনিয়েছিলাম। বাকী দুইটি অঙ্ক পরের সোমবারের মধ্যে লিখে দিই। শুনেছিলাম, শিশিরকুমার

নাটক শোনার পর প্রচুর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। কিন্তু 'বিন্দুর ছেলে'র বেলায় তা হয়নি। যদিও কোন একটি পুস্তকে বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। তিনি নাটক শুনে খুবই খুশী হয়েছিলেন। স্বর্গত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়কে আমরা 'মহর্ষি' বল্‌তাম। একদিন মহর্ষি আমাকে বললেন—'বিন্দুর ছেলে'র পাণ্ডুলিপিটা সযত্নে রেখে দেবেন, ওটা আপনার বড় সার্টিফিকেট্। এতদিন নাট্যাচার্যের সংস্পর্শে আছি, এমন অক্ষত অবস্থায় আজ পর্যন্ত কোন নাটক শিশিরকুমারের কাছে মঞ্চস্থ হতে দেখিনি। মহর্ষির কথামত আজো অতি সযত্নে 'বিন্দুর ছেলে'র নাট্যরূপের পাণ্ডুলিপিটি রেখে দিয়েছি। ঐ পাণ্ডুলিপির মধ্যে পেন্সিল দিয়ে শিশিরকুমার প্রিয়নাথের একটি মাত্র সংলাপ পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। তাই আমার কাছে ঐ পাণ্ডুলিপিটি একটি বড় সম্পদ হয়ে আছে।

মহাসমারোহে 'বিন্দুর ছেলে'র মহলা চলেছে। শিশিরকুমার শিল্পীদের শিক্ষাদান করছেন অসুস্থ শরীরে। শিশিরকুমার যখন মঞ্চের ওপর শিক্ষাদানরত তখন কে বল্‌বে তাঁকে অসুস্থ? কিন্তু অন্য সময়ে যখনই তাঁর ঘরে গেছি, তখনই মনে হয়েছে—নাট্যাচার্য সত্যিই খুব অসুস্থ। ভাবনা হয়েছে, নাটকটা শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ হবে তো?

একদিন সন্ধ্যায় শ্রীরঙ্গমে গিয়ে শুনি, শিশিরকুমার খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মহলায় আসতে পারবেন না। মহর্ষি মহলা দেওয়াবেন। আর মাত্র দিন পাঁচেক বাকী। ভাবনা হোল, এর মধ্যে যদি শিশিরকুমার সুস্থ হয়ে না ওঠেন? তা'হলে?—শিশিরকুমার সুস্থ হয়ে উঠ্‌লেন না। নাটক মঞ্চস্থ হোল যথাসময়ে। যাঁরা অভিনয় দেখলেন, সকলেই সুখ্যাতি করলেন। পর পর তিন-চারটি অভিনয় হয়ে গেল। কিন্তু দর্শক-সমাগম বা টিকিট বিক্রি আশানুরূপ হোল না।

একদিন মহর্ষিকে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—নাটক চল্‌বে ত?

বেচাকেনা দেখে আমি ত বড়ই মুষ্‌ড়ে পড়েছি।

মহর্ষি বল্‌লেন—চলা ত উচিত। যাঁরা অভিনয় দেখছেন, তাঁরা তো নাটক এবং অভিনয়, দুটোরই প্রশংসা করছেন।

কয়েকদিন পরে নাট্যাচার্য অপেক্ষাকৃত সুস্থ হলে, একদিন সকালে তাঁর কাছে গেলাম। বল্‌লেন—শুনছি ত অভিনয় ভালই হয়েছে।

—আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু বিক্রি সুবিধে নয়।

—ওর জন্যে ভেবো না। বিক্রিটা আস্তে আস্তে বাড়বে। ভাব্‌ছি, শনিবারে অভিনয়টা আগাগোড়া বক্স-এ বসে দেখ্‌বো। তুমিও এসো। একসঙ্গে বসে দেখা যাবে।

—যে আজ্ঞে।

শনিবারের দিন যথাসময়ে বক্স-এ বসে নাট্যাচার্যের সঙ্গে অভিনয় দেখলাম। অভিনয় শেষ হলে বললেন—ঠিক আছে। একটু brush work-এর দরকার। সোমবার সকালে এসো।

—ক'টায় আসবো ?

—এই ৮টায়। পঞ্চিকে আনাবো। ওকে একটু শেখানো পড়ানোর দরকার। বিছানা নিলাম। না হলে touchগুলো বাকী থাকতো না।

পঞ্চি অর্থাৎ সাবিত্রী। যে 'বিন্দুর ছেলে' নাটকে বিন্দুবাসিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। সাবিত্রীর চেহারাটি ভারি মিষ্টি ছিল। অভিনেত্রী হিসাবে তখন তার খুব বেশী খ্যাতি হয়নি। ব্যালে হয়ে থিয়েটারে ঢুকেছিল। মধ্যে মধ্যে দু'একটা নাটকে ছোটখাট পার্ট করেছিল, এই পর্যন্ত। সাবিত্রীর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে 'বিন্দুর ছেলে' নাটকে বিন্দুবাসিনীর ভূমিকায় অভিনয় করার পর।

যাইহোক, নাট্যাচার্যের আদেশ মত সোমবার সকাল ৮টায় শ্রীরঙ্গমে গেলাম। সাবিত্রী অর্থাৎ পঞ্চি এসে গেছেন। আমাকে বললেন—বইটা পড় তো, ডাক্তার এখনো আসেনি।

ডাক্তার অর্থাৎ prompter সত্য সরকার। সত্যবাবুকে রঙ্গ-

জগতের সকলেই ডাক্তার বলে। কারণ, সত্যবাবু এককালে হোমিও-প্যাথিক ডাক্তারী পাশ করেছিলেন। আমি বইটা পড়তে আরম্ভ করেছি, এমন সময় ডাক্তার এলেন। আমিও বইটা তাঁর হাতে তুলে দিলাম। নাট্যাচার্য শুরু কবলেন পঞ্চিকে শেখাতে। আমি অভিভূত হয়ে তাঁর শিক্ষাদান-কৌশল লক্ষ্য করতে লাগলাম। প্রতিটি সংলাপের ব্যাখ্যা করে বোঝাতে লাগলেন। বাচন-ভঙ্গি কেমন হবে, প্রকাশ-ভঙ্গি কেমন হবে, বোঝাতে লাগলেন। নাটক লেখবার সময় যা বুঝতে পারিনি, নাটকের মহলায় তা নতুন করে বুঝতে লাগলাম। অদ্ভুত! অপূর্ব সে শিক্ষাদান কৌশল। সকাল ৮॥০ টায় শুরু হয়েছে বেলা ১টা বেজে গেছে, কারুর খেয়াল নেই। এরই মাঝে কে যেন এসে জানাল, বেলা একটা বেজে গেছে। নাট্যাচার্য তাকে হুকুম করলেন, আমাদের জন্য চা আর কিছু খাবার আনিয়ে দেবার জন্যে। চা ও জলখাবার এলো। সেগুলিব সদ্ব্যবহাব করে, আবার শুরু হোল বিন্দুবাসিনীকে শিক্ষাদান। বেলা তখন ৪টা কি ৪॥০ টা।

নাট্যাচার্য পঞ্চিকে বললেন—একটু জিরিয়ে নে। Musicianদের আসতে বলেছি। ছোটও আসবে (ছোট অর্থাৎ প্রভাদেবীর মেয়ে কেতকী। 'বিন্দুব ছেলে' নাটকে অমূল্যর ভূমিকায় কেতকী সর্বপ্রথম মঞ্চাবতরণ করে।) 1st Act-এর dropটা music-এর সঙ্গে ছোটকে দিয়ে proxy দিইয়ে ঠিক করে নিতে হবে। ও জায়গাটা আরো ওঠার দরকার। বিন্দুর characterটা কি, তা ওখান থেকেই যাতে দর্শকরা ধরে নিতে পারেন, সেইভাবে অভিনয় করাতে হবে। তোমরা stage-এ যাও আমি যাচ্ছি। ও রে, গোটা দুই চুরুট দে—

আমি, পঞ্চি ও ডাক্তার stage-এ এলাম। সঙ্গে সঙ্গে musician-রাও হাজির হলেন। ছোট অর্থাৎ কেতকীও এলো। সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। তারপর এখন সন্ধ্যা। মহলার তোড়জোড় দেখে, পঞ্চির ত' মুখ শুকিয়ে গেছে! বেচারা আমাকে

এসে অনুরোধ জানায়—

—দাদা, আর পারছি না। দয়া করে বলুন না বড়বাবুকে আজকের মত ছুটি দিতে।

—কিন্তু ছুটি কি দেবেন? রিহার্সাল দেবেন বলে এদের আনিয়েছেন?

—বলে দেখুন না?

সাবিত্রীর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত নাট্যাচার্যকে গিয়ে জানালাম কথাটা।

নাট্যাচার্য বললেন—তুমি পঞ্চির হয়ে অনুরোধ করছ? তুমি না নাট্যকার।

—কি করি বলুন? ও যে আপনাকে বলার জন্যে বার বার অনুরোধ জানাচ্ছে আমাকে।

—না না, কিছুতেই ছাড়া হবে না ওকে। পঞ্চি না হয় বুঝতে পারেনি, ও কি চরিত্র অভিনয় করছে, তাই বলে তুমিও—

—সত্যি কথা বল্‌তে কি আজ যেমন করে চরিত্রটা বুঝলাম, এমন করে আমিও আগে বুঝিনি।

—তুমিও এখনো বোঝনি। বুঝ্‌লে ওর ছুটির জন্যে উমেদারী করতে না। বিন্দুর চরিত্রটা কি জান? চরিত্রটা হচ্ছে—হিস্ট্রিক। এই কাঁদে, এই হাসে। এই মাটির মানুষ, এই ক্ষেপে ওঠে। ওর হিস্টিরিয়া না হওয়া পর্যন্ত আজ আর ওকে ছাড়বো না।

নাট্যাচার্যের কথাই সত্যি হোল। রাত্রি ৮৷৷৹টা-৯টা নাগাদ রিহার্সাল দিতে দিতে স্টেজের ওপর পড়ে গেল সাবিত্রী। ছোট ছুটতে ছুটতে এসে তার বুকের ওপর—'ছোট মা মরে গেল! ছোট মা মরে গেল!' বলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌লো। সেই সঙ্গে musician-রাও বাজাতে লাগলেন—back ground music। অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হোল মঞ্চের ওপর। উল্লাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌লো নাট্যাচার্যের মুখ-চোখ, সার্থক সৃষ্টির আনন্দে। পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠ্‌লো নাট্যা-

চার্যের মুখে। ওদিকে তখন সাবিত্রী সংজ্ঞাহীনা। তাকে সুস্থ করে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হোল।

যাবার সময় নাট্যাচার্য সাবিত্রীকে বল্‌লেন—যা বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করগে—যা শেখালাম মনে থাকে যেন। বৃহস্পতিবারের অভিনয় আমি কিন্তু দেখবো।

॥ দক্ষিণে যোগিনী ॥

শরৎবাবুর রঙ্‌মহলে সে সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন' অভিনয় হচ্ছিল। নাটকটি নতুন করে সম্পাদনা করেন শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী। নতুন রূপে উপস্থাপিত 'মেবার পতন' দর্শকদের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছিল। অহীন্দ্রবাবু স্বয়ং গোবিন্দ সিংহের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। আর সগর সিংহের ভূমিকায় অভিনয় করতেন স্বর্গত নির্মলেন্দু লাহিড়ী। ঐতিহাসিক নাটকে এই দুই দিক্‌পাল অভিনেতার আবির্ভাব দর্শকদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

যে সময়ের কথা বল্‌ছি, নির্মলেন্দুবাবু সে সময় একদিকে যেমন পূজাপাঠে সময় অতিবাহিত করতেন, অপরদিকে তেমনি পাঁজিপুঁথি মেনে চলা তাঁর বাতিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। জীবনের শেষের দিনগুলি নির্মলেন্দুবাবু শুদ্ধ সাত্ত্বিক আচারেই কাটিয়েছেন।

একটা বাড়ি কেনার জন্যে কত চেষ্টা তিনি করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাড়িটি তাঁর আর কেনা হয়ে ওঠেনি। অনেক সময় তাঁর কাছে অনেকে এসে বাড়ি বিক্রির খবর দিয়ে গেছেন। কিন্তু কোন বাড়ির নম্বর তাঁর শেষ পর্যন্ত মনোমত হয়নি। কেউ এসে বল্‌লে—বাড়ির নম্বর অত। অমনি কাগজ পেন্‌সিল নিয়ে কি যেন অঙ্ক কষলেন। তারপর বল্‌লেন—না, নম্বরটা আমার ঠিক স্যুট্ করছে না। এগুলো

তাঁর হবি বা বাক্তিকে দাঁড়িয়েছিল।

যেদিনের কথা বল্‌ছি—সেদিন রঙ্‌মহলে 'মেবার পতন' অভিনয় ছিল। সন্ধ্যা ৬৷৷০ টায় অভিনয় হবে। বেশ ভাল বিক্রি। আমার থিয়েটারে আসতে বেশ একটু দেরিই হয়েছিল। ৬-২০ মিনিট আন্দাজ থিয়েটারে আসতেই শুনি, শরৎবাবু ডেকে পাঠিয়েছেন গ্রীনরুমে। 'মেবার পতনে' শরৎবাবু সাজতেন অমর সিংহ। মেক-আপ্‌ করা হয়ে গেছে, সাজ পরছেন। আমায় দেখেই বললেন—দেখ দেখি বিপদ, এখনো নির্মলদা আসেননি।

—সেকি! অসুখ-বিসুখ হয়নি ত'?

—অসুখ-বিসুখ হলে ত' খবর দিতেন।

—গাড়ি পাঠানো হয়েছে ত'?

—সন্তোষ বল্‌লে, গাড়ি ত' ঠিক সময়েই পাঠান হয়েছে।

—তবে?

—কি জানি, কি ব্যাপার কিছুই ত' বুঝতে পারছি নে। দেখ, একটা ট্যাক্সি করে কাউকে নির্মলদা'র বাড়ি পাঠাও।

গ্রীনরুম থেকে ব্যস্তভাবে চলে এলাম। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি, ৬-২৭ মিনিট। হাতে সময় মাত্র আর তিন মিনিট। সত্যিই মহা-ভাবনার কথা। নির্মলেন্দুবাবুর মত নামজাদা শিল্পীর অনুপস্থিতি কি দর্শকেরা সহ্য করবেন? নীচে বুকিং অফিসের কাছে আসতেই সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারের গাড়ি নির্মলেন্দুবাবুকে নিয়ে এলো। গাড়ি থেকে নেমে নির্মলেন্দুবাবু সোজা গ্রীনরুমের দিকে চলে গেলেন। দুর্ভাবনা কাটলো।

ড্রাইভারের কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার! এত দেরি হোল যে? ড্রাইভার উত্তরে জানাল—শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে ট্রাফিক জ্যাম্‌ হয়ে যাওয়ায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিল। ড্রাইভারের কথা শুনে, মনে করলাম কি আর করা যাবে। সত্যিই এ এক দুর্ঘটনা ছাড়া আর কি!

সেদিন অভিনয় আরম্ভ হোল ১২ মিনিট পরে। অর্থাৎ ৬৷৷০ টার জায়গায় ৬-৪২ মিনিটে। একে ঐতিহাসিক নাটকের মেক-আপ্ তার ওপর সাজ-পোশাক পরার হ্যাঙ্গামা। ১২ মিনিট দেরি—ও তো হতেই পারে। পুরো একটা অঙ্ক অভিনয় হয়ে যাওয়ার পর, গ্রীনরুমে নির্মলদা'র ঘরে গেলাম। বল্লাম—ড্রাইভার বল্ছিল, পাঁচ মাথার মোড়ে নাকি আজ অনেকক্ষণ আটকে পড়েছিলেন ?

—আর বলো কেন ? কপালের দুর্ভোগ কেউ কখনো খণ্ডাতে পারে ?

নির্মলেন্দুবাবু তখন বাগবাজারে ২নং নিয়োগী ঘাট স্ট্রিটে থাকতেন। তাই বললাম, শ্যামবাজারের মোড় দিয়ে আর আসবেন না দাদা, চিৎপুর-শোভাবাজার, গ্রে-স্ট্রীট দিয়ে চলে আসবেন।

—তাই ত' আসি। কিন্তু আজকের দিনটা ভাল নয়। দক্ষিণে যাত্রা নাস্তি, তার ওপর আবার যোগিনী। তাই চিৎপুর দিয়ে না এসে, বাগবাজার দিয়ে আসতে গিয়ে এই বিভ্রাট হয়ে গেল।

॥ ঘটনা না দুর্ঘটনা ? ॥

আমি তখন দক্ষিণ কলকাতার কালিকা থিয়েটারে। সেসময়ে কালিকায় শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'দ্বীপান্তর' নাটক অভিনীত হচ্ছিল। রঙ্গজগতের মহর্ষি স্বর্গত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় তখন কালিকা থিয়েটারে। 'দ্বীপান্তর' নাটকের একটি প্রধান অংশে তিনি অভিনয় করছিলেন। মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় বরাবরই খদ্দর ব্যবহার করতেন। খদ্দরের থ্রি-কোয়ার্টার পাঞ্জাবির সঙ্গে একটি খদ্দেরর ধুতি কেটে দু'খানি লুঙ্গি তৈরী করে তারই একটি পরে আসতেন। মনে-প্রাণে সাদাসিধে মানুষ ছিলেন। রঙ্গজগতে অমন নিষ্ঠাবান দৃঢ়চরিত্রের মানুষ আর আমি দেখিনি।

যেমন চরিত্রবল, তেমনি মনোবল। গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু তার প্রকাশ ছিল অতি সঙ্গোপনে। কেউ কোন পরামর্শ বা উপদেশ চাইলে, তিনি তা' অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গেই দিয়েছেন। কিন্তু উপর-পড়া হয়ে কাউকে উপদেশ বা পরামর্শ দেওয়া তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ ছিল।

মহলায় অনেকে অনেক সময়ে কতরকম মন্তব্য করেন। এমন কি পরিচালকের উপস্থিতি সত্ত্বেও কেউ কেউ মতামত প্রকাশ করে বসেন। কিন্তু মহর্ষিকে কখনও তা' করতে দেখিনি। বরং কখনও যদি বলেছি—কই মহর্ষি? আপনি ত' কিছু বলছেন না? উত্তরে মহর্ষি বলেছেন—আমাকে মতামত দেওয়ার জন্যে কেউ ত' আহ্বান করেন-নি? এমন নিরহঙ্কার, এমন শালীনতাবোধসম্পন্ন মানুষ, আমি রঙ্গ-জগতের সংস্পর্শে এসে খুব কমই দেখেছি।

খদ্দরের থ্রি-কোয়ার্টার পাঞ্জাবি, খদ্দরের লুঙ্গি আব হাতে একটি লাঠি। দেখে, কে বলবে যে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ অভিনয়-শিল্পী? বরং দেশকর্মী বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁর বেশবিন্যাসের যে বহিপ্রকাশ, সেইটাই ছিল তাঁর আসল রূপ।

প্রথম জীবনে স্বদেশী-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। বহু নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর পক্ষে অভিনয়-শিল্পী হিসাবে রঙ্গজগতে আবির্ভাব—আকস্মিক ঘটনা- বলে মনে হলেও,—তাঁর সহজাত অভিনয়-প্রতিভার কথা অনস্বীকার্য। যেমন সরল জীবনযাপন করতেন, তেমনি সরল স্বাভাবিক অভিনয়ে তিনি নাট্যরসিকদের প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে বলেছিলাম—আস্ত খদ্দরের কাপড়-টাকে কেটে দু'টুক্‌রো করে পরেন কেন? উত্তরে বলেছিলেন—পুরো কাপড়টা পরার সামর্থ্য নেই বলে।

—অবিশ্বাস্য কথা।

—না। ঠিকই বল্‌ছি। অনেকেরই আমার মত পুরো কাপড়

পরার ক্ষমতা নেই। ধার করে পরে। একটা কাপড় কেটে দু'খানা করে পরলে অর্থের যেমন সাশ্রয় হয়, অপরদিকে তেমনি ঋণের দায় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

—আপনার কি ধারণা যাঁরা পুরো কাপড় পরেন, তাঁদের অনেকেই ঋণগ্রস্ত ?

—নিশ্চয়ই। ১০ × ৪৮″ ইঃ, ১০ × ৫০″ ইঃ, ১০ × ৫২″ ইঃ-র কথা ছেড়ে দিন, ১০ × ৪৪″ ইঃ অঙ্গে জড়ানোই অনেকের পক্ষে দুরূহ। যে দেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষে দু'-বেলা দু'-মুঠো অন্ন জোটানো কষ্টসাধ্য ব্যাপার, সেখানে ভাল জামাকাপড়ের প্রশ্ন নিরর্থক।

এই আলোচনার মাস তিন-চার পরে হঠাৎ একদিন মহর্ষিকে খদ্দরের থ্রি-কোয়ার্টার পাঞ্জাবির সঙ্গে দেশী কালাপাড় কাঁচিধুতি পরে সাজঘরে ঢুকতে দেখে বিস্মিত হলাম। শুধু ধুতিটি পরাই নয়, সেই সঙ্গে সযতনে কোঁচাটিও হাতে ধরা আছে। আমাকে চেয়ে থাকতে দেখে বল্‌লেন—কি দেখছেন অমন করে ?

—পরিবর্তন।

—কিসের পরিবর্তন ? বেশের না চারিত্রিক ?

—ধরে নিতে পারেন দু'টোরই।

—তা' বলেছেন মন্দ নয়। বৈষ্ণব যদি রাতারাতি কণ্ঠী ফেলে রুদ্রাক্ষ গলায় পরে, রসকলি মুছে সিঁদুরের টিপ্ পরে, তা'হলে বুঝতে হবে বেশের এবং চরিত্রের দুই-এরই পরিবর্তন হয়েছে। এর্-পর আপনার কাছে কাঁচিধুতি পরার কৈফিয়ৎ না দিয়ে আর উপায় নেই। তবে শুনুন, আমার পিতৃপুরুষ, অর্থাৎ বাপ-ঠাকুরদা প্রভৃতি বরাবর গুরুগিরি করে এসেছেন। তাঁদের কাজ ছিল, কানে মন্ত্র প্রদান করা। তাঁরা সকলেই ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। আমি এর ব্যতিক্রম। কাজেই শিষ্যদের কোন খবরই আমি রাখি না। হঠাৎ গতকাল থিয়েটার থেকে বাড়ি গিয়ে দেখি, সত্তর-ঊর্ধ্বের এক ব্রাহ্মণ দম্পতী আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। আমাকে দেখেই একেবারে

সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। আমি ত' সসঙ্কোচে পেছিয়ে গেলাম। তারপর শুনলাম, তাঁরা এসেছেন আমার কাছে মন্ত্র নিতে। আমি ত' অবাক! নিজেই পূজোআচ্চা করি নে। গায়ত্রীটাও ত' ভুল্‌তে বসেছি। আমি কি মন্ত্র দেব?

বৃদ্ধ বল্‌লেন—যা পার তাই দেবে। তুমি হচ্ছ আমাদের গুরু-বংশধর। তোমার কাছে ছাড়া অন্য কোথাও আমরা মন্ত্র নিতে পারবো না। বংশপরম্পরায় তোমরাই আমাদের মন্ত্রদান করে এসেছো। এতখানি বয়স হলো, বিষয়কর্ম নিয়েই মেতে রইলাম। এখন তুমি আমাদের উদ্ধার করো।

—তারপর?

—তারপর আর কি? কোন যুক্তি, কোন তর্ক খাটলো না তাঁদের কাছে। বাধ্য হয়ে আজ সকালে মন্ত্র প্রদান করলাম সেই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে এবং তাঁদের অনুরোধে যেমন বাধ্য হয়ে মন্ত্রদান করতে হোল, তেমনি বাধ্য হয়েই তাঁদের দেওয়া এই কাপড়টি পরে বাড়ি থেকে বেরুতে হোল। এ কাজ করা হয়ত আমার উচিত হয়নি। পাপ হোল। কিন্তু কাপড়খানা পরে বড় তৃপ্তি পেলাম। কেন জানেন? মাতৃ-বিয়োগের পর, এত স্নেহে কেউ আর আমায় কিছু দেয়নি। তাই ভাব্‌ছি এটা একটা ঘটনা? না দুর্ঘটনা?

কথাগুলো শেষ হলে দেখলাম মহর্ষির চোখ-দুটি জলভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে!

॥ ঝামেলা ফেরত দিলাম ॥

শারীরিক অসুস্থতার জন্যে মধ্যে ন'বছর ছবিদা অর্থাৎ ছবি বিশ্বাস মহাশয় মঞ্চে অভিনয় করেননি। অনেক ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে ন'বছর পরে তাঁকে মঞ্চে ফিরিয়ে এনেছিলাম।

স্টার থিয়েটারে শ্রীযুক্ত মনোজ বসুর 'বৃষ্টি। বৃষ্টি!' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'ডাকবাংলো'য় তিনি বিশ্বেশ্বরের ভূমিকায় অবতরণ করেন। বিশ্বেশ্বর ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু আত্মভোলা মানুষ। নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার আগে, চরিত্রটির কি রকম রূপসজ্জা হবে তাই নিয়ে আলোচনা করি ছবিদা'র সঙ্গে। আলোচনায় ঠিক হয়, কাঁচা পাকা পরচুল, (অবশ্য কাঁচার চেয়ে পাকার ভাগ বেশী) বাঁধা দাড়ি ও গোঁফ এই হবে বিশ্বেশ্বরের রূপসজ্জা। যাই হোক, make-up-man কে ডেকে নির্দেশ দেওয়া হোল কোন্‌টা কি রকম হবে। যথাসময়ে পরচুল ও দাড়ি গোঁফ তৈরী হয়ে এলো। ছবিদা সবগুলো পরে একবার দেখে নিলেন। ফুল রিহার্সালের দিন make-up নিয়ে কিছুক্ষণ অভিনয় করার পর আমায় ডেকে বললেন—

—দাড়ি আমি রাখতে পারছিনে ভাই, বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

—বেশী অসুবিধা বা কষ্ট হলে, দাড়িটা বাদ দিন।

—তা'হলে তোদের দাড়ি তোরা ফিরিয়ে নে ভাই।

দাড়িটি খুলে আমার হাতে দিলেন। আমি make-up-man-কে ফিরিয়ে দিয়ে বল্‌লাম—ছবিদা দাড়ি রাখতে পারছেন না, ওঁকে আর দাড়ি পরিও না। ওটা রেখে দাও। ফুল রিহার্সালেই দাড়ি বরবাদ হয়ে গেল। অতঃপর পরচুল ও গোঁফ এঁটে দীর্ঘ ন'বছর পরে বাংলার দর্শকদের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করলেন ছবি বিশ্বাস। 'ডাকবাংলো' নাটকে—বিশ্বেশ্বরের চরিত্রে। দর্শকেরা স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানাল—ছবি বিশ্বাসকে। ন'বছর মঞ্চাভিনয় না করার ভয় তাঁর কেটে গেল। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় হতে লাগ্‌লো—'ডাকবাংলো'।

কয়েকটি অভিনয়ের পর হঠাৎ একদিন আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন।

—কি ব্যাপার ছবিদা? ডাকছেন?

—হ্যাঁ ভাই, বস। দেখ, wigটা ত' আর মাথায় রাখতে পারছি না।

—কেন ? কি হোল ?

—আরে একে blood pressure, তার ওপর ন'বছরের মধ্যে এসব বড় একটা মাথায় চাপাইনি। Wig চাপানোর ঘণ্টাখানেক, কি ঘণ্টা দেড়েক বাদেই মাথার ভেতরে দপ্ দপ্ করতে আরম্ভ করেছে। তুমি permission দাও, wigটা বাদ দিই।

সেদিন ছিল রবিবার, double show। তাই বললাম—এ showটা কষ্ট করে চালিয়ে নিন; 2nd showতে wigটা আর পরবেন না। মাথায় বরং white ink দিয়ে সাদা করে নেবেন।

সেইদিন 2nd show থেকে wigটাও বাদ গেল। রইলো গোঁফটি। তাও আবার শুকোপটি দিয়ে আঁটা হোত। Spirit gum ছবিদার skin-এ সহ্য হোত না। Spirit gum লাগালেই ঘা হ'য়ে যেত। যাই হোক, শুকোপটি দিয়ে গোঁফ এঁটেও ছবিদার স্বস্তি ছিল না। সিন্‌টি শেষ হলেই, গোঁফটি খুলে হাতে আট্‌কে রাখতেন। আবার ষ্টেজে অভিনয় করতে যাবার আগে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গোঁফটি এঁটে নিতেন। কতদিন তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছি—দাদা, গোঁফ সাবধান।

ছবিদা হেসে বলেছেন—নিশ্চয়ই। ও কি ভুল হবার জো আছে ভাই ? তারপর সুকুমার রায়ের কবিতার দু'-লাইন আবৃত্তি করে বলেছেন—

'গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি
গোঁফ দিয়ে যায় চেনা।'

'ডাকবাংলো' নাটকের তখন শততম অভিনয় অতিক্রান্ত হয়েছে। একদিন স্টেজে নেমে উইংসের ধারে এসে দেখি, ছবিদার গোঁফ নেই। গোঁফটি হাতেই আট্‌কানো রয়েছে। সিন্ শেষ হলে বল্‌লাম—দাদা, আপনার গোঁফ ?

প্রথমে গোঁফে হাত দিলেন। তারপর নিজের হাতের দিকে চাইলেন। দেখলেন, গোঁফটি হাতেই রয়েছে। আঁটা হয়নি।

আমার দিকে চেয়ে বল্লেন—যাঃ। কি হবে?

—কি আর হবে? পরের সিনে গোঁফটা এঁটে নেবেন।

—কিন্তু audienceরা কি মনে করবে?

—মনে করলে সিনেই মনে করতো, আর এতক্ষণ auditorium-এও গুঞ্জন শোনা যেত। যেহেতু ছবি বিশ্বাস, তা যখন শোনা গেল না, তখন বুঝতে হবে ছবি বিশ্বাসের actingই তাঁরা শুনতে এসেছেন, make-up দেখতে আসেননি।

—বলছিস্?

—হ্যাঁ।

—তা'হলে এক কাজ কর ভাই, পরের দিন থেকে গোঁফটাও বাদ দিয়ে দে।

—দেব। দরকার নেই এ ঝামেলাব।

সেদিনের মত অভিনয় শেষ হলে ছবিদা'র ঘরের ড্রেসার কাগজের একটা মোড়ক দিয়ে বলে গেল—ছবিবাবু এটা পাঠিয়েছেন। মোড়কটা খুলে দেখি, বিশ্বেশ্বরেব গোঁফ! আর তার সঙ্গে একটুক্‌রো কাগজে চোখ আঁকা পেনসিল দিয়ে লেখা—

'ঝামেলা ফেরত দিলাম। প্রাপ্তিসংবাদ দিস্। ইতি—তোর ছবিদা।'

॥ আধ-কপালে নিয়ে বাড়ি যাব নাকি? ॥

প্রভা দেবী। বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের একটি স্মরণীয় নাম। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের তিনি ছিলেন সাক্ষাৎ শিষ্যা। শিশিরকুমারের শিক্ষাধীনে তিনি একাধিক নাটকে অভিনয় করে তাঁর অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। বিভিন্ন ধরনের চরিত্রে অভিনয় করে এই কথাই প্রমাণিত করে গেছেন যে, তিনি কুশলী অভিনেত্রী।

কি কোমল চরিত্রে, কি কুটিল চরিত্রে, সর্বত্রই তিনি চরিত্র-সৃষ্টির অপূর্ব দক্ষতা দেখিয়ে গেছেন।

অনেক সময়ে রিহার্সালে শিল্পীরা শুধু যে তাঁর মতামতই নিতেন তা নয়, এমন কি দরকার হলে অনেককে তিনি এ্যাক্টিং শিখিয়ে দিতেন। শিশিরকুমারের সান্নিধ্যে থেকে তিনি নাটক ও নাট্যকলা সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞানার্জন করেছিলেন। এক এক সময় তাঁর সঙ্গে নাটক সম্পর্কে আলোচনা করে বিস্মিত হয়ে গেছি। সারা জীবন ধরে যে কাজ তিনি করে গেছেন, তার সম্পর্কে তাঁর কি গভীর জ্ঞানই না ছিল।

একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—দেখুন, এ কাজ যে করবে, তাকে নিষ্ঠাবান হতে হবে। একাগ্র হতে হবে। বল্‌ছি এক, ভাব্‌ছি আর এক, এই রকম মন নিয়ে এ-কাজ করা চলে না।

প্রভা দেবীর উপরোক্ত কথার যাচাই করার সুযোগ একদিন আমার হয়েছিল। রঙ্‌মহল থিয়েটারে তখন শরৎচন্দ্রের 'নিষ্কৃতি'র অভিনয় চল্‌ছে। 'নিষ্কৃতি' দর্শকদের অভিনন্দনলাভ করেছে। প্রায় প্রতিটি শো ফুল। গিরিশ—জহর গাঙ্গুলী, আর সিদ্ধেশ্বরী—প্রভা দেবী। উভয়ের অভিনয়ের সুখ্যাতি সর্বত্র।

সেদিন ছিল শনিবার। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে 'নিষ্কৃতি'র অভিনয় চলেছে। দোতলায় জহর গাঙ্গুলী মশাইয়ের ঘরে বসে তাঁর সঙ্গে গল্প করছি। দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নীচে থেকে একজন ওপরে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে আমাদের খবর দিলে—শীগ্‌গির আসুন, প্রভা দেবী অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

জহরবাবু ও আমি ব্যস্তভাবে নীচে চলে এলাম। প্রভা দেবী তখন স্টেজের ওপর অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন। ধরাধরি করে তাঁকে স্টেজ থেকে মেয়েদের গ্রীনরুমে নিয়ে আসা হোল।

কিন্তু একি! এ যে নিদারুণ দুর্ঘটনা! একটা কাঠের চোক্‌লা পায়ের ভেতরে ঢুকে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে গেছে। ডাক্তারকে ডাকতে পাঠান হোল। তিনি এসে দেখলেন। বল্‌লেন—অপারেশন করে

বার করতে হবে। আমরা ত' মাথায় হাত দিয়ে বসলাম।

জহরবাবু বললেন—এ্যাক্সিডেণ্ট্-এর কথা দর্শকদের জানিয়ে দিন।

—তা না হয় দিলাম। কিন্তু তারপর ?

—তারপর আর কি, দর্শকেরা যদি refund চান, দিয়ে দিন। এ-ছাড়া আর উপায় কি!

বিরতির দশ মিনিটের জায়গায় প্রায় সতের-আঠার মিনিট পরে, আমি স্টেজে গিয়ে দুর্ঘটনার কথা দর্শকদের কাছে নিবেদন করলাম এবং জানালাম, আজ আর বোধহয় প্রভা দেবীর পক্ষে অভিনয় করা সম্ভব হবে না। যাই হোক, আপনারা ইচ্ছে করলে অপেক্ষা করতে পারেন, অথবা টিকিটের দাম ফেরত নিতে পারেন। কিন্তু এ কথা বলার পর দর্শকেরা বসেই রইলেন! কেউ-ই টিকিটের দাম ফেরত নিলেন না। প্রভা দেবীর দুর্ঘটনা হয়েছে জেনে সকলেই যেন মুষ্ড়ে পড়লেন। একদিকে ডাক্তার ছুরি-কাঁচি চালাচ্ছেন, অন্যদিকে গভীর উৎকণ্ঠায় দর্শকেরা গ্রীনরুমের দরজায় অপেক্ষা করছেন। আমাদের এ বিপদে আজ দর্শকেরাও যেন বিপদগ্রস্ত।

দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা পড়েছিল রাত্রি ৮॥৹টায়। আর রাত্রি ৯টা ২০ মিনিট নাগাদ শল্য-চিকিৎসার সাহায্যে কতকটা সুস্থ হয়ে উঠলেন প্রভা দেবী। সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে প্রশ্ন করলেন—আধ ঘণ্টার ওপরে লেট্ হোল বোধহয় ?

—হ্যাঁ তা হয়েছে। ওর জন্যে ভাবনার কি আছে? আমি দর্শকদের বলে দিয়েছি।

—কি বল্লেন ?

—আপনার এ্যাক্সিডেণ্ট্ হয়েছে।

—প্লে কি বন্ধ করে দিলেন নাকি ?

—হ্যাঁ। বন্ধ করতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু দর্শকেরা আমাদেরই মত উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছেন।

—কি লজ্জা! ড্রপ তোলার ব্যবস্থা করুন। আমি ঠিক হয়ে গেছি।

—কিন্তু আপনার কথায় ড্রপ্ তুলতে পারবো না। ডাক্তার-বাবুকে জিজ্ঞাসা করে দেখি। তিনি যদি অনুমতি দেন, তবেই আজ আবার ড্রপ উঠবে, নইলে এইখানেই আজ ইতি।

—কোথায়? ডাকুন না ডাক্তারবাবুকে, আমি তাঁকে বল্‌ছি।

ডাঃ সিন্‌হা কাছেই ছিলেন। প্রভা দেবীর কথায় একটু হাসলেন। তারপর বলেন—কি? পারবেন দাঁড়াতে?

—খুব পারবো। দাঁড়ানো কি বল্‌ছেন? অনুমতি দিলে ছুট্‌তেও পারবো। তাই বলে আধ-কপালে নিয়ে বাড়ি যাবো নাকি?

প্রভা দেবীর কথায় সকলেই হেসে ফেল্‌লেন। ফুট্‌লাইটের সামনে এগিয়ে গিয়ে জানালাম—প্রভা দেবী সুস্থ হয়েছেন। কাঠের চোক্‌লাটা অপারেশন করে বার করা হয়েছে। আমাদের সকলের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, তিনিই স্বেচ্ছায় অভিনয় করতে চাইছেন! বলছেন—পায়ে তো চোট্ লেগেইছে, তাই বলে আবার কপালের আধ-খানায়ও চোট্ লাগাবো নাকি? আর আধ-কপালে যদি ধরে, তা সে আমার একার ধরবে না, দর্শকদেরও ধরবে। কাজেই এ-যুক্তির পর আর আমাদের কোন ওজর করা সাজে না।

আমার ঘোষণা শুনে দর্শকেরা উৎফুল্ল হয়ে করতালি দিয়ে উঠ্‌লেন।

ড্রপ্ উঠ্‌লো। অভিনয় আবার শুরু হোল।

॥ **পথের মাঝে প্রমত্ত** ॥

রাত্রি ১টার পর রঙ্‌মহল থিয়েটারের রিহার্সাল ভাঙ্‌লো। শীতের রাত। স্টেজ থেকে বাইরে এসে শীতের প্রাদুর্ভাব অনুভব করলাম। হাড় কাঁপানো শীত।

মেয়েদের মোটর ও ঘোড়ার গাড়িতে করে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। গাড়ি ফিরে এলে, মোটরে অহীনদা (অহীন্দ্র চৌধুরী) যাবেন আর ঘোড়ার গাড়িতে আমি বাড়ি ফিরে যাব। আমার সঙ্গে ড্রেসার সত্যেন সর্বাধিকারী যাবে। সত্যেন সর্বাধিকারী আমার প্রতিবেশী। রাত-বিরেতে একজন সঙ্গে থাকা ভাল। আমাদের পাড়াটা বড় ভাল নয়, তাই শরৎদা (শরৎ চট্টোপাধ্যায়) সত্যেনকে আমার সঙ্গী করে দিয়েছেন। আগে ফিরে এলো মোটর। অহীনদা চলে গেলেন। সঙ্গে অহীনদা'র দারোয়ান পাঁড়ে আর ড্রাইভারের আর একজন সঙ্গী। শ্যামবাজার থেকে চেতলা। বড় কম রাস্তা ত' নয়।

তখনকার দিনে রিহার্সাল যেমন মাঝ রাতে ভাঙ্‌তো কিংবা রাত কাবার হয়ে যেত রিহার্সাল দিতে দিতে, তেমনি অনেক ঝুকি নিতে হোত থিয়েটারের মালিকদের। থিয়েটারের প্রতিটি শিল্পী ও কর্মীদের জন্যে থিয়েটার কর্তৃপক্ষ কার্ড ছাপিয়ে দিতেন। তাতে শিল্পী অথবা কর্মীর নাম লেখা থাকতো। পুলিশে কাউকে ধরলে সে ঐ কার্ড দেখিয়ে রেহাই পেতো। অর্থাৎ—আইডেন্টিটি কার্ড। আবার দুর্জনেরও অভাব ছিল না। যারা ঐ কার্ডখানিকে হাতিয়ার করে রাত-বিরেতে অনেক কুকীর্তিও করতো। যাই হোক, সেদিন আর এখন নেই। এখন সন্ধ্যায় রিহার্সাল বসে। রাত্রি ৯॥—১০টার মধ্যে রিহার্সাল ভেঙে যায়। সবদিকের ট্রাম-বাস চালু থাকে। কাজেই বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্যে আজ আর আইডেন্টিটি কার্ডের প্রয়োজন হয় না।

ঘোড়ার গাড়িটা ফিরে এলো যথাসময়ে। সত্যেনকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠ্‌লাম। কোন রকমে বাড়ি পৌঁছে লেপ মুড়ি দিয়ে শুতে

পারলে যেন বাঁচি। রঙ্‌মহলের গেট্‌টা পার হয়ে গাড়িটা ট্রাম রাস্তায় পড়তে না-পড়তেই একটি অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে ভেসে এলো।

—কে যায়?

—ভূমেনদা (ভূমেন রায়) নাকি?

—হ্যাঁ ভাই, তোমার জন্যেই বসে আছি।

আমার জন্যে? তা এই শীতে এখানে এই চায়ের দোকানের চাতালটায় বসে না থেকে ভেতরে গিয়ে দেখা করলেই ত' পারতেন।

—তা হয়ত পারতাম। কিন্তু থিয়েটার জায়গাটা তো বড় ভাল নয়। তাই—

গাড়ি থামিয়ে কথা বল্‌ছিলাম ভূমেনদার সঙ্গে, ইতিমধ্যে সত্যেন গাড়োয়ানকে বল্‌লে গাড়ি ছেড়ে দিতে। আর কোথায় আছে! ভূমেনদা শুরু করলেন যশোবন্ত সিংহের এ্যাক্টিং—'রাজায় রাজায় যখন যুদ্ধ হয়, তখন সেখানে বন্য-শৃগাল আসে কোন্ সাহসে?' গাড়ি থামিয়ে ভূমেনদার সঙ্গে দু'-চারটে কথা বলে এতক্ষণ যা বুঝতে পারিনি, এ্যাক্টিং শুনে এখন তা পরিষ্কার হয়ে গেল। বুঝলাম, এ মনমাতালের কথা নয়, এটা মদমাতালের কথা। সত্যেনকে সামাল দেবার জন্যে বল্‌লাম—আমার শরীরটা ভাল নেই, তার ওপর এই নিদারুণ শীতে এত রাত পর্যন্ত রিহার্সাল চল্‌লো, তাই ও ব্যস্ত হয়েছে আমায় বাড়ি পৌঁছে দেবার জন্যে।

That's right, নিশ্চয়ই—এত রাত পর্যন্ত এই শরীরে—না না—শরীরের ওপর যত্ন নিতে হবে। অনেকদিন বাঁচতে হবে তোমাকে। I love you। না না, কিছুতেই তোমার শরীরের ওপর অত্যাচার করা চল্‌বে না। আমি তোমার বড় ভাইয়ের মত, আমি কিছুতেই তোমাকে এত খাটা-খাটুনি করতে দেব না। ইত্যাদি, ইত্যাদি—

শরীরের দোহাই দিতে গিয়ে, আর এক ফ্যাসাদে পড়লাম। শুরু

হোল বক্তৃতা। কি করি, প্রসঙ্গটা চাপা দেবার চেষ্টা করে বল্‌লাম—তা'হলে চল্লি দাদা।

—যাবে? চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাই।

আমি যেন গুটিপোকা। নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে যাচ্ছি। তাই আম্‌তা আম্‌তা করে বল্‌লাম—আমার সঙ্গে যাবেন? কোথায়?

—ইমাম বক্স লেনে। অমুকের বাড়িতে।

—মাপ করুন দাদা, আমি পারবো না।

—তুমি ত' গরাণহাটা ফকির চক্রবর্তী লেনে ঐ কাছাকাছিই যাবে ভাই।

—যাবো। কিন্তু ইমাম বক্স লেনে ঢুক্‌তে পারবো না আমি।

—তা যদি না পাব, তা'হলে তোমাঁকে আগে নামিয়ে দিয়ে তারপব না হয় আমাকে—

—না, তাও হয় না।

বিরক্ত হয়ে সত্যেন আবার বলে বস্‌লো—কেন বিবক্ত করছেন ভূমেনদা? গাড়িটা কি ওঁব যে উনি গাড়োয়ানকে বলে দেবেন?

—চুপ্‌ রহ্‌ বেত্‌মিজ্‌!

হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন ভূমেনদা। তাঁকে শান্ত করবার জন্যে ব্যস্তভাবে বল্‌লাম—চলুন দাদা, বরং আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আমি চলে যাই।

—বাড়ি? সে ত' ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে ভাই! গৃহ শূন্য! তাই গৃহহীন! তার চেয়ে বরং তুমি বাকি রাতটুকুর মত আমায় বড়তলা থানায় জমা করে দিয়ে যাও। ও জায়গাটা safe। ওখানে থাকলে পাঁচ আইনের ভয় নেই। তা'ছাড়া থানা অফিসারেরা সকলেই আমাকে ভালোবাসেন। এ অবস্থায় তাঁরা আমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেবেন না।

ভূমেনদা পারিবারিক জীবনে বড় আঘাত পেয়েছিলেন। সে

জীবনটা ছিল তাঁর দুঃখের। লজ্জার! তাই কথা ক'টি বলার সঙ্গে সঙ্গে বেদনা ফুটে উঠ্‌লো তাঁর চোখে-মুখে।

কিন্তু গভীর রাত্রে একটা মানুষকে থানায় জমা দিতে যাওয়ার বিড়ম্বনা বড় কম নয়। তাই রূঢ়কণ্ঠে বল্‌লাম—বড়তলা থানা ত' পাশেই। ওর জন্যে গাড়ি করে পৌঁছে দেওয়ার দরকার কি? তাছাড়া থানা অফিসারেরা যখন ভালোবাসেন, তখন নিজে গিয়েই আশ্রয়টুকু করে নিন গে।

আমার কথায় সত্যেন সাহস পেল। গাড়োয়ানকে হুকুম করলো গাড়ি ছাড়তে। গাড়ি ছেড়ে দিল। ঐ নিদারুণ শীতে ভূমেনদা তখনও পথের মাঝে একা! ঘরের ব্যথাকে ভুলে থাকার জন্যে পথের মাঝে প্রমত্ত!

॥ মনে হচ্ছে, ও খেলে আমি মরে যাবো ॥

নৈহাটীর সিধু গাঙ্গুলী (সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী) প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিল নাট্য-জগতে। যেমন সুদর্শন, তেমনি সুকণ্ঠ। নানারকম চরিত্র-চিত্রণে সে ছিল দক্ষ। নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের থিয়েটার থেকে আরম্ভ করে, বাংলার প্রতিটি সাধারণ রঙ্গালয়ে সে কিছুদিন না কিছুদিন অভিনয় করে গেছে। মদে যদি তাকে না খেতো, তাহলে তার সমকক্ষ অভিনেতা পাওয়া দুরূহ হতো। ভারী মিষ্টি স্বভাবের মানুষ ছিল সিধু। কিন্তু তার শেষ জীবনে তাকে নিয়ে কাজ করা বড়ই ঝুঁকির ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার আসা না-আসাটা ছিল অনিশ্চয়তার মধ্যে। আর এই কারণে ইদানীং কোন থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাকে নিতে চাইতো না। এই জন্যে দীর্ঘদিন সিধু নাট্যশালার সংস্পর্শ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

আমি তখন রঙ্‌মহলে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'চাঁদবিবি'

নাটক নূতনভাবে সম্পাদনা করে মঞ্চস্থ করার তোড়জোড় করছি। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন সিধু এসে হাজির হোল। নৈহাটীতে আমার এক বোনের বিয়ে হয়েছিল, সেই সম্পর্কে সে আমাকে মামা বল্‌তো। একথা সেকথার পর আমাকে বলে বস্‌লো—তোমরা থাকতে আমি কি এইভাবে বসে বসে দিন কাটাবো?

—তাছাড়া আর উপায় কি? নিজে যদি নিজের পায়ে কুড়ুল মারো—

—তা মেরেছি। কিন্তু তোমরাও ত' কেউ হাত থেকে কুড়ুলটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করোনি?

—আমি করিনি। কিন্তু অনেকেই তা তোমার জন্যে করছেন। তুমি যে কিছুতেই নিজেকে নিজে সংশোধন করতে পারলে না।

—বিশ্বাস করো। মাসখানেকের ওপর হোল ও জিনিস আমি স্পর্শ করিনি।

—বৈরাগ্য এসেছে তাহলে?

—না। আমি আর stand করতে পারছি না। মনে হচ্ছে, ও খেলে আমি মরে যাবো।

—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, এই ভয়টুকু যেন তোমার বজায় থাকে।

—থাকবে। তোমরা আমায় কাজ দাও। কাজের মধ্যে ভুলিয়ে রাখ।

—কাজ করবে?

—হ্যাঁ। সেইজন্যই ত' তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।

—কিন্তু performance-এর দিন যদি ডুব মারো?

—মদ যখন ছেড়েছি, তখন ও বিশ্বাসটুকু তুমি রাখতে পার।

—বেশ। কাল সন্ধ্যায় এসো। থিয়েটারের মালিকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে দেখবো।

সিধু চলে গেল।

রঙ্‌মহলের তখন প্রধান শিল্পী জহর গাঙ্গুলী মশাই। সন্ধ্যায় তাঁকে বল্‌লাম—সিধুর কথা।

সব শুনে বল্‌লেন—দেখুন না একটা chance দিয়ে। Artist ত' ভাল।

এ্যাটর্নী শ্রীসুমোহন চট্টোপাধ্যায় মশাই ছিলেন তখন রঙ্‌মহলের রিসিভার। তিনি এলে তাঁকেও সিধুর কথা বল্‌লাম।

সব শুনে সুমোহনবাবু বল্‌লেন—তা বেশ তো। Chance দিয়ে দেখ্‌তে দোষ কি ?

পরের দিন সিধু এলো। মাইনে ঠিক হোল। আমি বললাম—সব টাকা কিন্তু তোমার হাতে দেব না। অর্ধেক টাকা তোমায় দেব আর অর্ধেক বাড়িতে পাঠাবো। আমার প্রস্তাবে সিধু এক কথায় সম্মত হোল। সেদিন তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে, সত্যিই আমি খুব আশান্বিত হলাম। মনে হোল, সত্যিই সিধুর পরিবর্তন হয়েছে। 'চাঁদবিবি' নাটকে ইব্রাহিম শা-র ভূমিকাটি তাকে দিলাম। নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার মাত্র তিনদিন পূর্বে সিধুকে পার্ট দেওয়া হোল। অপূর্ব অভিনয়ে জীবন্ত করে তুল্‌লো ইব্রাহিম শার ভূমিকাটি। অজস্র অভিনন্দন কুড়োলো দর্শকদের কাছ থেকে। প্রায় প্রতিটি দৃশ্যে করতালি লাভ করলো। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিনয় হোল বেশ সাফল্যের সঙ্গে।

চতুর্থ অভিনয়ের দিন ঘট্‌লো দুর্ঘটনা। বেলা প্রায় সাড়ে পাঁচটার পর, রঙ্‌মহলের অন্যতম অভিনেতা ষষ্ঠী দে (স্বর্গত অভিনেতা কার্তিক দের পুত্র। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার শিল্পী-গোষ্ঠিভুক্ত) থিয়েটারে এসে জানাল, সিধু শিয়ালদহ স্টেশনে বেহেড্‌ অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। সিধু আস্‌তো নৈহাটী থেকে। আর ষষ্ঠী আসতো খড়দহ থেকে। উভয়েই ছিল ডেলিপ্যাসেঞ্জার। ষষ্ঠী সিধুকে থিয়েটারে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সিধু আসতে চায়নি। কি করি, ষষ্ঠীর কথা শুনে থিয়েটারের গাড়ি নিয়ে ছুট্‌লাম

শিয়ালদহ স্টেশনে। স্টেশনের চায়ের দোকানে সিধু তখন কয়েকজন রেল কর্মচারীর সঙ্গে কথা বল্‌ছিল। আমাকে দেখে বেশ সপ্রতিভভাবেই বল্‌লে—ষষ্ঠীর কাছে শুনে, ছুটে এসেছ বুঝি ?

—হ্যাঁ। গাড়ি এনেছি। এসো আমার সঙ্গে।

—চলো।

স্বাভাবিক ব্যক্তির মতই আমার সঙ্গে গাড়িতে এসে বসলো। গাড়ি start নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হোল অসংলগ্ন প্রলাপ। কোনরকমে থিয়েটারে নিয়ে এসে, সেদিনের মত অভিনয় করালাম। সাজঘরে যে মানুষ টল্‌ছে, দাঁড়াতে পারছে না, স্টেজে সেই মানুষ অভিনয় করছে, হাততালি পাচ্ছে। কে বল্‌বে নেশা করেছে ? অভিনয়ের শেষে সিধুকে ডেকে পাঠালাম।

বললাম—তে-রাত্রি কাটতে না কাটতেই কথার খেলাপ কর্‌লে ?

—করলাম। ব্যাপারটা কি জান, যখন বেকার থাকি, তখন বন্ধুবান্ধবদের দেখা পাই না। খবরের কাগজে, পোস্টারে নাম পড়্‌লেই অমনি দেখি ভাগাড়ে শকুনের দল ছুটে আসে। আর নিজেও ঠিক থাকতে পারি না।

—ভাল। যাই হোক, অনেক আশা করে তোমাকে নিয়েছিলাম। তুমি আমাকে নিরাশ করেছ। তোমার পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে আমাকে রেহাই দাও।

এরপর সিধু আর কোন কথা বল্‌লো না। টাকা-পয়সা মিটিয়ে নিয়ে চলে গেল। এই ঘটনার মাসখানেক বাদে একদিন সন্ধ্যার পর সিধু এলো রক্তাক্ত অবস্থায়। বর্ষাকাল। বৃষ্টি হচ্ছিল। মত্ত অবস্থায় প্রথমে গিয়েছিল শ্রীরঙ্গমে। সেখান থেকে বেরিয়ে ট্রামে উঠ্‌তে গিয়ে পড়ে গেছে। গায়ের আদ্দির পাঞ্জাবি, পরনের কালাপাড় দেশী ধুতি ছিঁড়ে গেছে। সর্বাঙ্গ কর্দমাক্ত।

তার অবস্থা দেখে দুঃখু হোল। যে জায়গাগুলো কেটেকুটে গিয়েছিল, পরিষ্কার করে, ওষুধ দিয়ে, ব্যাণ্ডেজ করে তাকে পাঠিয়ে দেবার

ব্যবস্থা করলাম। যাবার সময় কোন কথাই সে বল্‌লো না, শুধু বেদনা-কাতর মুখে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে চলে গেল। একটা প্রতিভার অপমৃত্যু সেদিন আমাকেও কাতর করে তুলেছিল।

এর বছরখানেক পরে সে নৈহাটী স্টেশন প্লাটফর্মেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে।

তার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সেদিন বার বার এই কথাটাই মনে হয়েছিল, যা খেলে ইদানীং তার ভয় হয়েছিল মরে যাবো বলে, শেষ পর্যন্ত তাই খেয়েই সে মৃত্যুঞ্জয় হোল!

॥ হায় দাঁত্‌লি ॥

নট-নাট্যকার অপরেশচন্দ্র তখন স্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ। সে সময় একদিকে যেমন নাট্যকার হিসাবে তিনি জনপ্রিয়, অপরদিকে তেমনি নাট্য-শিক্ষক হিসাবেও তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। রাশভারী মানুষ ছিলেন অপরেশচন্দ্র। নাট্যশালা পরিচালনার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সুদক্ষ। নাট্য শিক্ষাদানের সময় তিনি শিল্পীদের অনুপস্থিতি বা মহলার সময় অন্যমনস্কতা মোটেই বরদাস্ত করতেন না। থিয়েটারে বসে নাট্য-রচনার কাজ করলেও, অনেক সময়ে তিনি দমদমে ৺গদাই মল্লিক মহাশয়ের বাগানবাড়িতে গিয়ে নিরিবিলিতে নাটক রচনা করতেন।

যে সময়ের কথা বল্‌ছি, সে সময়ে কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়-গুলির কাছে মাঝে মাঝে মফঃস্বল শহর থেকে অভিনয় করার আহ্বান আস্‌তো।

তখনকার দিনে শনি-রবিবারের অভিনয় বন্ধ রেখেও সাধারণ রঙ্গালয়গুলি অনেক সময় অভিনয় করতে যেতেন মফঃস্বলে। আজকের দিনে শনি-রবিবারে সাধারণ রঙ্গালয়গুলি যে অর্থ উপার্জন করেন, মফঃস্বলের লোকের পক্ষে সে অর্থ দিয়ে কলকাতার থিয়েটার নিয়ে

যাওয়া সম্ভব হয় না। আর এই কারণে, সাধারণ রঙ্গালয়গুলি শনি-রবিবারের অভিনয় আসর বন্ধ রেখে মফঃস্বলে অভিনয় করতে যেতে নারাজ। তা ছাড়া এখনকার অধিকাংশ থিয়েটারের শিল্পীই চলচ্চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তাঁদের পক্ষে ছবির স্যুটিং বন্ধ রেখে বাইরে যাওয়া সম্ভব হয় না। আজকের থিয়েটার পরিচালনা অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

তখনকার দিনে রাজা-মহারাজা, বড় বড় জমিদার বাড়ি থেকে থিয়েটারের ডাক আস্‌তো। বিবাহ, উপয়ন, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি শুভকাজে কলকাতার থিয়েটার নিয়ে গিয়ে আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হোত। আর মফঃস্বলের এইসব বায়নায় থিয়েটার কর্তৃপক্ষ বেশ মোটা টাকা লাভ করতেন। সে যুগে শিল্পীর সঙ্গে যে চুক্তি হোত, সেই চুক্তিপত্রে বাইরে যাওয়ার কথাও লেখা থাক্‌তো।

তখনকার দিনে সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত পাঁচ-ছয় ঘণ্টা ধরে নাটকাভিনয় চল্‌তো। তা'ছাড়া মধ্যে মধ্যে সারা রাত্রিব্যাপী অভিনয় এবং বিদেশে গিয়ে অভিনয় করার ফলে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে খুব বেশী মেলামেশার সুযোগ-সুবিধা হোত। যার ফলে, সে সময়কার বহু অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠ্‌তো। আর বিশেষ করে এই কারণেই থিয়েটারের কাজ সে যুগে অধিকতর নিন্দনীয় হয়ে উঠেছিল।

বিদেশে বায়না নিয়ে স্টার থিয়েটার গেছে অভিনয় করতে। অভিনেতা-অভিনেত্রী ছাড়া ঠাকুর, চাকর, দারোয়ান সঙ্গে গেছে। অধ্যক্ষ অপরেশচন্দ্র এবং তাঁর সহকারীও গেছেন সেই সঙ্গে।

একটা বাড়িতে অপরেশচন্দ্র ও অভিনেতাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে এবং তারই অদূরে অপর একটি বাড়িতে অভিনেত্রীদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। পর পর কয়েকদিন ধরে অভিনয় হচ্ছে। রাত্রে অভিনয়ের সময়টুকু ছাড়া অন্য সময়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে দেখা সাক্ষাতের সুযোগ-সুবিধা হয় না। অধ্যক্ষ অপরেশচন্দ্রের কড়া নজর। ইচ্ছে

থাক্‌লেও কেউ সাহস করে না ভয়ে। হঠাৎ একদিন সকাল ৯-১০টা নাগাদ অপরেশচন্দ্রের সহকারী অপরেশচন্দ্রকে এসে জানালেন যে, ও বাড়িতে কয়েকটি মেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

অপরেশচন্দ্র শুনে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—কে? কে?

সহকারী নাম করলেন কয়েকজন অভিনেত্রীর। অপরেশচন্দ্র শুনলেন। কিন্তু এরজন্যে কোন উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন না। শুধু সহকারীকে জিজ্ঞেস করলেন—তারা সব গেল কোথায়?

—শহর ঘুরে দেখতে গেছে।

—ও! আচ্ছা, চলো।

চাদরটি কাঁধে ফেলে, হাতে লাঠিটি নিয়ে অপরেশচন্দ্র সহকারীর সঙ্গে চল্‌লেন—অভিনেত্রীদের দেখতে।

ইতিমধ্যে অভিনেত্রীদের অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার খবর অভিনেতাদেরও কানে গেছে। যার সঙ্গে যার ঘনিষ্ঠতা প্রত্যেকেই তার মাথার কাছে বসে, কেউ মাথায় জল ঢাল্‌ছে, কেউ পাখার বাতাস করছে। অপরেশ-চন্দ্র এসে দূর থেকে একনজরে দেখে সহকারীকে বল্‌লেন—ঠিক আছে। ফিরে চলে আসবেন এমন সময়ে বারান্দার কোণে আর একটি মেয়েকে পড়ে থাকতে দেখে, সহকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন—ওটা আবার কে?

—আজ্ঞে, দাঁত্‌লি পাঁচি।

সহকারী যে মেয়েটির কথা জানালেন, সে মেয়েটির সামনের দাঁতগুলি একটু উঁচু ছিল। ব্যালেতে নাচ্‌তো। দেখতে ভাল ছিল না। তবে নাচিয়ে হিসেবে তার সুনাম ছিল। অপরেশচন্দ্র ধীরে ধীরে তার কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁরপর লাঠি দিয়ে একটু ঠেলে বল্‌লেন—আঃ মর! তুই আবার অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিস্‌ কি জন্যে? তোর মাথার শিয়রে বসে পাখার বাতাস করতে কে আসবে? ওঠ্‌— উঠে পড়্‌।

অপরেশচন্দ্রের ধম্‌কানিতে দাঁত্‌লি পাঁচি উঠে বস্‌লো।

ওদিকে মনের মানুষদের কাছে পাবার জন্যে যারা কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, তারা ততক্ষণে প্রেমাস্পদদের সঙ্গে গল্পগুজবে মেতেছে। আর দাঁত্‌লি হয়ত তখন ভাবছিল হঠাৎ এতবড় ভুলটা সে করতে গেল কেন ?

—হায় দাঁত্‌লি !

॥ গোলাঝাড়ারদলের খেসারত ॥

'—এদিকে আয় সব গোলাঝাড়ারদল !'

যারা কোরাসে গান গাইবে, তাদের উদ্দেশে হাঁক দিলেন সঙ্গীত-পরিচালক দেবকণ্ঠ বাগচী। এই গোলাঝাড়ারদলে সেদিন যাঁরা কোরাসে গান গাইতেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কুমার মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (হরবোলা) প্রভৃতি। 'গোলাঝাড়ারদল' এই সম্বোধনটা ভাল লাগ্‌তো না কারুরই। সত্যি, ভালই বা লাগ্‌বে কি করে ? 'গোলাঝাড়ারদল' এই সম্বোধনের অন্তর্নিহিত মানেটা ত' ভাল নয়। ভাল ধানগুলো গোলা থেকে নিঃশেষিত হয়ে গিয়ে যে ক'টা পোকালাগা, বাছ্‌পড়া ধান পড়ে আছে। একথা প্রত্যহ শুন্‌তে কারই বা ভাল লাগে ? অথচ মুখ ফুটে বল্‌বার কারুর উপায় নেই, সাহস নেই।

সেকালে দেবকণ্ঠ বাগচী মশাই সঙ্গীত-শাস্ত্রে যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, তেমনি সঙ্গীত-পরিচালক হিসাবে তাঁর খ্যাতিও ছিল। যে সময়ের কথা বল্‌ছি, বাগচী ম'শায়ের সে সময় বেশ বয়েস হয়েছে। মেজাজটা ছিল একটু খিট্‌খিটে। বেসুরো বা বেতালা হলে আর রক্ষে ছিল না। কিন্তু অদম্য উৎসাহ আর নিষ্ঠা ছিল তাঁর সঙ্গীতশিক্ষাদানের ব্যাপারে।

সেকালে নিত্য নতুন নাটক খোলা হোত। কারণ, আজকের মত সেদিন নাটকের এত দর্শক ছিল না। পঁচিশ, পঞ্চাশ বা বড় জোর পঁচাত্তর রাত্রি অভিনয়ের পরই খুল্‌তে হোত নতুন নাটক। বুধবার,

বৃহস্পতিবার এবং শনি-রবিবার পৃথক পৃথক নাটকের অভিনয় হোত। কোনদিন বা পৌরাণিক, কোনদিন বা ঐতিহাসিক, কোনদিন বা সামাজিক, এ ছাড়া মধ্যে মধ্যে নাচগানের নাটকও মঞ্চস্থ হোত। কাজেই, অভিনয়ের দিন ছাড়া প্রায় প্রতিদিনই রিহার্সাল থাক্‌তো। শিল্পীদের এবং কর্মীদের রোজই আস্‌তে হোত থিয়েটারে। আবার যাদের গান এবং পার্ট দুই-ই থাক্‌তো, তাদের ত' আর খাটুনির অন্ত ছিল না। সকাল, দুপুর, রাত্রি, সবসময়েই তারা পড়ে থাক্‌তো থিয়েটারে। এর ওপর তারা যদি ঐ 'গোলাঝাড়ারদল' শোনে, তাহলে কি ভাল লাগে? তাছাড়া মেয়ে এবং ছেলেদের যদি একসঙ্গে কোন কোরাস গান থাক্‌তো, তখন ছেলেদের পক্ষে আরও মুস্কিল হোত। কেন না, মেয়েদের সাম্‌নে 'গোলাঝাড়া' সম্বোধন ছেলেদের কাছে লজ্জা এবং অপমানজনক হয়ে দাঁড়াতো। এর মধ্যে আবার কোন ছেলে যদি কোন মেয়ের দিকে চাইলো, কি কোন মেয়ের সঙ্গে দু'টো কথা কইলো, তাহলে আর রক্ষে থাকতো না গোলাঝাড়াদের।

এই গোলাঝাড়ারদলের সর্দার ছিলেন কুমার মিত্র। যেমন কাজের মানুষ, তেমনি ছিলেন ডানপিটে। একদিন কুমার মিত্র, হরিদাসকে (হরবোলা) শিখিয়ে দিলেন—দেখ্‌ মাস্টারমশাইকে আসতে দেখ্‌লেই তুই কোথাও কিছুক্ষণের জন্যে গা ঢাকা দিয়ে থাক্‌বি। তারপর ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে মাস্টারমশাইকে বল্‌বি—মাস্টারমশাই, আপনার বাড়িতে বড্ড বিপদ! কে নাকি ছাদ থেকে পড়ে গেছে।

তুলসী চক্রবর্তী সব শুনে বললেন—তারপর?

—তারপর আর কি? ছুটুক্‌ বুড়ো মুক্তকচ্ছ হয়ে—

কুমার মিত্রের পরামর্শমত গোলাঝাড়ারদল ঐ কাণ্ডই করে বসলেন। হরিদাস (হরবোলা) ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে খবর দিলেন। বাগচীমশাইও ছুট্‌লেন হন্তদন্ত হয়ে।

আধ ঘণ্টা তিন কোয়ার্টারের মধ্যেই আবার বাগচীমশাই ফিরে এলেন থিয়েটারে। 'গোলাঝাড়ারদলেরা' ততক্ষণে যে যার সরে

পড়েছে। বাগচীমশাইয়ের মুখচোখ রাগে থম্ থম্ করেছে। সোজা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এলেন অপরেশচন্দ্রের ঘরে। অপরেশচন্দ্র সে সময় স্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ। নালিশ করলেন অধ্যক্ষের কাছে, গোলাঝাড়াদের নামে।

পরের দিন অপরেশচন্দ্র ডেকে পাঠালেন—কুমার মিত্র, তুলসী চক্রবর্তী, হরিদাস (হরবোলা) প্রভৃতিকে।

হরিদাস বল্‌লেন—ওঁর বাড়ির কাছের একটি লোক ব্যস্তভাবে এসে আমাকে ঐ কথা জানাতে বলেছিল বলে আমি জানিয়েছিলাম। সে যদি মিথ্যে খবর দিয়ে যায়, আমি কি করবো বলুন ?

অপরেশচন্দ্র ছিলেন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। হরিদাসের কথা তিনি বিশ্বাস করলেন না। উপরন্তু, 'গোলাঝাড়ারদলে'র প্রত্যেককে আট আনা করে জরিমানা করে দিলেন।

॥ নগদ পাওনা ॥

রবি রায় আচার্য শিশিরকুমারের মন্ত্র-শিষ্যদের অন্যতম। একটানা দীর্ঘকাল তিনি বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শুধু যে অভিনয় করতেন তাই নয়, সেই সঙ্গে সাহিত্যচর্চাও করতেন। বিশেষ করে, সঙ্গীত রচনায় তাঁর বেশ হাত ছিল।

রঙ্‌মহল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনিও একজন। তাঁরই অদম্য উৎসাহ ও চেষ্টায় যে রঙ্‌মহল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়, একথা বল্‌লে অত্যুক্তি করা হবে না।

রংপুরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে, শিশিরকুমারের অসামান্য প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অভিনয় করে গেছেন। বাংলা দেশের সব ক'টি সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গেই তিনি কিছুদিন না কিছুদিন সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শেষ

জীবনে তিনি স্টার থিয়েটারের শিল্পী গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন।

নটের উপযুক্ত চেহারা এবং কণ্ঠস্বর। চোখ দু'টি টানা টানা। কিন্তু জন্মাবধি একটি চোখে দৃষ্টি ছিল না। অথচ এমনি দেখ্‌লে বোঝবার উপায় ছিল না যে, সেই চোখটি অকেজো। একটি মাত্র চোখই যাঁর সম্বল, শেষ জীবনে সেই চোখটিতে ছানি পড়লো। বেশ ভালভাবেই অপারেশন্‌ হোল। কিন্তু অন্য উপসর্গ দেখা দিল। মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগ থেকে তাঁকে সাধারণ চিকিৎসা বিভাগে ভর্তি করা হোল। কিন্তু সর্ববিধ চেস্টাতেও তাঁকে বাঁচিয়ে তোলা গেল না। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।

রবিদা বড্ড স্নেহপ্রবণ মানুষ ছিলেন। যাঁরা তাঁর স্নেহ-সান্নিধ্য একবার লাভ করেছিলেন, তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে, রবিদা'র সে স্নেহ-ভালবাসার মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না।

জীবনের শেষের দিকে রবিদা দর্শকদের কাছ থেকে তাঁর অভিনয়ের স্বীকৃতি-স্বরূপ একটু-আধটু হাততালির প্রত্যাশা করতেন। তাঁর যারা অনুজপ্রতিম, তারা যেমন এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতো, তেমনি বন্ধুস্থানীয় অভিনেতারাও তাঁর এই হাততালি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঠাট্টা করতেন।

মিনার্ভা থিয়েটারে শরৎচন্দ্রের 'কাশীনাথ' মঞ্চস্থ হবে। সন্ধ্যা থেকে দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত মহলা চলেছে। 'কাশীনাথ' নাটকে অভাবনীয় অভিনেতৃ-সম্মেলন হয়েছিল। অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, রবি রায়, সন্তোষ সিংহ, শ্যাম লাহা, সরযূবালা, সুহাসিনী, নীরদাসুন্দরী, সীতা দেব প্রভৃতি নাটকের বিভিন্ন অংশে আত্মপ্রকাশ করেন। রবিদা খাজাঞ্চি আর সন্তোষ সিংহ দেওয়ান। একদিন মহলার শেষে রবিদা আমাকে বল্‌লেন—দেখ্‌, আমার পার্টটায় কেমন যেন জোর পাচ্ছি না।

—জোর পাচ্ছেন না? কেন?

—কি জানি। মনে হচ্ছে, সন্তোষ আমাকে মেরে বেরিয়ে যাবে।

—কি করে ? সন্তোষদা ত' ভিলেন। আপনার ত sympathetic role।

—তা হলে কি হয় ? কোথাও ত' জায়গা নেই sympathy আদায় করবার।

—আপনার মহত্ব দর্শকদের কাছে ধরা পড়তে বাধ্য।

—সেটা ত' total effect। যেখানে দেওয়ানের সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি হচ্ছে, ঐ জায়গায় তুই আর কিছু কথা জুড়ে দে ভাই। যাতে নগ্‌দা-নগ্‌দি দর্শকদের কাছ থেকে sympathyটা আদায় করে নিতে পারি।

বুঝ্‌লাম রবিদা হাততালির পক্ষে অনুকূল এমন কিছু সংলাপ চান। দীর্ঘরাত্রি পর্যন্ত পথে দাঁড়িয়ে আলোচনা হোল। বল্‌লাম—ঠিক আছে। কাল কিছু সংলাপ লিখে এনে ঐ জায়গায় জুড়ে দেব। আপনি একটু সকাল সকাল থিয়েটারে আসবেন।

পরের দিন থিয়েটারে এসে দেখি, রবিদা আমার আগেই থিয়েটারে এসে বসে আছেন। পকেট থেকে কাগজের টুক্‌রো বার করে আড়ালে নিয়ে গিয়ে তাঁকে পড়ে শোনালাম।

শুনে রবিদা বল্‌লেন—ঠিক আছে।

প্রম্পটারকে ডেকে খাতায় কথা ক'টা লিখিয়ে দিলাম।

ইতিমধ্যে একে একে এসে শিল্পীরা উপস্থিত হলেন। মহলা শুরু হোল। প্রথম দৃশ্য থেকে পর পর মহলা চলেছে। দেওয়ান ও খাজাঞ্চির কথা কাটাকাটির দৃশ্যটিও এলো। আমি অহীনদা ও ছবিদাকে বল্‌লাম—এই দৃশ্যে খাজাঞ্চির কিছু নতুন সংলাপ সংযোজিত করেছি।

অহীনদা বল্‌লেন—বেশ, বলাও।

বলানো হোল। সংলাপ ক'টি রবিদা পূর্বেই রপ্ত করে নিয়েছিলেন সুতরাং নতুন সংলাপ তিনি বল্‌লেনও চমৎকারভাবে।

রবিদা নতুন সংলাপ বলার সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষদা হাততালি দিয়ে উঠ্‌লেন। এবং অহীনদা ও ছবিদা পরস্পর পরস্পরের দিকে চেয়ে

একটু হাসলেন।

রবিদা বল্‌লেন—সন্তোষ, তুমি হাততালি দিলে কেন?

সন্তোষদা বল্‌লেন—আমি আগাম দিয়ে রাখলাম। রোজই তুমি এই জায়গায় হাততালি পাবে বলে—

অহীনদা বল্‌লেন—আহা! চেপে যাও না সন্তোষ।

রবিদা ততক্ষণে বেশ চটে গেছেন। সন্তোষদা'র দিকে চেয়ে বল্‌লেন—তার মানে?

ছবিদা বল্‌লেন—মানে? মানে, অর্ডারি মাল। বুঝ সাধু যে জান সন্ধান!

ছবিদা'র কথায় সকলে হো হো করে হেসে উঠ্‌লেন।

অহীনদা বল্‌লেন—তা তোমরা যাই বলো ছবি, দেবু কিন্তু রবির ওপর বিশ্বাস রাখে। কথা ত' অনেককেই দেওয়া যেত। তা ত' দেয়নি। রবিকেই দিয়েছে। কারণ, দেবু জানে, রবি হাততালিটা তুল্‌তে পারবে।

অহীনদা'র কথায় আর এক দফা হাসির হুল্লোড় বয়ে গেল।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত রবিদা'র সংলাপগুলি বহাল থাক্‌লো। প্রত্যহ ঠিক ঐ জায়গাতে রবিদা হাততালিও পেতে লাগলেন। পাঁচ সাতটি অভিনয়ের পর সন্তোষদা একদিন রবিদা'কে বল্‌লেন—হাত-তালির জন্য দেবুকে কি ঘুষ দিয়েছ জানি না। আমাকেও কিন্তু তোমার ঘুষ দেওয়া উচিত রবিদা।

রবিদা গম্ভীরভাবে বল্‌লেন—দেবুকেও কিছু দিইনি। তোমাকেও কিছু দেব না।

—বেশ। দেখি, তুমি আজ কি করে হাততালি পাও। কথা ক'টি বলে সন্তোষদা চলে গেলেন।

যে কথা সেই কাজ। সত্যিই সেদিন আর রবিদা হাততালি পেলেন না। ব্যাপারটা হোল কি, সন্তোষদা তাঁর সংলাপটা সেকেণ্ড দু'-তিন পরে বল্‌লেন এবং যার ফলে, রবিদা'র পক্ষে আর হাততালি পাওয়া সম্ভব হোল না। সিন্ থেকে বেরিয়ে এসে রবিদা সন্তোষদা'কে বল্‌লেন

—ইয়ার্কি করে দেখ্ দেখি কি কর্‌লি?

সন্তোষদা রসিয়ে বল্‌লেন—তাহলে বুঝ্‌ছো ত' রবিদা, হাততালি নিতে হলে শুধু নাট্যকারকেই হাতে রাখলে হয় না, কো-এ্যাক্টরকেও হাতে রাখতে হয়।

—যা যা, ইয়ার্কি করিস্ নে। কথা ক'টি বলে রবিদা পাশ কাটালেন।

এরপর সন্তোষদা আর কোনদিন অবশ্য ইয়ার্কি করেননি। রবিদা রোজই নগদ হাততালি আদায় করতেন দর্শকদের কাছ থেকে।

॥ মহাদেবের বিদায় গ্রহণ ॥

ক'দিন ধরেই ছেলেটি থিয়েটারে যাতায়াত করছে। ইচ্ছে, থিয়েটারের শিল্পী গোষ্ঠীভুক্ত হওয়া। এমনিই ত' প্রত্যহ কতজনই আস্‌ছে শিল্পী হওয়ার জন্যে। কিন্তু এই ছেলেটিকে দেখে কেন জানি না নিজের অজ্ঞাতসারেই মনের কোনে বেশ একটু সহানুভূতির উদ্রেক হয়েছে। অবশ্য তার অভিনয়-ক্ষমতা কতখানি আছে, তা যাচাই করার সুযোগ আমার হয়নি। কিন্তু চেহারাটা তার ভারী মিষ্টি। গৌরবর্ণ একহারা দেহ। খুব বেঁটে বা খুব লম্বা নয়। টানা টানা চোখ। মুখাখানি সুন্দর। এককথায় নায়ক হবার মত চেহারা।

স্টার থিয়েটারে সে সময়ে 'শ্যামলী' নাটক চল্‌ছে। একটানা বছর দেড়েক অভিনয় হয়ে গেছে। তখন স্টার থিয়েটারের নাট্য-পরিচালক ছিলেন শ্রীযুক্ত শিশির মল্লিক ও শ্রীযুক্ত যামিনী মিত্র। কাজেই, ছেলেটিকে বল্‌তে হোল—আপনি দু-একদিন পরে দেখা করবেন। মল্লিকসাহেব ও যামিনীদা'কে বল্‌বো আপনার কথা।

নির্দেশমত দিন দুই পরে ছেলেটি এলো। মল্লিকসাহেব ও যামিনীদা'র কাছে নিয়ে গেলাম ছেলেটিকে। দেখে দু'জনেরই

পছন্দ হোল। শিক্ষানবিশ শিল্পী হিসাবে বহাল করা হোল ছেলেটিকে। অভিনয়ের দিনে নিয়মিত আসে যায়। শিল্পীসুলভ বেশবিন্যাস। সেই সঙ্গে চলনটিও। দেখেশুনে মনে করেছিলাম, চেহারাটা ত' আছে, কিছুটা অভিনয়ও যদি করতে পারে, তা'হলে শিল্পী হিসাবে কোনদিন না কোনদিন প্রতিষ্ঠা পেতেও পারে। যাই হোক, কোন নাটকে তাকে নামিয়ে পরীক্ষা করবার তখন সুযোগ ছিল না। কেন না, 'শ্যামলী'র তখন এককভাবে অভিনয় হচ্ছিল।

মাসকয়েক-এর মধ্যেই ছেলেটিকে পরীক্ষা করার সুযোগ এসে গেল। শিবরাত্রি উপলক্ষে সারারাত্রিব্যাপী কয়েকটি নাটক অভিনয় হবে। মনে মনে ঠিক করলাম, যে কোন নাটকে ছোটোখাট একটা ভূমিকায় তাকে নামিয়ে পরীক্ষা করবো। সেবার শিবরাত্রিতে আমাদের 'শ্যামলী', 'মিশরকুমারী' আর 'উর্বশী' নাটক অভিনয় করা হবে ঠিক হোল। প্রথমে 'শ্যামলী', তারপর 'মিশরকুমারী' এবং সর্বশেষে 'উর্বশী'র অভিনয় হবে। 'উর্বশী'তে ছোটখাট অনেকগুলি চরিত্র ছিল। সুদর্শন ছেলেটিকে মহাদেবের ভূমিকা দিলাম। কথা সামান্য। মহলায় কথাগুলো বার বার রপ্ত করিয়ে দেওয়া হল। ঐ সামান্য কথা কয়টি রপ্ত করাতে বেশ কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। ছেলেটির অভিনয় সম্ভাবনা সম্বন্ধে যেটুকু আশা করেছিলাম, ক'দিনের মহলায় সেটুকু আর রইলো না। যাই হোক, ভূমিকা দিয়ে তখন আর তা ফিরিয়ে নিতে মন চাইলো না। বিশেষ করে প্রথম পদক্ষেপেই যদি বাধাপ্রাপ্ত হয়, তা'হলে বড়ই নিরুৎসাহিত হয়ে পড়বে এই মনে করে আমরা যথাসম্ভব শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করে নেবার চেষ্টা করেছিলাম।

শিবরাত্রির দিনে যথারীতি সারারাত্রিব্যাপী অভিনয় শুরু হোল। 'শ্যামলী', 'মিশরকুমারী' শেষ হলে শুরু হোল 'উর্বশী'। রাত্রি তখন তিনটে বেজে গেছে। 'উর্বশী'র অভিনয় চলছে। আমি ওপরের ঘরে। আর যামিনীদা সপরিবারে স্টেজ বক্স-এ বসে অভিনয় দেখছেন। স্টার

থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সলিলকুমার মিত্র ও মল্লিকসাহেব রাত্রি সাড়ে নটায় চলে গেছেন। সারারাত্রিব্যাপী অভিনয়ের অনেক হাঙ্গামা। কি জানি, কখন কি দরকার হয় তাই আমি আর যামিনীদা আছি। রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে চারটে। যামিনীদা স্টেজ বক্স থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন আমার ঘরে। বল্‌লেন—সেই সন্ধ্যে থেকে পর পর বড় বড় নাটক দু'টো বেশ সুষ্ঠুভাবে অভিনয় হয়ে এলো, আর শেষ রাত্রে কি না তাডা খেলো তোমার ঐ মহাদেব!

—বলেন কি!

—হ্যাঁ। তুমি কি অভিনয় দেখ্‌ছো না?

—এতক্ষণ দেখছিলাম। এই একটু আগে ঘরে এসেছি।

—ছিঃ ছিঃ! সারারাত্রের সমস্ত খাটুনিটা একেবারে পণ্ড করে দিলে! না না, ও রাঙা মূলোটির আর দরকার নেই। কালকেই ওকে জবাব দিয়ে দাও।

কথাগুলো বলে যামিনীদা উত্তেজনায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ভাবতে লাগ্‌লাম, অমন সুন্দর চেহারা অথচ অভিনয়ের ক্ষমতা নেই। আবার যার অভিনয় ক্ষমতা আছে, তার চেহারা নেই।

এইরকম সাত পাঁচ ভাব্‌ছি, ইতিমধ্যে যামিনীদা আবার ফিরে এলেন। বল্‌লেন—তোমার ঐ মহাদেবকে কাল জবাব দিতে বলেছিলাম। কিন্তু তার আর দরকার কি? সকাল ত' হয়েই গেছে, ওকে আজকেই বলে দাও। কথা ক'টি বলে যামিনীদা চলে গেলেন।

উন্মুক্ত জানালার দিকে চেয়ে দেখি,- সত্যিই সকাল হয়ে গেছে। ভোরের আলো এসে পড়েছে, সারা ঘরময়। কাজেই কালবিলম্ব না করে মহাদেবকে বিদায় দিতে হোল।

॥ বাঁধা উনি মাধবের পায়— ॥

তখন শরৎ চট্টোপাধ্যায় রঙ্‌মহলের স্বত্বাধিকারী। ডিসেম্বর মাসে, বড়দিনে নতুন নাটক খোলা হবে। তোড়জোড় চল্‌ছে। মহলা শুরু হবে দু-একদিনের মধ্যেই। শরৎদাকে দেখলাম মহাব্যস্ত হয়ে উঠেছেন জনৈক অভিনেতার কণ্ট্রাক্টের মেয়াদ আর এক বছর বাড়িয়ে নেওয়ার জন্যে। অভিনেতাটি এমন কেউকেটা নন। সহ-অভিনেতার পর্যায়ে। মোটামুটি মন্দ অভিনয় করেন না। যাই হোক, শরৎদার ব্যস্ততা দেখে প্রশ্ন করলাম—ওর কণ্ট্রাক্টের মেয়াদ বাড়ানোর জন্যে এত ব্যস্ত কেন? ও থাক্‌লেই বা কি, আর গেলেই বা কি? ও যে দরের অভিনেতা, অমন অভিনেতা ত' কতই রয়েছে আপনার থিয়েটারে।

শরৎদা আমার কথাগুলো যেন শুনেও শুন্‌তে পেলেন না এইভাবে সেদিনের মত পাশ কাটিয়ে গেলেন। এর চার-পাঁচদিন পরে, শরৎদার ঘরে ঢুকে দেখি, সেই অভিনেতাটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করছেন। রঙ্‌মহলের ম্যানেজার সন্তোষবাবুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার বলুন ত'? শরৎদা ঐ অভিনেতাটির জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন কেন?

সন্তোষবাবু বল্‌লেন—কি জানি, নতুন নাটকে দাদা কি ওহে হিরো করবেন নাকি?

—ওকে হিরো করবেন? তাহলেই হয়েছে। যাক্—কত মূল্য বৃদ্ধি হোল?

—দশ টাকা।

—পাচ্ছিল কত?

—নব্বুই। পুরো একশো হোল।

যাই হোক, এরপর অভিনেতার সম্পর্কে শরৎদা বা সন্তোষবাবুর সঙ্গে আমার আর কোন আলোচনা হয়নি। অপেক্ষা করতে লাগলাম, ভূমিকালিপি বণ্টনের সময় শরৎদা ওর জন্যে কোন্ ভূমিকা সুপারিশ

করেন। মোটামুটি casting আমি একটা করে রেখেছিলাম। শরৎদাকে আমি সেটি দেখালাম। যে শিল্পীটির নতুন করে চুক্তিপত্রের মেয়াদ বর্ধিত করা হোল, আমার casting list-এ তার নাম ছিল না। ইচ্ছে করেই তাকে কোন ভূমিকা দিইনি। এই না দেওয়ার কারণ, শরৎদাকে যাচাই করা। অর্থাৎ শরৎদা তার জন্যে কোন সুপারিশ করেন কিনা, তাই পরীক্ষা করা। Casting list পড়ে শরৎদা approve করলেন। আর সেইসঙ্গে অন্য এক শিল্পীকে বসিয়ে রেখে, তাব জায়গায় নতুন চুক্তিবদ্ধ শিল্পীটিকে, দু তিন সিনের একটা পার্ট দিলেন। মোটামুটি দুজনেই একই দরের অভিনেতা। সুতরাং শরৎদার নির্বাচনে আমি আর আপত্তি করলাম না।

মহলা শুরু হোল। নতুন নাটকটি মঞ্চস্থও হোল যথাসময়ে। প্রথম অভিনয়েই বোঝা গেল, নাটকটি চল্‌বে কিছুদিন। কয়েকটি অভিনয়ের পব, একদিন থিয়েটারে গিয়ে শুনি, হিরোইন বিগ্‌ড়েছেন। দু'শো টাকা মাইনে না বাড়ালে তিনি আর কাজ করবেন না। কথাটা শুনে মুস্‌ড়ে পড়লাম। নাটকের সুনাম হয়েছে। চল্‌ছেও ভাল। এই সময়ে হিরোইন বিভ্রাট। সন্তোষবাবুকে গোপনে জিজ্ঞাসা করলাম —ওর কি contract expire করেছে?

—হ্যাঁ।

—তবে বই খোলার আগে ওর contract renew না করে ঐ একটা সাধারণ artist-এর আর এক বছরের contract করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন শরৎদা?

—কি করে বল্‌বো বলুন? খেয়ালী মানুষ। নিজের খেয়ালেই চলেন। কোন কথা বল্‌তে গেলে কানে তোলেন না। কত দিন বলেছি, নতুন নাটক খোলার আগে হিরোইনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিন। নইলে, নতুন নাটক খোলার পর বেগ দিতে পারে। তা আমার কথা কানেই তুল্‌লেন না।

সন্তোষবাবুর সঙ্গে কথা বলে শরৎদার কাছে গেলাম। হিরোইনের

কথাও ভুল্‌লাম। সব শুনে শরৎদা বললেন—দেখি, কি করা যায়। একমাসের পুরো নোটিশ দিয়ে তবে ত' ওকে ছাড়তে হবে ? তার মধ্যে যাহোক একটা ব্যবস্থা করে নেব।

—নোটিশ কি দেয়নি এখনো ?

—না।

শরৎদার সঙ্গে আলোচনা করে কতকটা আশ্বস্ত হলাম।

নতুন নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার পর, কয়েকটি অভিনয়, মঞ্চে উপস্থিত থেকে লক্ষ্য করতে হয়। কোথাও কারুর ভুলভ্রান্তি হলে, সংশ্লিষ্ট শিল্পীকে সে বিষয়ে অভিহিত করে দিতে হয়, যাতে ভুলের পুনরাবৃত্তি না ঘটে। শুধু শিল্পী নয়, সেই সঙ্গে মঞ্চের অন্যান্য কর্মীদের ভুলেও নাটকের অভিনয় ব্যাহত হতে পারে। কাজেই নতুন নাটক মঞ্চস্থ হলে, কয়েকদিন সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। তাই, শরৎদার কাছ থেকে ফিরে এসে, মঞ্চের এক উইংস্‌-এর পাশ থেকে অভিনয় লক্ষ্য করতে লাগলাম। সহসা অপর এক উইংস্‌-এর পাশ থেকে চাপা কণ্ঠের আলোচনা কানে এলো। আলোচনা চল্‌ছিলো হিরোইন আর সম্প্রতি চুক্তিবদ্ধ সেই অভিনেতাটির মধ্যে।

—তুমি আমাকে না জানিয়ে, আবার এক বছরের কণ্ট্রাক্ট করতে গেলে কেন ?

—তা আমি কি জানি, তোমার কণ্ট্রাক্ট শেষ হয়ে গেছে ?

—কণ্ট্রাক্ট শেষ হয়েছে দু' মাস আগে। আগের নাটক জমেনি, তাই চুপচাপ ছিলাম। এ নাটক জমেছে, এখন দম্‌ দেবার সুবিধে। আর এই সময়ে তুমি কিনা—

—বিশ্বাস করো, আমি জানতাম না যে তোমার কণ্ট্রাক্ট ফুরিয়েছে। ভাব্‌লাম, দশটাকা মাইনে যখন বাড়িয়ে দিচ্ছে, তখন—

—আর্টিস্ট-এর মাইনে বাড়ায়নি। বাড়িয়েছে, চাকরের মাইনে। থাকো তুমি এখানে পড়ে। আমি চলে যাব।

—তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না। লক্ষ্মীটি ! আমাকে

তুমি ভুল বুঝো না।

—তোমার জন্যে আমি কি গলায় কলসী বেঁধে ডুব্‌বো নাকি?

—তুমি না ডোবো, আমাকেই গলায় কলসী বেঁধে ডুব্‌তে হবে। তুমি যদি এখান থেকে কাজ ছেড়ে চলে যাও, তাহলে সত্যি বল্‌ছি আমি আত্মঘাতী হবো।

উপরোক্ত আলোচনার মাঝে তাদের অলক্ষ্যে পা টিপে টিপে ওপরে উঠে এলাম। সোজা শরৎদার ঘরে ঢুকে তাঁর পায়ের ধূলা নিলাম। শরৎদা সহাস্যে জিজ্ঞাসা করলেন—কি ব্যাপার! হঠাৎ ভক্তি উথ্‌লে উঠলো যে?

—সত্যিই ভক্তি উথ্‌লে উঠেছে। শুধু বয়োজ্যেষ্ঠ বলে নয়, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা বলে।

—ভণিতা রাখো। বল তো কি ব্যাপার?

—ব্যাপার ভাল। দশটাকা মাইনে বাড়িয়ে, সত্যিই আপনি দুশো টাকা বাঁচিয়েছেন। হিরোইন পালাতে চায়। কিন্তু অভিনেতাটি বল্‌ছে—চলে গেলে সে আত্মঘাতী হবে।

শরৎদা মহোল্লাসে বল্‌লেন—ইনিও আত্মঘাতী হবেন না, উনিও ছেড়ে যাবেন না। এ কথা আমি জান্‌তাম। কারণ, বাঁধা উনি মাধবের পায়—

সত্যিই তাই। কেন না, ঐ আলোচনা শোনার পর, হিরোইনের পক্ষ থেকে আর কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি।

॥ বলিদান ॥

১৫ই জুলাই, ১৯১১ সাল।

সেদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হচ্ছে সকাল থেকে। মিনার্ভা থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ "বলিদান" অভিনয় করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। করুণাময় স্বয়ং গিরিশচন্দ্র। বুকিং-এর চার্ট একদম খালি। অভিনয়

আরম্ভ হতে তখন আর বেশী দেরি নেই। বিক্রি মাত্র ৮০৲ টাকা। এই বৃষ্টিতে কে আস্‌বে থিয়েটার দেখ্‌তে? ৺মহেন্দ্র মিত্র তখন মিনার্ভা থিয়েটারের মালিক। বিক্রির অবস্থা দেখে, তিনি গিরিশচন্দ্রকে গিয়ে বল্‌লেন—বিক্রি ত সামান্যই, আজ আর আপনার নেমে কাজ নেই।

গিরিশচন্দ্রের শরীরটা ক'দিন থেকে ভাল যাচ্ছিল না। হাঁপের টানটা একটু বেড়েছে। জোলো-হাওয়া লেগে পাছে রোগটা বেড়ে যায়, এই কারণেই মহেন্দ্রবাবু তাঁকে বিশেষ করে অনুরোধ করেন।

গিরিশচন্দ্র ভাব্‌তে থাকেন, তাঁর অভিনয় দেখতে মুষ্টিমেয় যে ক'জন দর্শকই আসুক না কেন, তাদের বঞ্চিত করা তাঁর উচিত হবে কি না? ইতিমধ্যে বুকিং ক্লার্ক এসে জানায়, হঠাৎ কিছু দর্শক এসে পড়ায়, শ'তিনেক টাকার মত টিকিট বিক্রি হ'য়েছে।

বুকিং ক্লার্কের কাছে টিকিট বিক্রির কথা শুনে, গিরিশচন্দ্র উৎসাহিত হলেন এবং করুণাময় সাজা স্থির করলেন।

মহেন্দ্রবাবুর কোন আপত্তিই টিক্‌ল না। গিরিশচন্দ্র জানালেন —আমি করুণাময় সাজবো বলেই, ওরা আশা করে এসেছে। ওদের এভাবে বঞ্চিত করা উচিত হবে না। অধিকারও নেই আমাদের।

সারাদিন বৃষ্টি হওয়ার ফলে, রাত্রের দিকে বেশ একটু ঠাণ্ডা পড়েছে। জোলো-হাওয়া বইছে। করুণাময় যখন সর্বস্ব হারিয়ে নগ্ন-গাত্রে মঞ্চে নেমেছেন, তখন তাঁর দেহ বেশ ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পুত্র ৺সুরেন্দ্রনাথ ঘোষও (দানীবাবু) অভিনয় করছেন—দুলালচাঁদের ভূমিকায়। শেষ রাত্রে থিয়েটার ভাঙ্‌লো। দেখা গেল, গিরিশচন্দ্রের হাঁপের টান তখন খুব বেড়ে গেছে।

৬৩ বৎসর বয়েস। তার ওপর অসুস্থ শরীরে সারারাত ধরে অভিনয় করা—সহ্য হবে কেন? দানীবাবু অসুস্থ পিতাকে নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। এইদিন থেকেই তাঁর রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। কবিরাজশিরোমণি শ্যামাদাস বাচস্পতির চিকিৎসাধীনে রইলেন বেশ কিছুদিন। সাময়িক উপশম হয়। কিন্তু রোগ যথারীতি থেকেই যায়,

কিছুতেই কিছু হয় না। বন্ধুরা অনুযোগ করেন—এই বয়সে অসুস্থ শরীরে, ঐ দিন অভিনয় করা ঠিক হয়নি। গিরিশচন্দ্র জানান—ঠাকুর যা করিয়েছেন, তিনি তাই করেছেন। কোন কিছু করা, বা না-করার মধ্যে তাঁর কোন হাত নেই। কেন না, ঠাকুরকে তিনি ব-কল্‌মা দিয়েছেন। ঠাকুরের ব-কল্‌মার ওপর গিরিশচন্দ্রের অগাধ বিশ্বাস দেখে, সকলে বিস্ময় বোধ করেন।

এই কি সেই গিরিশ? যিনি প্রতিমা ভেঙেছিলেন একদিন নিজের হাতে?

একদিন যাঁর মনে ছিল অসংখ্য বাঁক, আর আজ কিনা তাঁর ঠাকুরের ওপর বিশ্বাস, এতটুকুও বেঁকে না।

ঠাকুর দেহত্যাগ করেছেন ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ, (ইং ১৮৮৭)। আর এটা ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারী। মাঝে দীর্ঘ ২৫ বৎসর কেটে গেছে—এখনও কিন্তু গিরিশের বিশ্বাস, ঠাকুর আছেন। তাঁর দেহের লয় হলেও, দেহীর লয় হয়নি। কিন্তু একটা চিন্তা থেকে গিরিশচন্দ্র আজও মুক্ত হতে পারেননি। তাই মাস্টারমশাই অর্থাৎ ঠাকুরের অন্যতম শিষ্যপ্রধান মহেন্দ্র গুপ্ত ম'শায় তাঁকে দেখতে এলে, তিনি বলেন—সবই তো হোল মাস্টার, কিন্তু এর পর আমার কি হবে?

মাস্টার ম'শাই বলেন—ওকথা কেন ভাব্‌ছ গিরিশ, ঠাকুরের আশীর্বাদে তুমি চিরমুক্ত হবে। গিরিশচন্দ্র মাস্টারমশাই-এর কথায় আশ্বস্ত হন। এরপর গিরিশচন্দ্রের চিরমুক্তির দিন আসে।

দানীবাবু ক'দিন আগে ফরিদপুর এক্‌জিবিসনে অভিনয় করতে গিয়েছিলেন, 'তার' পেয়ে ছুটে এসেছেন। গিরিশচন্দ্র তখন, কখনও বল্‌ছেন—"চলো"। কখনও বল্‌ছেন—"নেশা কাটিয়ে দাও।"

যাঁর পদতল সর্বদা মদেমত্ত! তিনি এখন নেশা কাটাতে চাইছেন। ৺অমৃতলাল বসু, স্বামী সারদানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অসংখ্য ভক্ত সেদিন গিরিশচন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে। বাইরে তখন প্রবল বর্ষণ শুরু হয়েছে। আর ঘরের ভিতরে গিরিশচন্দ্রকে ইষ্টদেবতার নামগান

শোনান হচ্ছে—"রামকৃষ্ণ হরিবোল।"

গিরিশচন্দ্র যেদিন প্রথম রোগাক্রান্ত হলেন "বলিদান" অভিনয় করতে গিয়ে, সেদিনের আকাশও ছিল—এমনি দুর্যোগপূর্ণ। মহেন্দ্রবাবু "বলিদান"-এ অভিনয় করা থেকে তাঁকে বিরত করতে পারেননি। কেন না তিনি যে, করুণাময়। দর্শকদের বঞ্চিত করবেন কি করে? তাই ১৯১২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারীর বর্ষণমুখর রাত্রে তিনি চিরবিদায় নিলেন—আত্মবলিদান দিয়ে।

॥ পদীরে পেয়েছে পেঁচো ॥

বাংলা দেশে থিয়েটারের গোড়ার যুগ। মধ্যে মধ্যে সেকালে বড়লোকদের বাড়িতে থিয়েটার হোত। কলকাতার ধনী ব্যক্তিরাই তখন থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পাথুরিয়াঘাটার রাজবাড়ি, শোভাবাজারের রাজবাড়ি, চড়কডাঙ্গার জয়রাম বসাকের বাড়ি, বেল-গাছিয়ার রাজবাড়ি, জোড়াসাঁকো রাজবাড়ি, বড়তলায় জয় মিত্রের বাড়ি থিয়েটারের আসর বসতো। মোটকথা, এদেশে থিয়েটারের প্রথম যুগে, সেকালের ধনী ব্যক্তিরা যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়ে এসেছেন। অর্থব্যয় করেছেন। আবার একদল আর একদলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছেন। একদল একখানি নাটক মঞ্চস্থ করলে, অপর একদল সেই নাটককে ব্যঙ্গ করে, অপর এক নাটক মঞ্চস্থ করেছেন। নাটকের মাধ্যমে তরজার সুর অনুসৃত হোত। আবার কখনও কখনও একই নাটক পাল্লাপাল্লি দিয়ে, এক বা একাধিক জায়গায় অভিনয়ের ব্যবস্থা হোত। এবং এই ব্যাপারে রেষারেষির যেমন অন্ত ছিল না, তেমনি রং তামাসাও বড় কম হোত না।

উত্তর কলকাতার জয় মিত্র সেকালের এক নামকরা ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মাইকেল মধুসূদনের "পদ্মাবতী" নাটক নিজের

বাড়িতে মঞ্চস্থ করেন। অভিনয় আসরে উপস্থিত থেকে শিল্পীদের উৎসাহিত করেন। এই অভিনয়কে কেন্দ্র করে, সেই সময় এক ছড়া রচিত হয়। ছড়াটির শিরোনামা—"পদীরে পেয়েছে পেঁচো"—।

"জয় খুড়োর বাড়ীতে মাঝে হোল একটা ধূম,
শুনে হয়নি রেতে ঘুম।
এলো রাজার বাড়ীর বুড়ো হনু
ইন্দ্রনীলের সাজ পরি'
দু-কান কাটা বিদূষক সে লাডেনি সরকার
ডিস্‌ব্যাণ্ডেড্ মদনিকা কলি অবতার।"

উপরোক্ত ছড়াটি বস্তুতঃ শিল্পীদের উপলক্ষ্য করেই রচিত হয়েছিল। "পদীরে পেয়েছে পেঁচো।" অর্থাৎ পঞ্চানন মিত্র 'পদ্মাবতী' নাটক মঞ্চস্থ করায় প্রযোজক মিত্রকে কটাক্ষ করা হয়েছে। তারপর "জয় খুড়োর বাড়িতে মাঝে হোল একটা ধূম, শুনে হয়নি রেতে ঘুম।" এ কথাগুলি পঞ্চানন মিত্র মহাশয়ের পিতৃদেব জয় মিত্র মহাশয়কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে। এরপর "এলো রাজার বাড়ীর বুড়ো হনু ইন্দ্রনীলের সাজ পরি" একথা তদানীন্তন কালের অন্যতম খ্যাতিমান অভিনেতা বেহারীলাল চট্টোপাধ্যায়কে শ্লেষ করে বলা হয়েছে। "পদ্মাবতী" নাটকে বেহারীলাল রাজা ইন্দ্রনীলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ইতিপূর্বে বেহারীলাল শোভাবাজার রাজবাড়িতে মাইকেলের "কৃষ্ণকুমারী" নাটকে ভীমসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করেন, সেইজন্য রাজার বাড়ির বুড়ো হনু বলে ঠাট্টা করা হয়েছে। পদ্মাবতী নাটকে বিদূষকের ভূমিকায় মণিমোহন সরকার নামে সেকালের এক অভিনেতা অভিনয় করেন। এই মণিমোহন সরকারকে সকলে 'লর্ড' বলে ডাকতেন। তাই তাঁকে পরিহাস করে বলা হয়েছে 'বিদূষক সে লাডেনি সরকার'। আর শেষের লাইনে "ডিস্‌ব্যাণ্ডেড্ মদনিকা কলি অবতার" এই কথা বলার পেছনে একটু ইতিহাস আছে। সেটি হোল এই যে, মদনিকার ভূমিকায় মণিমোহনের অভিনয় করার কথা ছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত উক্ত ভূমিকায় তিনি অভিনয় না করায় ডিস্‌ব্যাণ্ডেড্ বলা হয়েছে।

যাইহোক এই ঠাট্টার পেছনে গভীর রহস্য জড়িয়ে আছে। সেটি হোল এই যে, সেকালে অভিনয় করার ক্ষমতা খুব বেশী লোকের ছিল না। এবং তাঁদের মধ্যে যে ক'জন ভাল অভিনেতা ছিলেন তাঁদের নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। ফলে, একদল থেকে আর এক দলে কেউ এসে যোগদান করলেই প্রতিপক্ষ ছড়া বেঁধে, গান গেয়ে, তাঁদের সমালোচনা করতেন। বস্তুতঃপক্ষে এই ছড়ায় যাঁদের কটাক্ষ করা হয়েছে, জয় মিত্রের বাড়িতে "পদ্মাবতী" নাটকে অভিনয় করার পূর্বে, তাঁরা সকলেই দেবীকৃষ্ণ দেব মহাশয়ের শোভাবাজারের বাড়িতে মধুসূদনের "একেই বলে সভ্যতা" ও "কৃষ্ণকুমারী" নাটকে আত্ম-প্রকাশ করেছিলেন। নাট্যশালার গোড়ার যুগের এ গল্প পুরোনো হলেও—এ যুগেও এ কাহিনী একেবারে নতুন নয়।

॥ হ্যাণ্ডনোটের পাওনা ॥

বাংলার সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, আমরা যে কয়জন বিশিষ্ট নাট্যকারকে পেয়েছিলাম রাজকৃষ্ণ রায় তাঁদের অন্যতম। নাট্যশালার সংস্পর্শে আসার পূর্বে রাজকৃষ্ণ ছিলেন, ছাপাখানার সামান্য কর্মচারী। নিজের চেষ্টায় ও অনুশীলনের দ্বারায় পরবর্তীকালে তিনি খ্যাতিমান নাট্যকাররূপে বাংলার নাট্য-সাহিত্যকে পরিপুষ্ট কর্‌েন।

সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁর একাধিক নাটক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সঙ্গীত রচনায় রাজকৃষ্ণ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। নাটকের জন্য যে গানগুলি তিনি রচনা করতেন, সে গানগুলি সঙ্গে সঙ্গে লোকের মুখে মুখে শোনা যেতো। আজও রাজকৃষ্ণ রায়ের বহু গান বৈরাগীদের কণ্ঠে

শোনা যায়। তাঁর অধিকাংশ নাটকই গীতিবহুল। নাটকীয় সঙ্গীত-সংযোজনার ক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে প্রহ্লাদচরিত্র, চন্দ্রহাস, ভীষ্মের শরশয্যা, সিন্ধুবধ, বামন ভিক্ষা, হরিদাস ঠাকুর, মীরাবাঈ, চন্দ্রাবলী, নরমেধ যজ্ঞ, লায়লা মজ্‌নু, বনবীর প্রভৃতি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

১৮৮৩ সাল থেকে ১৮৯৪ সাল পর্যন্ত মোট এগার বছর কাল তিনি নাট্যশালার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এই অল্পকালের মধ্যেই তিনি তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

১৮৮৭ সালে রাজকৃষ্ণ রায় বীণা থিয়েটার নামে এক নতুন রঙ্গালয় স্থাপন করেন। চীপ্‌ থিয়েটারের পরিকল্পনা নিয়ে বীণা থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজকৃষ্ণ বীণা থিয়েটারের কেবলমাত্র পরিচালক ও নাট্যকারই ছিলেন না। এখানে তিনি নটরূপেও আত্মপ্রকাশ করেন। 'প্রহ্লাদ-চরিত্র' নাটকে যোগীন্দ্র ঘটকের পর, তিনিও হিরণ্যকশিপুর ভূমিকায় অভিনয় করেন।

সে সময়ের অন্যান্য থিয়েটারের অপেক্ষা বীণা থিয়েটারের প্রবেশ মূল্য অনেক কম করা হয়েছিল। রাজকৃষ্ণ রায় এই বীণা থিয়েটার করে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। থিয়েটারের প্রতি সাধারণ লোক যাতে আকৃষ্ট হয়, সেইজন্যই রাজকৃষ্ণ প্রবেশ মূল্যের হার কমিয়েছিলেন। তাতে যে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি, তা নয়। কিন্তু থিয়েটার পরিচালনার ব্যাপারে খরচের তুলনায় প্রবেশ-মূল্য বাবদ যে অর্থ পাওয়া যেত, তা নগণ্য। চিন্তাশীল কবি মানুষ ছিলেন রাজকৃষ্ণ। ব্যবসা-বুদ্ধি তাঁর ছিল না। কাজেই ডাইনে বাঁয়ের হিসেবে, তাঁর ঘাড়ে ঋণের বোঝা চাপে। ফলে, বীণা থিয়েটার উঠে যায় এবং বীণার স্টেজে সিটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঋণভারে জর্জরিত হয়ে রাজকৃষ্ণ বড়ই বিপন্ন হয়ে পড়েন। এই সময়ে ১৮৯১ সালে স্টার থিয়েটারের অন্যতম কর্ণধার হরি বসু তাঁকে

স্টার থিয়েটারে নাট্যকাররূপে নিয়ে আসেন।

এখানে এসে রাজকৃষ্ণ 'নরমেধ যজ্ঞ' নাটক রচনা করেন। 'নরমেধ যজ্ঞ' অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। এদিকে নাটকের খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে পাওনাদারদের তাগাদায় রাজকৃষ্ণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন।

একদিন সকালে এক পাওনাদার এসে রাজকৃষ্ণকে যৎপরনাস্তি অপমান করে বল্লেন—আসল ত দূরের কথা, সুদ দেবারও নাম করেন না। ওয়াদার পর ওয়াদা করেন ; আর এসে খালি হাতে ফিরে যাই। এদিকে লোকের মুখে মুখে, আঁচিলে পাঁচিলে ত নাম দেখি, রাজকেষ্ট রায়! রাজকেষ্ট রায়!! চক্ষুলজ্জারও বালাই নেই। এইভাবে আমি আসছি আর ফিরে যাচ্ছি, তা ভদ্রতার খাতিরে লোকে ত একদিন চারটে পাশও দেয়। আপনার ত সেটুকু ভদ্রতা জ্ঞানও নেই।

পাওনাদার কথা কটি বলে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রাজকৃষ্ণ রায় নীরবে অপমান সয়ে রইলেন। উপায় কি? তখনকার দিনে নাট্যকারের বইয়ের রয়েলটি বাবদ প্রাপ্য ছিল ১৫০৲ থেকে ২৫০৲ টাকার মধ্যে। তাতে নিজেই বা খাবেন কি, আর দেনাই বা শোধ করবেন কেমন করে? নাট্যকারের আত্মতৃপ্তির মধ্যে ছিল—ঐ নামটুকু। কিন্তু পাওনাদার তার ওপরেও কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না।

যাইহোক, সেদিন সন্ধ্যায় থিয়েটারে এসে রাজকৃষ্ণ অকপটে সব কথা হরিবাবুকে জানালেন। হরিবাবু বললেন—"কি আর করবেন? সয়ে থাকা ছাড়া আর উপায় কি। যান, খান চারেক পাশ নিয়ে গিয়ে, দিয়ে আসুন। অবশ্য পাওনাদারের মুখ ওতে বন্ধ করতে পারবেন না। তবে যে ক'দিন চুপচাপ থাকে।"

উচ্চমূল্য আসনের চারখানি পাশ লিখে দিলেন হরিবাবু। পরের দিন সকালে রাজকৃষ্ণ রায় পাশ চারখানি দিয়ে এলেন পাওনাদারকে।

তখনকারের দিনে সন্ধ্যা ৭টা-৮টা থেকে অধিক রাত্রি পর্যন্ত থিয়েটার হোত। রাজকৃষ্ণ অভিনয়ের দিনে, অভিনয় না ভাঙা পর্যন্ত থিয়েটারে থাকতেন।

পাদ-প্রদীপের আলোর মোহ এমনই যে, একবার যিনি সে আলোর পরশ পেয়েছেন, তিনি সে আলোকে পতঙ্গ হয়ে পুড়্‌বেন, তবু এ বৃত্তি ত্যাগ করে, অন্য কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে পারবেন না। রাজকৃষ্ণও পারেননি। এবং তাঁর মত অনেকেই—এই একই কারণে অশেষ দুঃখ ও দারিদ্র্য ভোগ করে গেছেন।

যাইহোক, অভিনয়ের দিন যথাসময়ে পাওনাদার পাশ নিয়ে থিয়েটার দেখতে এলেন। পর পর দু'টি অঙ্ক অভিনয় হয়ে গেল। কনসার্ট শুরু হোল। পাওনাদার বাড়ি চলে গেলেন। স্টার থিয়েটারের অতি নিকটেই তাঁর বাড়ি ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বাড়ি থেকে ফিরে এলেন এবং আবার অভিনয় দেখতে লাগলেন। অভিনয় শেষ হোল। একে একে দর্শকেরা প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করলেন। পাওনাদারও এসে দাঁড়ালেন থিয়েটারের সংলগ্ন প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। তারপর দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাজকৃষ্ণবাবু আছেন কিনা? দারোয়ান জানাল, আছেন। পাওনাদার হুকুম করলেন রাজকৃষ্ণ-বাবুকে ডেকে দেওয়ার জন্য। দারোয়ান গ্রীন-রুমে চলে গেল।

রাজকৃষ্ণবাবু দারোয়ানের কাছে খবর পেয়ে, ভয়ে ভয়ে পাওনা-দারের সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং সবিনয়ে অনুরোধ জানিয়ে বল্‌লেন, —"থিয়েটারের দারোয়ান-চাকরদের সামনে আর অপমান করবেন না। আমি খুবই সচেষ্ট আছি, যত শীঘ্র পারি, টাকার জোগাড় করে আপনার দেনা শোধ করব।"

রাজকৃষ্ণবাবুর কথায় হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন পাওনাদার। বল্‌লেন— "থাক্। যথেষ্ট হয়েছে। আপনি যা টাকার জোগাড় করবেন, তা আমার জানা আছে। আমারই ভুল হয়েছিল, আপনার মত লোককে টাকা ধার দেওয়া। আর আপনার মত লোকেরও উচিত হয়নি, ব্যবসা করতে যাওয়া। যে এমন নাটক লিখ্‌তে পারে, সে কোন কস্মিন্‌কালেও ঋণশোধ করতে পারবে না। এই নিন্ আপনার হ্যাণ্ডনোট।"

কথাগুলি শেষ করে রাজকৃষ্ণবাবুর সম্মুখে পাওনাদার টুক্‌রো

টুক্‌রো করে হ্যাণ্ডনোটখানা ছিঁড়ে ফেলে, থিয়েটার ছেড়ে চলে গেলেন। রাজকৃষ্ণবাবুকে একটা ধন্যবাদ জানানোরও অবসর দিলেন না পাওনাদার।

রাজকৃষ্ণ শুধু অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে চেয়ে রইলেন—পাওনাদারের গমনপথের দিকে।

॥ শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ॥

বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ের গোড়ার যুগে যে সকল শক্তিমান অভিনেতার আবির্ভাব ঘটেছিল, যোগীন্দ্র ঘটক ছিলেন তাঁদের অন্যতম। সে যুগের অনেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের আমরা আজো যেমন মনে রেখেছি, তেমনি অনেককে আবার ভুলেও গেছি। যাঁদের ভুলেছি, যোগীন্দ্র ঘটক তাঁদেরই একজন। তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ে কয়েক বছর মাত্র অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি রঙ্গজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। যোগীন্দ্রনাথ বেঙ্গল থিয়েটারে এবং বীণা থিয়েটারে কয়েকটি নাটকের বিশিষ্ট চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। বেহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের 'দুর্বাসার পারণ' নাটকে ভীম, রাজকৃষ্ণ রায়ের 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটকে হিরণ্যকশিপু এবং বৈকুণ্ঠ বসুর 'রামপ্রসাদ' নাটকে আজু গোঁসাই-এর ভূমিকায় অভিনয় করে তাঁর অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে যান।

১৮৮৪ সালের ২২শে নভেম্বর তারিখে গিরিশচন্দ্রের 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটক স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। হিরণ্যকশিপুর ভূমিকায় সেকালের খ্যাতিমান অভিনেতা অমৃত মিত্র এবং গিরিশচন্দ্রের সর্বজনপ্রিয় নাটক 'চৈতন্যলীলার' চৈতন্য অর্থাৎ বিনোদিনী, প্রহ্লাদের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন।

এর কয়েকদিন পরে ডিসেম্বর মাসে বেঙ্গল থিয়েটারেও রাজকৃষ্ণ

রায়ের 'প্রহ্লাদ চরিত্র' মঞ্চস্থ হয়।

সেকালে থিয়েটারেও কতকটা প্রত্যক্ষ এবং কতকটা পরোক্ষভাবে তরজা-লড়াই চল্‌তো। একই বিষয়বস্তুর ওপর একাধিক নাট্যকার যেমন নাটক রচনা করতেন, তেমনি আবার একই নাট্যকারের নাটক, একই সময়ে পাল্লা দিয়ে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হোত।

যাই হোক 'প্রহ্লাদ চরিত্র' নাটকের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত রাজকৃষ্ণ রায়ই জয়যুক্ত হয়েছিলেন। 'প্রহ্লাদ চরিত্র' অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। এখানে হিরণ্যকশিপুর ভূমিকায় যোগীন্দ্র ঘটক এবং প্রহ্লাদের ভূমিকায় কুসুম নামে জনৈকা অভিনেত্রী মঞ্চাবতরণ করেন। যোগীন্দ্র ঘটকের হিরণ্যকশিপুর অভিনয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। আর প্রহ্লাদের ভূমিকায় কুসুম শেষ পর্যন্ত 'প্রহ্লাদ কুসুম' নামে খ্যাতিলাভ করেন।

যোগীন্দ্র ঘটকের কণ্ঠ ছিল অত্যন্ত গুরুগম্ভীর। দেহের গঠন ছিল বলিষ্ঠ। চোখ দু'টি বড় বড়। এককথায় অভিনেতার যে গুণগুলি থাকা একান্ত প্রয়োজন, তা তাঁর ছিল। এবং এই কারণে অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি রঙ্গজগতে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পেরেছিলেন।

রাজকৃষ্ণ রায়ের 'প্রহ্লাদ চরিত্র' চার অঙ্কের নাটক। চতুর্থ অঙ্কে দু'টি মাত্র দৃশ্য। শেষ দৃশ্যে নেপথ্য থেকে বার বার হরিধ্বনি ভেসে আসে। মঞ্চে হিরণ্যকশিপু উন্মত্তের মত ইতস্তত ছুটোছুটি করতে থাকেন। তাঁর চোখের সামনে যেন নৃসিংহমূর্তির আবির্ভাব ঘটে।

হিরণ্যকশিপু বলে ওঠেন :

> ...ওহো! আবার সেই ভীমকায়—
> আবার সেই জিহ্বা-লকলকি
> আবার বিকট দৃষ্টি—
> ওঃ! কি ভীষণ নখর।
> আবার গর্জিয়া এল—
> গেল গেল প্রাণ,
> নাহি ত্রাণ, নাহি ত্রাণ,

উদর বিদীর্ণ আশে আসে,
ওগো! বধিল বধিল মোরে।
হায় হায়! কোথা যাই
কোথায় দাঁড়াই—পথ নাহি পাই।

উপরোক্ত কথার শেষে প্রহ্লাদ প্রবেশ করেন এবং হিরণ্যকশিপুকে আশ্বাস দিয়ে বলে ওঠেন :

পিতা, ভয় নাই—ভয় নাই
পুত্র তব দেখাইবে পথ,
এতদিনে পূর্ণ মনোরথ তব।

প্রহ্লাদের কথার শেষে দৈত্যগণ, ষণ্ডামর্ক, ষণ্ডপত্নী, মন্ত্রিগণ হরিধ্বনি দিতে দিতে প্রবেশ করে। হিরণ্যকশিপু আরো উত্তেজিত হন। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বলেন :

'আচ্ছা, এই স্ফটিকস্তম্ভে তোর হরি আছে?' প্রহ্লাদ বলেন : 'হ্যাঁ পিতা, সর্বস্বরূপ দয়াল হরি ঐ স্তম্ভে আছেন।' প্রহ্লাদের উক্তি শুনে হিরণ্যকশিপু সক্রোধে বলে উঠেন : 'কি? আমার ভ্রাতৃ-হন্তা পরমশত্রু দুরাত্মা হরি এই স্তম্ভ মধ্যে?' কোষবদ্ধ তরবারি মুক্ত করে সবলে স্ফটিক-স্তম্ভে আঘাত করেন। স্তম্ভ ভেঙ্গে যায়। আর তার ভেতর থেকে বিষ্ণু, নৃসিংহমূর্তিতে সহুঙ্কারে বেরিয়ে আসেন। সকলে হরিধ্বনি দিতে থাকে। হিরণ্যকশিপু সক্রোধে বলে ওঠেন :

আরে আরে দৈত্যকুল-অরি হরি
বিধাতা সদয় মোরে আজ,
গৃহে বসি' পাইলাম মহারিপু।
আরে আরে ভ্রাতৃঘাতী,
আয়, আয়, শেষ দিন তোর
শুভদিন মোর এতদিনে
আয় আয় দুরাচার—
পশুমূর্তি, নরমূর্তি, দুই খণ্ড করি খড়গ ঘায়।

উপরোক্ত সংলাপ শেষে এগিয়ে যাবেন নৃসিংহমূর্তির দিকে, কিন্তু হিরণ্যকশিপুরূপী যোগীন্দ্রনাথ আর অগ্রসর হতে পারলেন না, সহসা মঞ্চের ওপর পড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি যবনিকা ফেলে দেওয়া হোল। কিন্তু একি! অমন শক্তিমান পুরুষ অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেছেন মঞ্চের ওপর। সকলে ছুটে গেলেন তাঁর কাছে, এবং গিয়ে যা দেখলেন তাতে সকলেরই চক্ষুস্থির! যোগীন্দ্রনাথের হাতের তরবারি সরোষে কোষবদ্ধ করতে গিয়ে কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে উরুতে গিয়ে প্রবেশ করেছে।

তখনকার দিনে পোশাক আশাক আজকের মত ছিল না। ভেলভেটের প্যাণ্ট, জামা ইত্যাদি পরা হোত। সেই পুরু ভেলভেটের পোশাক ভেদ্ করে এই দুর্ঘটনা এক অঘটন ব্যাপার!

মঞ্চের ওপর যেদিন এই দুর্ঘটনা ঘটে, সেদিন রয়েল বক্সে দর্শকের আসন গ্রহণ করে এক স্বাধীন নরপতি অভিনয় দেখছিলেন। শীতকাল। গায়ে ছিল তাঁর মহামূল্যবান শাল। দুর্ঘটনার কথা শুনে তিনি এলেন সাজঘরে। অচৈতন্য হিরণ্যকশিপুর গায়ে জড়িয়ে দিলেন নিজের গায়ের শাল। মুগ্ধ দর্শকের পুরস্কার অঙ্গে জড়িয়ে যোগীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাওয়া হোল হাসপাতালে।

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আঘাতের চিহ্ন যেমন যোগীন্দ্রনাথের দেহে বর্তমান ছিল, তেমনি সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন তিনি, তাঁর অভিনয়-জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি।

॥ নিঃসন্তানের বাৎসল্য প্রেম ॥

তুলসীদা অর্থাৎ তুলসী চক্রবর্তী মশাই ভারী রসিক মানুষ ছিলেন। রাস্তাঘাটে, ট্রামে-বাসে নাটুকে ছেলেরা তাঁকে থিয়েটারে কি হচ্ছে, বায়স্কোপে কি হচ্ছে, এই নিয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্নে ব্যস্ত করে তুলতো,

কিন্তু তার জন্য কোনদিন তিনি বিরক্ত হতেন না। বরং তাঁদের নিয়ে থিয়েটার-সিনেমার গল্পগুলি আরো রসিয়ে রসিয়ে বলতে শুরু করতেন।

হাওড়ায় তুলসীদা একটি ছোটখাট বাড়ি তৈরি করেছিলেন। স্যুটিং না থাকলে, হাওড়া থেকে সোজা থিয়েটারেই আসতেন। বাস থেকে বিডন স্ট্রিটের মোড়ে নেমে, ঐ পথটুকু হেঁটেই আসতেন থিয়েটারে। একদিন বাস থেকে দেখলাম, ছ-সাতটি হাফ-প্যাণ্ট পরা ছেলের সঙ্গে তুলসীদা পরমানন্দে কি সব বলতে বলতে আসছেন। থিয়েটারে এসে জিজ্ঞাসা করলাম,—ওরা কারা তুলসীদা ?

—কাদের কথা বলছ ভাই ?

—ঐ যে, যাদের সঙ্গে ফুটপাথ দিয়ে কথা কইতে কইতে আসছিলেন।

—ওরা আমার নাতি।

—নাতি ?

—হ্যাঁ।

—কি রকম নাতি ?

—এই ধরো ভাইপো, ভইঝি, ভাগ্নে, ভাগ্নী—এদেরই ছেলেপুলে হবে বোধহয়।

—বোধহয় ? সেকি! এই বল্‌ছেন নাতি, আবার বলছেন বোধহয়।

—বোধহয় না বলে, কি বলি ভাই। ওদের কারুর মা-বাপকে কোনদিন দেখিনি। জানিনেও। ওরাই 'দাদু' বলে সম্পর্ক পাতালে আমার সঙ্গে। যেন সব ওৎ পেতে ছিল। বাস থেকে নামতে না-নামতে সকলে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো—'দাদু, দাদু, দাদু' সঙ্গে সঙ্গে আমিও সস্নেহে বললাম—এসো, এসো, এসো। কাজেই সম্পর্কে ভাইপো, ভাইঝি, ভাগ্নে, ভাগ্নীর ছেলে বলে ধরে নেওয়া ছাড়া আর উপায় কি!

গ্রীনরুমের লবীতে তুলসীদার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল, আরো

অনেকে ছিল সেখানে। তুলসীদার কথার পৃষ্ঠে কে যেন বলে উঠলো—তুলসীদার ছেলেপুলে নেই। কাজেই তুলসীদা ছেলে-পুলেদের একটু ভালই বাসেন।

সঙ্গে সঙ্গে হুয়া অর্থাৎ শ্যাম লাহা বলে বসলো—হ্যাঁ তা বাসেন। এই আমাকে দিয়েই দেখুন না, জাত নয়, জ্ঞাত নয়, অথচ আমার ওপর ওঁর কি টান!

হুয়ার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুলসীদা চোখগুলো বড় বড় করে চেয়ে রইলেন তার দিকে।

তুলসীদার চোখের দিকে চেয়ে সকলে হো হো করে হেসে উঠলো। আমি বল্‌লাম—কি তুলসীদা, হুয়াকে, কি আপনি খুবই স্নেহ করেন?

—স্নেহের চাউনিতে কি আমি ওর দিকে চেয়েছি ভাই?

—না। আমার ত' চাউনি দেখে মনে হোল, হুয়াকে আপনি ধমকালেন।

—ঠিকই ধরেছ। স্নেহ ত' দূরের কথা, ওকে আমি এড়িয়ে চলতে চাই। কিন্তু ও আমাকে ততই আঁকড়াচ্ছে। স্টুডিওতে, থিয়েটারে দেশশুদ্ধ লোকের কাছে বলে বেড়াচ্ছে, ওকে নাকি আমি পুষ্যি নেব বলেছি।

তুলসীদা'র মুখের কথা কেড়ে নিয়ে একযোগে অনেকেই বলে উঠলো—হ্যাঁ তুলসীদা, হুয়া আমাদের কাছেও ঐ কথা বলেছে।

—কি? ওকে আমি পুষ্যি নেব? ওকে পুষ্যি নেওয়া মানে ডাইনির কোলে পুত্র সমর্পণ করা। ওকে পুষ্যি নিয়ে বশে আনতে হলে ভীম ভবানীর মত লোকের দরকার।

তুলসীদার কথায় সকলে হো হো করে হেসে উঠলো।

তুলসীদা বললেন—জান ভাই, সেই হাওড়া থেকে বাসে যাতায়াত করি, শীতকালে বড় কষ্ট হয়। এখন আর গরম কাপড়ের পাঞ্জাবিতে শীত কাটে না। হাজার হোক, বয়েস বাড়ছে তো। তাই ভাবলাম,

একটা, ভাল গরম কাপড়ের লংকোট তৈরি করাই। যারা কোট-প্যাণ্ট পরে, তাদের জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় করানো যায়, আর ও কিনা (হুয়া) সেই কথা শুনে, আমাকে এসে বললে, আমার ওপর ভার দাও, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমি কিন্তু ওর কথায় কান দিইনি।

—কেন ?

—খেপেছো ? তাহলে কি সে কোট আমি গায়ে দিতে পারতাম ?

—পারতেন না কেন ?

—আমার কোট তৈরি করে আনতো ওর নিজের গায়ের মাপে। তারপর আমায় বলতো, তোমার গায়ে যখন বড়ই হচ্ছে, তখন না হয় আমিই গায়ে দিই। তাই সাত-পাঁচ ভেবে আমি অন্য ব্যবস্থা করেছি।

—বেশ করেছেন।

—এত করে ওকে এড়িয়ে যেতে চাইছি। কিন্তু ও লোকের কাছে বলে বেড়াচ্ছে, আমি নাকি বলেছি ওকে পুষ্যি নেব। বল দেখি ভাই, কি অন্যায়।

তুলসীদাস কথায় আবার সকলে হেসে উঠলো। ইতিমধ্যে অনু অর্থাৎ অনুপকুমার ব্যস্তভাবে এসে বললে—জ্যাঠামশাই, আসুন।

—এসে গেছে ?

—হ্যাঁ।

অনু তুলসীদাকে জ্যাঠামশাই বলে ডাকতো। কারণ অনুর পিতা সুপরিচিত গায়ক ও অভিনেতা স্বর্গত ধীরেন দাস মহাশয়ের সঙ্গে তুলসীদা দীর্ঘকাল মঞ্চে ও চিত্রে কাজ করেছিলেন। এবং বয়েসে বড় ছিলেন। যাই হোক, অনুর সঙ্গে তুলসীদা ওয়েটীং-রুমের দিকে চলে গেলেন। আমিও নিজের ঘরে চলে এলাম। কিছুক্ষণ পরেই অনুকে সঙ্গে নিয়ে তুলসীদা একটি নতুন গরম কাপড়ের লংকোট পরে আমার ঘরে এলেন। জামাটি দেখিয়ে বললেন—দেখ দেখি ভাই, কেমন হয়েছে ?

—চমৎকার! বেশ মানিয়েছে। কোথা থেকে করালেন?

—আমি কি এসবের কিছু বুঝি ভাই? এই যে আমার ভাইপো। আমার বাপধন! কাপড়ের নমুনা এনে, দর্জি ডেকে, সব ব্যবস্থা করে দিলে। ভগবান ওর ভাল করুন। ওর বাড়বাড়ন্ত হোক। ও শুধু লোক দেখিয়ে জ্যাঠা বলে ডাকে না। সত্যি, ও ছেলের কাজ করেছে। ওরা থাকতে আবার আমার ছেলের ভাবনা! কি বলো ভাই।

সেদিন উপরোক্ত কথাগুলি বলার মধ্যে নিঃসন্তান তুলসীদার চোখে-মুখে যে পরিতৃপ্তি আমি লক্ষ্য করেছিলাম, তার মধ্যে বাৎসল্য প্রেম পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

॥ আকস্মিক ॥

১৯৪১ সাল। নাট্যভারতী থিয়েটার তখন রঘুনাথ মল্লিকের। রঘুনাথ মল্লিকের পক্ষে থিয়েটার দেখা-শোনা করেন রাধানাথ মল্লিক। আর সে সময়ে ঐ থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন শ্রীবিজয় মুখোপাধ্যায়। থিয়েটার চালানোর ব্যাপারে বিজয়বাবু ধুরন্ধর লোক। তিনি দীর্ঘকাল অপরেশচন্দ্র ও প্রবোধ গুহের সহকারী ছিলেন। থিয়েটারের বহু উত্থানপতনের ইতিহাসের সঙ্গে বিজয়বাবুর প্রত্যক্ষ পরিচয়। অল্প বয়সে অভিনেতারূপে বিজয়বাবু থিয়েটারে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু অভিনয় করা অপেক্ষা, বিজয়বাবুকে শেষপর্যন্ত থিয়েটার পরিচালনার ক্ষেত্রেই কাটাতে হয়। বিজয়বাবু যেমন মিষ্টভাষী, তেমনি সহিষ্ণু। থিয়েটার চালানোর পক্ষে যে গুণ থাকার একান্ত প্রয়োজন, তা বিজয়বাবুর ছিল।

নাট্যভারতীতে সে সময়ে শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের P. W. D. নাটকের অভিনয় হচ্ছিল। নাটকের প্রধান চরিত্র মিঃ

সেনের ভূমিকায় দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ের সুখ্যাতি লোকের মুখে মুখে। P. W. D. নাটকে তিনি একমেবদ্বিতীয়ম্।

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্গজগতের একটি স্মরণীয় নাম। যেমন সুকণ্ঠ, তেমনি সুপুরুষ। দুর্গাদাসের আগে এবং পরে অদ্যাবধি অমন শিল্পীসুলভ সুদর্শন নটের আবির্ভাব আর ঘটেনি। আর্ট থিয়েটারে দৃশ্যপট পরিকল্পনার কাজে অঙ্কনশিল্পী হিসাবে তিনি একদা যোগদান করেছিলেন; উত্তরকালে অভিনয়শিল্পী হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। 'কর্ণার্জুন' নাটকে বিকর্ণের ক্ষুদ্র ভূমিকায় তিনি সর্বপ্রথম মঞ্চাবতরণ করে সকলকে চমৎকৃত করেন। ঐ ক্ষুদ্র ভূমিকাটুকু থেকেই তাঁর অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর মেলে।

এমন এক সময় ছিল, যখন দুর্গাদাস চিত্র এবং মঞ্চের একচ্ছত্র নায়ক। দুর্গাদাসের নামে দর্শকেরা পাগল। ভারী খামখেয়ালী মানুষ ছিলেন দুর্গাদাস। খেয়ালের বশে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই অনেক সময়ে অনেক কাজ করে বসতেন। তার ওপরে ছিল মদের নেশা। দুর্গাদাসের ন্যায় দুর্লভ শিল্পীর আবির্ভাব যেমন আকস্মিক, তিরোধানও কতকটা তাই। অত্যধিক মদ্যপানের ফলে অকালে তিনি মৃত্যুকে বরণ করেন। অটুট নিটোল ছিল তাঁর স্বাস্থ্য। দেহে কোন রোগ ছিল না। মদ দেহে করলো বিষ-ক্রিয়া। কারুর কোন অনুরোধ বা উপদেশে তিনি কর্ণপাত করলেন না। বিষকেই অমৃত বলে গ্রহণ করতে লাগলেন।

সেদিন ছিল রবিবার। ডবল শো। বেলা তখন ১২॥টা। ম্যানেজার বিজয়বাবু তাঁর ঘরে বসে কাজ করছেন, সহসা টেলিফোন বেজে উঠলো—

—কে?

—আমি দুর্গা। রাধানাথবাবু আছেন?

—না। ছিলেন। একটু আগে চলে গেছেন।

—ডেকে পাঠাও। বিশেষ জরুরী। আর রাধানাথবাবু এলে

তাঁকে এই নম্বরে টেলিফোন করতে বলো।

কি জানি, কি ব্যাপার। বিজয়বাবু ব্যস্তভাবে টেলিফোন রেখে, লোক পাঠালেন রাধানাথবাবুকে ডেকে আনার জন্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাধানাথবাবু হন্তদন্ত হয়ে থিয়েটারে এলেন এবং বিজয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার কি?

—কিছুই ত' বুঝতে পারছি না।

—কখন টেলিফোন করেছিলেন?

—এই ত' কিছুক্ষণ আগে। তবে কথা শুনে মনে হোল, স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। যাই হোক, নম্বর দিয়েছে। ঐ নম্বরে ডেকে দেখুন, কি বলে—

রাধানাথবাবু টেলিফোন করলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে টেলিফোনে কথা হোল। দুর্গাবাবুর কোন কথা অবশ্য বিজয়বাবু শুনতে না পেলেও, রাধানাথবাবুর কথা শুনে বুঝতে কষ্ট হোল না যে, ব্যাপারটি জটিল। রাধানাথবাবু বার বার দুর্গাবাবুকে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, আসুন থিয়েটারে, যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

অপরদিক থেকে দুর্গাবাবু পাল্টা জবাব দেন, এখনই দুশো টাকা আগাম পাঠান, তবে থিয়েটারে যাব। নইলে নয়। শেষ পর্যন্ত হতাশভাবে টেলিফোনটি নামিয়ে রাখেন রাধানাথবাবু।

বিজয়বাবু জিজ্ঞাসা করেন—কি ব্যাপার?

—ব্যাপার আর কি? নেশার ঝোঁকে এখন অনেক কিছু চাইছেন।

—মানে?

—বলছেন, আজ থেকে ওঁর মাইনে তিন শোর জায়গায় চারশো অর্থাৎ ১০০৲ টাকা বাড়াতে হবে। আর এক্ষুনি ২০০৲ অগ্রিম ওঁর হাতে দিয়ে আসতে হবে। তা না হলে, উনি আজ আর অভিনয় করবেন না।

—সে কি! এইরকম বিক্রী! আজ রবিবার। দুটো শো-ই

প্রায় ফুল হয়ে আছে, আর ও কিনা দু-দুণ্টা আগে এইরকম চেয়ে বসলো ?

—কি করব বলুন। কত করে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওঁর ঐ কথা। যাই হোক, ওঁর জেদ আমি বজায় রাখতে পারবো না। অভিনয় হবে এবং ওঁকে বাদ দিয়েই তার ব্যবস্থা করুন।

রাধানাথবাবু চলে গেলেন। বিজয়বাবু বুকিং-এর সামনে বড় বড় করে লিখে দিলেন—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আজ অসুস্থ। সুতরাং তাঁর পরিবর্তে মিঃ সেনের ভূমিকায় অমুক অভিনয় করবেন।

দুর্গাদাসবাবু অভিনয় করবেন না জেনে, অনেকে যেমন টিকিট কিনতে এসে ফিরে গেলেন, তেমনি আবার যাঁরা অগ্রিম টিকিট কিনেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও কেউ কেউ টিকিটের মূল্য ফেরত্ নিতে লাগলেন। বিজয়বাবু বিব্রত অবস্থায় একবার বুকিং অফিসে, একবার গ্রীনরুমে ছুটোছুটি করছেন। এরই মাঝে সহসা পৌনে তিনটে নাগাদ নিজে গাড়ি চালিয়ে দুর্গাদাস সশরীরে নাট্যভারতীর সামনে এসে হাজির! দর্শকেরা তাঁকে দেখে বিস্মিত। বিজয়বাবু অধিকতর বিব্রত। ওদিকে প্রিয় অভিনেতাকে কাছে পেয়ে দর্শকেরা তখন তাঁকে ঘিরে ধরেছে। আর নেশার ঝোঁকে দুর্গাদাস বক্তৃতা দিতে শুরু করেছেন—

ভদ্রমহোদয়গণ, থিয়েটারওয়ালাদের সব মিথ্যে কথা। আমি সশরীরে উপস্থিত। আর ওরা কিনা লিখে দিয়েছে—আমি অসুস্থ। টাকা চেয়েছিলাম, টাকা দেবার ভয়ে মিথ্যে কথা লিখেছে।—ইত্যাদি ইত্যাদি!

আর কোথায় আছে! দুর্গাবাবুর বক্তৃতার পরেই দর্শকেরা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। দুর্গাবাবুও গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে চলে গেলেন। এদিকে বিজয়বাবু তখন দর্শকদের প্রতিনিবৃত্ত করার জন্যে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন যে, দুর্গাবাবু স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। কিন্তু বোঝালে কি হবে? নাট্যভারতীর কর্মকর্তাদের সেদিন দর্শকদের কাছে কম

নাজেহাল হতে হয়নি।

এই ঘটনার পর মিঃ সেনের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। আর দুর্গাদাস যোগদান করেন মিনার্ভা থিয়েটারে।

॥ মায়া-মঞ্চ প্রপঞ্চময় ॥

নির্মলেন্দু লাহিড়া মশাই ছিলেন যেমন সুপুরুষ, তেমনি সুকণ্ঠের অধিকারী। অভিনয়শিল্পী হতে গেলে যে গুণগুলির একান্ত দরকার, তাঁর মধ্যে সেই গুণগুলি সবই ছিল। অভিনয় ক্ষেত্রে সহজাত প্রতিভা নিয়েই তিনি এসেছিলেন। তাঁর মাতুল ছিলেন কবি ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। কাজেই সহজাত প্রতিভার সঙ্গে নাটকীয় পরিবেশ গড়ে উঠেছিল তাঁর পারিবারিক জীবনে। উত্তরকালে যার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল—বাংলার রঙ্গজগতে। বিশেষ করে, দ্বিজেন্দ্রলালের বিভিন্ন ঐতিহাসিক নাটকের বহু চরিত্রে তিনি অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে রূপদান করেছেন। তাঁর মধুর কণ্ঠের আবৃত্তি বহুজনের কর্ণে সুধা বর্ষণ করেছে। রঙ্গালয় পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। উনষাট বছর বয়স্ পর্যন্ত তিনি বেঁচে ছিলেন। জীবনের শেষের দিকে রক্তচাপবৃদ্ধি রোগে তাঁর কর্মক্ষমতা কমে এসেছিল। তাই মধ্যে মধ্যে তিনি অভিনয় করতেন।

২নং নিয়োগী ঘাট স্ট্রীটের বাসাবাড়িটি তাঁর বড়ই প্রিয় ছিল। বাড়ির নীচে দিয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছে। রাস্তার ওপারেই দেবমন্দির, আর তার অদূরেই—উদ্বোধন কার্যালয়। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করে দেব-মন্দিরে যাওয়া, তারপর অবসর মত রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের সান্নিধ্যলাভের জন্যে উদ্বোধন কার্যালয়ে গিয়ে সৎকথা ও সদালোচনায় সময় কাটান, এ ছিল তাঁর প্রাত্যহিক কার্য।

মঞ্চের ওপর মানুষটি হাসি, কান্না, মিলন-বিরহের মূর্ত প্রতীক;

জীবনসায়াহ্নে সেই মানুষ শান্ত, সমাহিত। অদ্ভুত পরিবর্তন। একদিকে জ্যোতিষশাস্ত্র, পাঁজিপুঁথির ওপর অগাধ বিশ্বাস, অপর দিকে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি।

একদিন সন্ধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটারের সম্মুখে এক চশমার দোকানের বারান্দায় নির্মলদা বসে আছেন। সঙ্গে আরো কয়েকজন শিল্পী। এক সময়ে চশমার দোকানটি ছিল জনৈক শিল্পীর। তাই প্রতি সন্ধ্যায় বহু শিল্পীর সমাবেশ হোত ঐ দোকানে। যাই হোক, নির্মলদাকে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালাম। জিজ্ঞাসা করলাম—শরীর কেমন।

উত্তরে জানালেন, মোটেই ভাল নয়, ভাল হবার আশাও রাখি না। তবে যতদিন না মুক্তি পাওয়া যায়, ততদিন খাঁচায় থেকে ডানাঝাড়া, ছট্‌ফট্ করা—এই আর কি!

কথা শুনে বুঝলাম, নির্মলদা নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়েছেন। তাই, কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বললাম—আমাদের প্রয়োজনেই আপনাকে আরো কিছুকাল খাঁচায় আবদ্ধ থাকতে হবে।

—তোমাদের প্রয়োজনে?

—হ্যাঁ। মানে, মঞ্চের প্রয়োজনে।

—মায়া-মঞ্চ! ও তো প্রপঞ্চময়। কারুর প্রয়োজনের সে তোয়াক্কা করে না।

খুব গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন নির্মলদা। ততোধিক গুরুগম্ভীর ছিল তাঁর কণ্ঠস্বর। উপরোক্ত কথার মাঝে সহজাত প্রতিভাধর শিল্পীর আর এক প্রকাশভঙ্গি সেদিন আমার চোখে ধরা পড়লো।

এর মাস কয়েক পরে, ১৯৫০ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী নির্মলদা ইহলোক ত্যাগ করেন।

মৃত্যুর কয়েকদিন আগেও নির্মলদা বেশ সুস্থ ছিলেন। এমন কি মৃত্যুর দিন সকালেও তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় কাটিয়েছেন। বেলা নয়টা নাগাদ নির্মলদা তাঁর বড় ছেলে নবগোপালকে ডাকলেন। আদেশ

করলেন, দেওয়ালে টাঙানো শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ছবিটিকে নামিয়ে তাঁর সামনে রাখতে। নবগোপাল ছবিটাকে এনে তাঁর সামনে রাখলো। তারপর গঙ্গাজল নিয়ে নির্মলদা নিজের মাথায় ছিটোলেন। নবগোপালকে বললেন—ধূপধুনা জ্বেলে দিতে। ধূপধুনা জ্বালা হলে নবগোপালকে আদেশ করলেন উদ্বোধন কার্যালয় থেকে সত্যেন মহারাজকে ডেকে আনার জন্যে। নবগোপাল ছুটলো উদ্বোধন কার্যালয়ে। পরমহংসদেবের ছবির সম্মুখে ধ্যানস্থ হলেন নির্মলদা।

নবগোপাল যখন সত্যেন মহারাজকে নিয়ে ফিরে এল তার কয়েক মিনিট পরেই ইষ্টচরণে চিরশান্তিলাভ করলেন, প্রপঞ্চময় মায়া-মঞ্চের অন্যতম জ্যোতিষ্ক—নির্মলেন্দু লাহিড়ী। তিনি যখন চিরবিদায় নিচ্ছিলেন পৃথিবী থেকে, পাশের ঘরে তখন সন্তস্নাতা নির্মলেন্দু-জায়া সীমন্তে সিঁদুর পরছিলেন।

॥ একটি স্মরণীয় নাটকের জন্ম-বৃত্তান্ত ॥

১৮৯৮ সালের মার্চ মাসে গিরিশচন্দ্র অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটারে পুনরায় ফিরে আসেন। এর আগে গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটারে কিছুদিন কাজ করেছিলেন। কিন্তু চুণীলাল দেব তাঁকে সে সময়ে ক্লাসিক থিয়েটার থেকে মিনার্ভা থিয়েটারে নিয়ে যান।

গিরিশচন্দ্র দ্বিতীয়বার যখন ক্লাসিকে ফিরে আসেন, তখন অমরেন্দ্র-নাথ গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে রীতিমত লেখাপড়া করে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন। ঠিক হয়, মাসিক ৩০০৲ টাকা করে গিরিশচন্দ্র মাইনে পাবেন এবং বছরে অন্তত চারখানি করে নাটক লিখে দেবেন। তার মধ্যে অন্তত দু'খানি পঞ্চমাঙ্ক নাটক লিখতে হবে।

যাই হোক চুক্তি অনুযায়ী গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটারের জন্য 'দেলদার' নাটক রচনা করেন। উক্ত নাটক যথাসময়ে ক্লাসিকে

মঞ্চস্থ হয়।

'দেলদার' মঞ্চস্থ হওয়ার পর প্রায় বছরখানেকের মধ্যে গিরিশচন্দ্র আর কোন নতুন নাটক রচনা করতে পারেননি। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ তার জন্যে তাঁকে কোন তাগিদও দেননি। বরং নিজেই সেই সময় 'শ্রীকৃষ্ণ', 'মজা' প্রভৃতি নাটক রচনা করেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র নাট্যরূপ 'ভ্রমর' মঞ্চস্থ করেন। 'ভ্রমর' অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। প্রায় প্রতিটি অভিনয়েই হাউস ফুল হয়। এই সময়ে গিরিশচন্দ্রও যেমন নতুন নাটক রচনার প্রয়োজন অনুভব করেন না, তেমনি অমরেন্দ্রনাথও গিরিশচন্দ্রকে নাটকের জন্য তাগিদ দেন না।

এদিকে 'ভ্রমরের' অসামান্য সাফল্য ও প্রচুর বিক্রি দেখে গিরিশচন্দ্র অমরেন্দ্রনাথের কাছে মাস মাহিনার বদলে ক্লাসিক থিয়েটারের মালিকানার কিছু অংশ দাবী করেন। অমরেন্দ্রনাথ তখন ক্লাসিক থিয়েটারের একমাত্র মালিক। তিনি গিরিশচন্দ্রের এ প্রস্তাবে সম্মত হন না। মন কষাকষি চলতে থাকে। এদিকে অমরেন্দ্রনাথ লোক-পরম্পরায় শুনতে পান যে, গিরিশচন্দ্র পাকা কথা না দিলেও, ক্লাসিক থিয়েটার ছেড়ে মিনার্ভা থিয়েটারে যাবার জন্যে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। এ সংবাদে অমরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হন।

একদিন সকালে অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করেন :

—শুনছি, আপনি নাকি ক্লাসিক ছেড়ে আবার মিনার্ভায় যোগ দেবার মতলব করছেন ?

—উপায় কি। তুমি যখন আমার নতুন শর্তে রাজী হচ্ছ না। তখন—

অমরেন্দ্রনাথ মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেন :

—আপনার সঙ্গে বখরা দেওয়ার কথা ত' ছিল না। কথা ছিল, মাসিক মাইনে ৩০০৲ টাকা আপনি পাবেন। আর বছরে চারখানা নাটক আপনি দেবেন। প্রায় বছরখানেক হতে চললো আপনি ক্লাসিকে

এসেছেন। অথচ 'দেলদার' ছাড়া কোন নাটকই আপনি ক্লাসিকের জন্য রচনা করেননি। বুঝতে পারছি, আপনার দ্বারায় আর বইটই লেখা হবে না। তা যাক্—চুক্তি অনুযায়ী আপনার বাড়িতে মাসে মাসে ৩০০৲ টাকা আমি পৌঁছে দেব। আমার বিনীত অনুরোধ, এই বুড়ো বয়সে আর কোথাও গিয়ে আপনি ধাষ্টোমো করবেন না।

কথা ক'টি বলে অমরেন্দ্রনাথ ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

গিরিশচন্দ্রের নিত্যসহচর অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন পাশের ঘরে। অমরেন্দ্রনাথের সব কথাই তাঁর কানে গেছে। অমরেন্দ্রনাথ চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশচন্দ্র পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে গিরিশচন্দ্র বললেন—বাবু যা বলে গেল শুনলে ত'।

অমরেন্দ্রনাথকে সকলেই 'বাবু' বলে ডাকতেন। গিরিশচন্দ্রের কথার কোন উত্তর না দিয়ে অবিনাশচন্দ্র মাটির দিকে শুধু মাথা নীচু করে চেয়ে রইলেন।

গিরিশচন্দ্র পুনরায় বলতে থাকেন—আচ্ছা অবিনাশ, 'দেলদার' ছাড়া বাবুকে সত্যিই কি আর কোন বই বছরখানেকের মধ্যে দেওয়া হয়নি ?

—আজ্ঞে না। দশমাসের মধ্যে একমাত্র 'দেলদার'ই আপনি রচনা করেছেন।

—বল কি ? বেশ। আজ এখন থেকেই বসো। নিয়ে এসো—কালি-কলম, খাতা। এখনই বই লেখা শুরু করবো।

অবিনাশচন্দ্র তখনই খাতা কলম নিয়ে বসলেন গিরিশচন্দ্রের সম্মুখে। শুরু হোল নাট্য-রচনা। পাঁচদিনে লেখা হোল, পাঁচটি অঙ্ক। ছ'দিনের দিন অবিনাশচন্দ্রকে দিয়ে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিলেন অমরেন্দ্রনাথের কাছে। পাণ্ডুলিপি পড়ে শুধু অমরেন্দ্রনাথই মুগ্ধ হলেন না, সেই সঙ্গে বাংলার অগণিত নাট্যানুরাগী বিদ্বজ্জন মুগ্ধ হলেন সে নাটকের অভিনয় দেখে। সে নাটকটি হচ্ছে গিরিশচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্য-কীর্তি—'পাণ্ডব-গৌরব'।

।। একটি স্মরণীয় সংঘাত ও তার পরিসমাপ্তি ।।

১৯০০ সালে মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন শ্রীপুরের জমিদার নরেন্দ্রনাথ সরকার। নরেনবাবু বহুদিন ধরে গিরিশচন্দ্রকে মিনার্ভা থিয়েটারে নিয়ে আসার জন্যে চেষ্টা করছিলেন। তাঁর সে চেষ্টা সার্থক হল ক্লাসিকে 'পাণ্ডব-গৌরব' খোলার পর। অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ক্লাসিক থিয়েটারে 'পাণ্ডব-গৌরব' খোলার আগে থেকেই গিরিশচন্দ্র ও অমরেন্দ্রনাথের মধ্যে মনকষাকষি চলছিলো। সুযোগ আসার সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্র তা গ্রহণ করলেন। ১৯০০ সালের ৮ই এপ্রিল 'পাণ্ডব-গৌরব' নাটকে কঞ্চুকীর ভূমিকায় শেষ অভিনয় করে গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটার ছেড়ে মিনার্ভা থিয়েটারে এসে যোগদান করলেন।

অমরেন্দ্রনাথ সহজে ছাড়বার পাত্র নন। তাঁর সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের তিন বছরের চুক্তি ছিল। তিনি গিরিশচন্দ্রের নামে হাইকোর্টে মামলা রুজু করে ইনজাংশন-এর দরখাস্ত করলেন। অন্যথায় তিন হাজার টাকা খেসারত দাবী করলেন।

১৯০০ সালের ৭ই মে কলকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি মিঃ সেল রায় দিলেন। অমরেন্দ্রনাথের ইনজাংশনের প্রার্থনা নামঞ্জুর হল। সেই সময়ে ৯ই মে তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকায় এই মামলা সংক্রান্ত যে খবর বেরিয়েছিল তা এইরূপ :

'At the High court on Monday, Mr. Justice Sale delivered Judgement on the Rule, obtained on behalf of Amorendra nath Dutt, Proprietor and Manager of the Classic Theatre, against Girish Chandra Ghose, particulars of which have already appeared. His Lordship discharged the Rule remarking that on the affidavits, the breach was committed by the plaintiff by non-payment of the money. Then, with regard to the Rs. 3000 - three thousand

mentioned by way of liquidated damages, His Lordship thought that it did not prevent the plaintiff for applying for an injuncture. But as the defendant said that he understood that Rs. 3000 - three thousand would be the damage for any breach of contract, it was a question of evidence. But His Lordship thought that it was not safe to grant an injuncture, at present. The suit would not be beard for sometime and this is a case which ought to be expedited and if the parties would make any application, the court would be disposed to entertain it. Mr. R. Mitter, who appeared for the plaintiff, then applied for an order that the suit might be expidited. The court said that Mr. Mitter must consult the other side first and then the application could be made.'

উপরোক্ত বায়ে ইনজাংশন না পেয়ে, অমরেন্দ্রনাথ তিন হাজার টাকার খেসারতের মামলায় আব বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। থিয়েটার ভালভাবে যাতে চালানো যায় বরং সেই দিকেই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করলেন। এরপর ১৯০০ সালের ২৬শে মে অমরেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের লেখা গীতি-নাট্য 'দুটি প্রাণ' মঞ্চস্থ করলেন।

একদিন তিনি থিয়েটারে যাচ্ছেন, বিডন স্ট্রীটের এক দেওয়ালে সহসা তাঁর নজর পড়ল। মিনার্ভায় 'সীতারাম'। থিয়েটারে এসেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' আনিয়ে সেই রাত্রের মধ্যেই সীতারামের নাট্যরূপ দান করলেন এবং তার পরের সপ্তাহেই অর্থাৎ ৩০শে জুন তারিখে 'সীতারাম' মঞ্চস্থ করলেন। এবং অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং সীতারামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। একটি দৃশ্যে অমরেন্দ্রনাথ সীতারাম সেজে অশ্বপৃষ্ঠে মঞ্চে অবতরণ করতেন। মোট কথা, মিনার্ভা থিয়েটারের তথা গিরিশচন্দ্রের পরিচালিত 'সীতারাম' অপেক্ষা ক্লাসিকের হাতে 'সীতারাম'

অধিকতর আকর্ষণীয় হয়। তার জন্যে অমরেন্দ্রনাথের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। শুধু তাই নয়, অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিকের হ্যাণ্ডবিলে লিখলেন—'ক্লাসিকের সীতারাম দৃপ্ত যুবা, স্থবির নহে।' অর্থাৎ মিনার্ভায় গিরিশচন্দ্র সীতারামের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন। বস্তুতপক্ষে তাঁকে উদ্দেশ্য করেই হ্যাণ্ডবিলে একথা লেখা হয়েছিল।

গিরিশচন্দ্রও ছাড়বার পাত্র নন। তিনি সংবাদপত্রে, বিজ্ঞাপনে এবং হ্যাণ্ডবিলে লিখলেন :

'Our representation we feel bold to say, will prove to them that howling is not acting and that such a subject, at once serious and sublime ought not to be handled by quack who will unscrupulously lay their hands on the most complicated cases without possessing the requisite qualification of even a common place amateur.

মিনার্ভার উপরোক্ত বিজ্ঞাপনের উত্তরে, অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিকের বিজ্ঞাপনে লিখলেন :

'We do not know rather we are not ambitious of making a gigantic preface, but to appeal to our patrons and friends with due courtesy and dignity to come and see our performance and then compare! No doubt they will find a difference of Heaven and Hell! No more for the present! Now good bye!

ক্লাসিকের উপরোক্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার পর, পরের দিন সংবাদপত্রে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভার বিজ্ঞাপনে লিখলেন :

It has been said that there is a difference of Heaven and Hell! Aye! Let us hope so at least.'

বিজ্ঞাপনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ লেখালেখির মাধ্যমেই শেষ হ'ল না, অমরেন্দ্রনাথ কার্টুন ছবি দিয়ে হ্যাণ্ডবিল ছাপাতে শুরু করলেন। কোন কোন বিজ্ঞাপনে লিখলেন—'নট, নর্তকী ও নাপিত চল্লিশের ঊর্ধ্বে কাজের

বার।' ইত্যাদি।

যাই হোক, কয়েক মাস এইভাবে বিজ্ঞাপন-যুদ্ধ চলার পর, ১৯০০ সালের ২৪শে নভেম্বর গিরিশচন্দ্র পুনরায় ক্লাসিকে যোগদান করেন। অমরেন্দ্রনাথ বিজ্ঞাপনে ঘোষণা করেন :

'নাট্যামোদী সুধিবৃন্দকে আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, নটকুল-চূড়ামণি পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত, আমাদের সকল বিবাদ মিটিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় যে-কয়েকটি স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হইয়াছে, সকল গুলিরই সৃষ্টিকর্তা—শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র। প্রায় সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রীই—গিরিশচন্দ্রের শিক্ষায় গৌরবান্বিত। তাহার মধ্যে আমিও একজন। গিরিশবাবুর সহিত বিবাদ করিয়া নিতান্তই ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছিলাম। বড়ই সুখের বিষয়, সমস্ত মনোমালিন্য অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলিয়া, তাঁহার স্নেহময় কোলে আবার তিনি টানিয়া লইয়াছেন। গিরিশবাবুর কোনও থিয়েটারের সহিত এখন কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। তাঁহার সমস্ত নূতন নূতন নাটক, গীতি-নাট্য পঞ্চরং এখন ক্লাসিকে অভিনীত হইবে। 'ক্লাসিক থিয়েটার' ব্যতীত অপর কোনও রঙ্গমঞ্চের সহিত গিরিশবাবুর কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। শ্রীযুক্ত 'গিরিশচন্দ্র' এখন 'ক্লাসিকে'র ? নিবেদনমিতি।'

॥ একটি প্রতিভার অপমৃত্যু ॥

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর আট দিন পূর্বে, তাঁর চিকিৎসকের পরামর্শানুযায়ী ঠিক হয়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে দিয়ে একবার দুর্গাবাবুকে পরীক্ষা করানোর।

নাট্যভারতীর ম্যানেজার শ্রীযুক্ত বিজয় মুখোপাধ্যায় সে সময় প্রায় প্রতিদিনই দুর্গাবাবুকে দেখতে যেতেন। বিজয়বাবু ডাঃ রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ডাঃ রায় যে সময়ে দুর্গাবাবুকে দেখতে যাবেন

বলে কথা দেন, বিজয়বাবু তার আগেই দুর্গাবাবুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন এবং দুর্গাবাবুর গৃহচিকিৎসকের সঙ্গে ডাঃ রায়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। ডাঃ রায় যথাসময়ে উপস্থিত হন। দুর্গাবাবুকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে ডাঃ রায় বলেন ঃ

—মদ আপনার দেহে বিষের কাজ করেছে।

—তা হবে। কিন্তু মদ ত' আমি এখন ছেড়ে দিয়েছি।

—কিন্তু সে আর ক'দিন? আরো আগে ছাড়তে পারলে ভাল হোত।

—আপনি বিশ্বাস করুন। প্রায় বছরখানেকের মধ্যে আর আমি মদ খাইনি।

—বিয়ার?

—হ্যাঁ। বিয়ারই ত' ইদানীং। খেতাম।

—কতটা? এক বোতল?

—না। তারও বেশি।

—ক' বোতল?

—তা বলতে পারবো না। তবে গাড়িতে সব সময়ের জন্যেই বেশ কয়েকটা বোতল রেখে দিতাম।

দুর্গাবাবুর কথা শুনে ডাঃ রায় গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটা প্রতিভার এইভাবে অপমৃত্যু বোধহয় তাঁকে কাতর করে তুলেছিল। তাই বললেন—বিয়ারটাও সোডা-লেমনেড নয়। ওটাও মদেরই অঙ্গ। যাই হোক, মদ আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়তে হবে।

ডাঃ রায়ের উপরোক্ত কথায় দুর্গাবাবু যেন বিরক্ত হলেন। বললেন, —উপদেশ চাই না। চাই প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন। আপনি ডাক্তার আর আমি রোগী। পারেন তো কাগজকলম নিয়ে প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন করুন। জীবনে বহু উপদেশ শুনেছি। বাবা, কাকার উপদেশও কোনদিন কানে তুলিনি। আজও তুলবো না—

দুর্গাবাবুর কথা শুনে ম্লান হাসেন ডাঃ রায়। তারপর ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। পাশের ঘরে এসে দুর্গাবাবুর গৃহ-

চিকিৎসককে বললেন—প্রেস্‌ক্রিপ্‌সন্‌ করা নিরর্থক। কোন ঔষধেই আর কিছু হবে না। তবে দুঃখ এই, একজন প্রতিভাধর শিল্পীকে যখন দেখতে এলাম তখন আর আমার কিছু করবার নেই। তিলে তিলে নিজেকেই নিজে শেষ করেছেন।

বিজয়বাবুর কাছে দুর্গাবাবু ডাঃ রায়ের ফিয়ের দরুণ ৬৪৲ টাকা দিয়ে রেখেছিলেন। বিজয়বাবু টাকা ক'টা এগিয়ে দিলেন ডাঃ রায়ের দিকে। ডাঃ রায় ফিয়ের টাকা ফিরিয়ে দিলেন বিজয়বাবুকে। আর সেই সঙ্গে গভীর বেদনায় ভেঙে পড়ে বললেন—একটা প্রতিভার অপমৃত্যু দেখে গেলাম। এর জন্যে ফি দিতে হবে না। যদি কিছু করতে পারতাম বা তার উপায় থাকতো তাহলেও না হয়—

এরপর আর কোন কথা না বলে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন ডাঃ রায়। সঙ্গে বিজয়বাবু ও দুর্গাবাবুর গৃহচিকিৎসক তাঁকে অনুসরণ করলেন। ডাঃ রায়ের গাড়ি স্টার্ট নিল।

আর এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দুর্গাবাবু।

॥ মামলার ফল ॥

১৯০১ সালে অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক থিয়েটার থেকে 'রঙ্গালয়' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। যদিও 'রঙ্গালয়' প্রকাশের আগে দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক পত্রিকায় থিয়েটারের নাটক সম্পর্কে সমালোচনা প্রকাশিত হতো, কিন্তু থিয়েটার সম্পর্কিত তেমন সংবাদ বা নিবন্ধ বড় একটা প্রকাশিত হতো না। এই অভাব মোচন করার জন্যে অমরেন্দ্রনাথ 'রঙ্গালয়' প্রকাশ করেন।

রঙ্গালয়ের অনুষ্ঠান-পত্রে অমরেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'নানাবিধ কারণে প্রায় সমস্ত বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের কোপদৃষ্টিতে

আমরা পড়িয়াছি। তাঁহাদের নিকট উৎসাহ পাওয়া দূরে থাক, প্রতিপদে পদদলিত হইবার আশঙ্কা। যদি প্রয়োজন হয়,—উক্ত মহাত্মাগণের মনোবিরাগের কারণ, আমরা পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে পরে প্রমাণ করিব। আপাততঃ স্থানোপযোগী হইবে না বলিয়া বিরত হইলাম।

অনেকে সংবাপত্রে রঙ্গভূমির অভিনয় সমালোচনা পাঠ করিয়া দোষ-গুণের সত্যাসত্য বিচার করেন। হয়ত কোনও সম্পাদক লিখিয়াছেন—'অমুক স্থানটি ভাল হয় নাই!'—কেন ভাল হইল না, মন্দ কোনখানটায় এবং সংশোধন করিয়াই বা কিরূপ হইবে, সে সকল কথা কেই বা বলে, আর কেই বা শোনে!! অথচ আমাদের এমন কোন উপায় নাই যাহার দ্বারা প্রতিবাদ চলে। সে অভাব দূর করিবার জন্য এবং বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চসমূহ সর্বসাধারণের উপকার কি অপকার সাধন করিতেছে, তাহাও বিশিষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য, আরও কি করিয়া অভিনয় করিতে হয়, কিরূপ শিক্ষায় উচ্চ অঙ্গের অভিনেতা হওয়া যায়, রঙ্গালয়ের উন্নতি বা অবনতি ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় পর্যালোচনা করিবার উদ্দেশ্যে 'রঙ্গালয়' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিতরূপে, 'ক্লাসিক থিয়েটার' হইতে প্রকাশিত হইবে।'

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ওপর সম্পাদনার ভার দিয়ে অমরেন্দ্রনাথ 'রঙ্গালয়' চালাতে লাগলেন। দীর্ঘ চার বৎসরকাল 'রঙ্গালয়' প্রকাশিত হয়। অমরেন্দ্রনাথ 'রঙ্গালয়'কে জনপ্রিয় করার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করেছিলেন। রঙ্গালয়ের গ্রাহকদের 'অমর গ্রন্থাবলী', 'গিরিশ গ্রন্থাবলী' উপহার দেওয়া, এমন কি রঙ্গালয়ের গ্রাহকদের বছরে একদিন বিনামূল্যে ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় দেখানোরও ব্যবস্থা করেছিলেন। এর দ্বারায় প্রচুর গ্রাহক হয়েছিল 'রঙ্গালয়'-এর। অমরেন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল, রঙ্গালয়ের এক লক্ষ গ্রাহক করা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা সম্ভব হয়নি। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল দুই পয়সা, অথচ প্রতিটি সংখ্যা ছাপাতে সে সময় খরচ পড়তো ছয় পয়সা। এইভাবে চার বৎসর

সাপ্তাহিক 'রঙ্গালয়' চালিয়ে অমরেন্দ্রনাথের ষাট হাজার টাকা লোকসান হয়। 'রঙ্গালয়'-এর নিয়মিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন, গিশিরচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি তদানীন্তন কালের দিক্‌পাল নাট্যকারেরা।

এই চার বৎসর কাজ চালানোর মধ্যে অমরেন্দ্রনাথকে দুটি মামলার সম্মুখীন হতে হয়। একটি 'নবযুগ'-এর সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে, অপরটি 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

প্রথমটি 'নবযুগ' সম্পাদক পূর্ণচন্দ্র গুপ্তের নামে মানহানির মামলা করেন অমরেন্দ্রনাথ। দ্বিতীয়টি অমরেন্দ্রনাথের নামে মামলা করেন 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ। পূর্ণবাবুর সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। কিন্তু 'রঙ্গালয়' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করার ব্যাপারে তিনি মনঃক্ষুন্ন হন। পূর্ণবাবুর ইচ্ছা ছিল তিনিই সম্পাদক হন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ পাঁচকড়িবাবুকে সম্পাদক নিযুক্ত করেন। পরে পূর্ণবাবু তাঁর কাগজে অমরেন্দ্রনাথকে কটাক্ষ করে প্রবন্ধ লেখেন, এই ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত মামলা শুরু হয়। আর অপর মামলাটি হয়, রঙ্গালয়ে উপেন্দ্রনাথের ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের জন্য। উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে মামলাটি সহজেই মিটে যায়। কিন্তু পূর্ণবাবুর সঙ্গে যে মামলা চলে, সে মামলাটি হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। নিম্ন-আদালতের বিচারে পূর্ণ-বাবুর কারাদণ্ড হয়। পূর্ণবাবু হাইকোর্টে আপীল করেন। দীর্ঘদিন মামলা চালাতে গিয়ে পূর্ণবাবু বড়ই বিপন্ন হয়ে পড়েন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি ক্লাসিক থিয়েটারে আসেন ও অমরবাবুর ঘরে প্রবেশ করেন। অমরবাবু সসম্মানে তাঁকে আহ্বান করেন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে পূর্ণবাবুর মুখে তাঁর আর্থিক অভাবের কথা জানতে পেরে সেইদিনের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ পূর্ণবাবুর হাতে তুলে দেন। সেদিন অমরেন্দ্রনাথের মহত্বে মামলারই শুধু পরিসমাপ্তি ঘটে না, সেই সঙ্গে বন্ধুত্বেরও চরম নিদর্শন চিহ্নিত হয়ে থাকে।

॥ আন্তরিক প্রয়াস ॥

একদিন সকালে হঠাৎ রঙমহলের গাড়িটা এসে হাজির হলো। ড্রাইভার জানালো—শরৎদা আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ি পাঠিয়েছেন। ড্রাইভারকে জানালাম—কিন্তু এখন যাই কি করে? অফিস আছে।

শরৎদার ড্রাইভারটিও ছিল তেমনি, নাছোড়বান্দা! বললে—আপনাকে না নিয়ে গেলে বাবু বকাবকি করবেন, চলুন একবার দয়া করে, এখুনি গাড়ি করেই না হয় আপনাকে ফিরিয়ে দিয়ে যাব।

কি কবি! ড্রাইভারের পীড়াপীড়িতে গায়ে জামা চাপিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলাম।

গাড়ি আমাকে নিয়ে থিয়েটারে গেল না। গেল, শরৎদার সাহিত্য-পরিষদ স্ট্রীটের বাড়িতে। বাইরের ঘরে শরৎদার ছোটভাই বিনয়বাবু বসে আছেন। আর তাঁর চারদিকে খাঁচায় ভর্তি গিনিপিগ, খরগোস, বিলিতী ইঁদুর প্রভৃতি পরমানন্দে কল্‌মী শাক চিবুচ্ছে!

আমাকে দেখে বিনয়বাবু বললেন—ওপরে যান। দাদা ওপরে আছেন।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি—শুনলাম বিকট নাসিকাগর্জন। ওপরে আর ওঠা হলো না! নেমে এলাম। বিনয়বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—শরৎদা কি ঘুমোচ্ছেন নাকি?

—না দাদা ত' জেগেই আছেন।

—আমার ত' মনে হয় জেগেই ছিলেন। এখন ঘুমোচ্ছেন? আসুন ত'।

বিনয়বাবু আমার সঙ্গে ওপরে এলেন। দেখলাম, আমার অনুমান মিথ্যা নয়। শরৎদা সত্যিই ঘুমোচ্ছেন। ভারী আয়েসী মানুষ ছিলেন শরৎ চট্টোপাধ্যায় মশাই। পেতলের ঝক্‌ঝকে খাটের ওপর পুরু গদিতে শুয়ে আছেন। পরণে দেশী কালোপাড় ধুতি, গায়ে নেটের গেঞ্জি। নাক ডাকছে। কিন্তু হাতে আছে একটা জ্বলন্ত সিগারেট।

বিনয়বাবু বললেন—দেখছেন ত' দাদার কাণ্ড। পাঁচ মিনিটও হয়নি আমার সঙ্গে কথা কইলেন। আপনার কাছে গাড়ি পাঠান হয়েছে কি না, জিজ্ঞেস করলেন। আর এর মধ্যেই দেখুন ঘুমিয়ে পড়েছেন। এই সিগারেট হাতে নিয়ে ঘুমোনর জন্যে দেখছেন ত' এমন বিছানাটার কি অবস্থা করেছেন।

সত্যিই। তাকিয়ে দেখি, বিছানার চার-পাঁচ জায়গায় সিগারেটের আগুনে পুড়ে ফুটো হয়ে গেছে।

—দাদা।

—কে?

বিনয়বাবুর ডাকে শরৎদা ধড়মড় করে উঠে বসলেন এবং সিগারেটে টান দিয়ে বললেন—এস ভাই, এস। বস।

—কি ব্যাপার! সকালেই পেয়াদা পাঠিয়েছেন কেন?

—পাঠিয়েছি কি সাধে? তোমাকে আমার বড্ড দরকার। বসো। পরামর্শ আছে। ওরে চা দিয়ে যা—

—এই মাত্র চা খেয়ে আসছি। এখন আর চা খাব না। এখুনি খেয়ে অফিসে যেতে হবে।

—অফিসে আজ আর তোমার যাওয়া হবে না। থিয়েটার থেকে 'ভারতবর্ষ' অফিসে একটা টেলিফোন করে দাও।

—না না, মাসের প্রায় শেষাশেষি হয়ে এলো। কাগজ বার করার সময়। এখন কি কামাই করতে পারি?

—যা হোক করে আজকের দিনটার মত ডুব দাও ভাই। আমি প্রোগ্রাম করে ফেলেছি। আজ সারাদিনের মতই তোমাকে দরকার। এখুনি তোমায় নিয়ে বেরুবো।

—কোথায়?

—সে অনেক জায়গায়। মোটকথা তোমাকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে। শুধু এইটুকু বিশ্বাস করতে পার। বড় ভাই হয়ে জাহান্নমে তোমাকে নিয়ে যাব না। শোন, এই মাসেই বই খুলতে হবে।

—সে কি। নতুন নাটক দশরাত্রিও ত' হয়নি এখনো।

—না। তারাশঙ্করবাবুর অত ভাল লেখা। কিন্তু বেচাকেনা মোটেই সুবিধে হচ্ছে না।

—অভিনয় ত' বেশ ভালই হয়েছে। তাছাড়া casting-ও ভাল। Production ও ভাল। জোরদার নাটক—

—সব ভাল। কিন্তু তবুও চলছে না।

—কেন ?

—কি জানি। সবই অদৃষ্ট! এখন অসুবিধে হয়েছে কি জান ? বিরাট খরচ। যা পাচ্ছি, তাতে সব দিক সাম্‌লে উঠতে পারছিনে। যাক্, উপেন গাঙ্গুলী মশাইয়ের 'রাজপথ' পড়েছ ?

—পড়েছি।

—নাটক করলে কেমন হয় ?

—নাটক হতে পারে। তবে কিছু অদল-বদল করতে হবে। স্বাধীনতার আগে লেখা বই। স্বাধীনতার পরে করতে গেলে তার কিছু পরিবর্তন করার দরকার।

—যা করার দরকার তা করো। চলো, আজ উপেনবাবুর কাছে। বসো। আমি ready হয়ে নি।

—এখুনি বেরুবেন ?

—হ্যাঁ।

—তা বাড়িতে ত' একটা খবর দেওয়া দরকার।

—দারোয়ানকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও তোমার বাড়ি গিয়ে খবর দিয়ে আসুক।

ইতিমধ্যে চা ও জলখাবার এলো। দু'জনে সেগুলির সদ্ব্যবহার করলাম।

শরৎদা গায়ে জামা চাপিয়ে বললেন—চলো।

সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। জীবজন্তুগুলি বাইরের ঘরে যথারীতি কল্‌মী শাক চিবুচ্ছে। শরৎদা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন—

দেখছ ত' কাণ্ডটা। নাটক না চললে কি হবে? এদের মুখ—ঠিকই চলছে। রোজ এক টাকার কল্‌মী শাক।

শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'বিংশ শতাব্দী' নাটকে ডাঃ শাস্ত্রীর ল্যাবরেটরী গিনিপিগ, খরগোস, বিলিতী ইঁদুর প্রভৃতি দিয়ে সাজানো হতো। নাটকটির প্রযোজনা করেছিলেন নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী। 'বিংশ শতাব্দী' নাটকে অহীনদা নিজে ডাঃ শাস্ত্রীর ভূমিকায় অবতরণ করতেন। নাটকটি সবদিক থেকে নূতনত্বের দাবী নিয়ে এসেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নাটকটি চলেনি।

শরৎদার নির্দেশমত তাঁর সঙ্গে ত' বেরুলাম। বেলা তখন দশটা। থিয়েটারে যখন ফিরলাম তখন সন্ধ্যা ছ'টা। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে দুপুরের দিকে উপেনদার সঙ্গে দেখা করে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে 'রাজপথ' নাটক করার অনুমতি গ্রহণ করলাম। বাকী সমস্ত সময় শরৎদা অফিস পাড়া, হাইকোর্ট পাড়া, মধ্য কলিকাতা, বালীগঞ্জ প্রভৃতি নানা জায়গায় গাড়ি থামিয়ে চলে যান, আমি গাড়িতে বসে থাকি, কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি আবার ফিরে এসে গাড়িতে বসেন। গাড়ি চলতে থাকে। শুরু হয় 'রাজপথ' নাটক রচনা করা এবং তা মঞ্চস্থ করার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা। এর মধ্যে বার দুই রেস্টুরেণ্টে চা খাওয়া হয়েছে। বাকী সময় শুধু ঘুরে বেড়ান হলো। অন্তত পঁচিশ জায়গায় ঢুঁ মারলেন শরৎদা।

ফেরার পথে জিজ্ঞাসা করলাম—এত জায়গায় ঘুরলেন কেন? কি উদ্দেশ্য?

শরৎদা বললেন—ঘুরলাম কি সাধে? আজ দশ তারিখ। মাইনে দিতে হবে। কিছুই হাতে ছিল না।

—তা জোগাড় হলো কিছু।

—হয়েছে বৈ কি।

—কত?

—তা বলতে পারব না। যেখানে যা পেয়েছি, নিয়েছি। থিয়েটারে

গিয়ে হিসেব করব।

থিয়েটারে এলাম। শরৎদার সঙ্গে তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। শরৎদা এ-পকেট ও-পকেট থেকে নোট বার করতে লাগলেন। গুনে দেখা গেল, প্রায় হাজার পাঁচেক টাকা সংগ্রহ করেছেন।

বললাম—শুধু হাতে এতগুলো টাকা সংগ্রহ করলেন?

—না। হ্যাণ্ডনোট দিতে হয়েছে।

—এত ঝক্কি নিয়ে এইভাবে থিয়েটার চালাচ্ছেন?

—এ আর এমন কি। আমার আগে যাঁরা থিয়েটার চালিয়ে গেছেন, তাঁরা এর চেয়ে অনেক বেশি ঝক্কি নিয়ে গেছেন। বাংলা দেশের থিয়েটার ত' এইভাবে আজো বেঁচে আছে ভাই।

শরৎদার কথাগুলো শুনে সেদিন সবিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়েছিলাম। কোন উত্তর দিতে পারিনি। আজ থিয়েটারের সুদিনে, শুধু সেই দুর্দিনের কথাই বাব বার মনে হচ্ছে—বাংলা দেশের থিয়েটারকে কি ভাবে তাঁরা বাঁচিয়ে রেখে গেছেন। কি অপরিমেয় ভালবাসাই না ছিল তাঁদের থিয়েটারের প্রতি।

॥ দুর্গা বাঁড়ুয্যে দুটো হবে না ॥

১৯২৯ সালের কথা। আর্ট থিয়েটারে তখন 'মন্ত্রশক্তি' চলছে। নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের 'মৃগাঙ্ক'র ভূমিকায় অভিনয়ের সুখ্যাতি সর্বত্র। কিন্তু অহীন্দ্রবাবুর সঙ্গে সহসা আর্ট থিয়েটারের যোগসূত্র ছিন্ন হল। অহীন্দ্রবাবু আর্ট থিয়েটার ছেড়ে মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করলেন। এই সময়ে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'মন্ত্রশক্তি' নাটকে 'মৃগাঙ্ক'র ভূমিকায় অভিনয় করতে লাগলেন। শনিবার এবং রবিবারে তখন 'মন্ত্রশক্তি'র অভিনয় হোত। এই সময়ে দুর্গাবাবু তাঁর পরিবার-বর্গকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দেওঘরে পাঠিয়েছিলেন।

এক শনি-রবিবারে অভিনয় ক'রে দুর্গাবাবু দেওঘরে গেলেম পরিবারবর্গকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনার জন্যে।

শিল্পীরা সাধারণত লোকপ্রিয় হন। বিশেষ করে যাঁরা স্বনামখ্যাত তাঁদের ত' আর কথাই নেই। সে যুগে দুর্গাবাবুর অসামান্য জনপ্রিয়তা ছিল। দেওঘর স্টেশনে পরিবারের লোকজনদের নিয়ে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন. রেলের কর্মচারী দুর্গাবাবুর কাছে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁরাই উপযাচক হয়ে দুর্গাবাবুর কলকাতায় ফেরার টিকিট কিনিয়ে দেওয়া থেকে আরম্ভ করে সর্বপ্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে দিলেন।

যে ট্রেনে দুর্গাবাবু কলকাতায় ফিরছিলেন সেই ট্রেনে একটা ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্ট খালি ছিল। রেলের কর্মচারীরা সেই গাড়িতে দুর্গা-বাবুর কলকাতায় ফেরার ব্যবস্থা করে দিলেন। দুর্গাবাবু ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। গাড়ি ছেড়ে দিল। কিন্তু তখন কে জানত যে ঐ কম্পার্টমেণ্টটি বর্ধমান থেকে কলকাতা পর্যন্ত রিজার্ভ হয়েছিল বাংলার তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব এ কে ফজলুল হক সাহেবের জন্য। যাই হোক, দীর্ঘপথ নিশ্চিন্ত মনে পরম আরামে কাটিয়ে শেষে দুর্গাবাবুর ঝঞ্ঝাট হোল বর্ধমানে এসে।

ট্রেনটি বর্ধমান স্টেশন প্লাটফরমে এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজকর্মচারীরা ব্যস্তভাবে হক সাহেবের চিহ্নিত গাড়িটি খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও তাঁরা গাড়িটির হদিস করতে না পেরে শেষে রেলকর্মচারীদের শরণাপন্ন হলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িটির সন্ধান মিললো। রেলকর্মচারীরা দুর্গাবাবুকে এসে অনুরোধ জানালেন গাড়িটি খালি করে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু দুর্গাবাবু রেলকর্মচারীদের অনুরোধ রাখলেন না। বললেন—রিজার্ভের লেবেল কোথায়? সত্যিই কোন লেবেল আঁটা ছিল না। দুর্গাবাবুকে সন্তুষ্ট করার জন্যে রেলকর্মচারীরা লেবেলটি দেওঘর থেকেই অপসারণ করে দুর্গাবাবুকে তুলে দিয়েছিলেন।

একদিকে রেলকর্মচারীদের কম্পার্টমেণ্ট খালি করে দেওয়ার জন্যে

উপরোধ অনুরোধ, অপর দিকে দুর্গাবাবুর জিদ। তিনি কিছুতেই গাড়ি থেকে নামবেন না। শেষ পর্যন্ত পুলিশী জুলুমও শুরু হোল। কিন্তু দুর্গাবাবু তাতেও অবিচলিত। হক সাহের দূর থেকে সবই লক্ষ্য করছিলেন। তিনি জানতেন দুর্গাবাবুকে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ ও রেলকর্মচারীদের তিনি নিরস্ত করে নিজেই অপর একটি ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে উঠে পড়লেন।

কিন্তু এই ঘটনার যবনিকাপাত এইখানেই হোল না। দুর্গাবাবুর নামে শমন এলো বর্ধমান কোর্ট থেকে। পুলিশ-কেস্-এ কিছু অর্থদণ্ডও দিতে হোল দুর্গাবাবুকে। কিন্তু তাতেই বা কি? খেয়ালী-শিল্পীর জীবনে এ ঘটনাটাও ত' চিহ্নিত হয়ে থাকলো।

প্রায় সব সময়েই নেশায় মশগুল হয়ে থাকতেন দুর্গাবাবু! তাই বর্ধমান স্টেশনে যখন হক সাহেবের জন্যে দুর্গাবাবুকে কম্পার্টমেণ্ট খালি করে দিতে বলা হয়েছিল তখন দুর্গাবাবু স্পষ্ট জানিয়েছিলেন—এক প্রধানমন্ত্রীর জায়গায় আর একজন প্রধানমন্ত্রী হতে পারে। কিন্তু দুর্গা বাঁড়ুয্যে দুটো হবে না। কথাটা হয়ত তিনি নেশার ঝোঁকেই বলেছিলেন কিন্তু দুর্গা বাঁড়ুয্যে দুটো হয়নি, এটা বাস্তব সত্য।

।। ভয় ও জয় ।।

১৯৩২ সালের কথা। আর্ট থিয়েটারে অনুরূপা দেবীর "পোষ্যপুত্রের" নাট্যরূপ মঞ্চস্থ হবে। অনুরূপা দেবীর উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছেন অপরেশচন্দ্র। শ্যামাকান্তের ভূমিকায় দানীবাবুকে (সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ) নির্বাচন করেন অপরেশচন্দ্র। কিন্তু "পোষ্যপুত্র" মঞ্চস্থ হওয়ার কিছুদিন আগে থেকে দানীবাবু কয়েকজন সাংবাদিকের ক্রমাগত কলমের খোঁচায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। ঐ সময়ে কেউ কেউ 'শ্বেতহস্তী' কেউ বা 'স্থবির' ইত্যাদি আখ্যা দেওয়ায় দানীবাবু শ্যামাকান্তের ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ করতে

অসম্মত হন।

কাগজওয়ালাদের বড় ভয় করতেন দানীবাবু। তাই অপরেশচন্দ্র দানীবাবুকে শ্যামাকান্তের পার্টটি দিলে দানীবাবু পার্টটি ফেরৎ দিয়ে বলেন, "না মশাই, ও পার্ট আমি করতে পারবো না। কাগজওয়ালারা গালাগালি দেবে।"

—না না, গালাগালি দেবে কেন? এ পার্ট ত আপনার বয়সের উপযুক্ত পার্ট।

—না মশাই, আমাকে রেহাই দিন। "পথের শেষের" দুর্গাশঙ্করের মত পার্ট। সেখানেও বাপ ছেলে। এখানেও বাপ ছেলে।

—চরিত্রটা কতকটা এক রকম হলেও দুর্গাশঙ্করের চরিত্রের মত অত মেলো নয়।

—তা না হোক। ও এক ধরনের পার্ট করে আর গালাগালি খেতে রাজী নই মশাই।

—কেন? সিরাজদ্দৌলার পর মীরকাশিম করেও ত যথেষ্ট সুনাম পেয়েছিলেন।

—তা পেয়েছিলাম। তখন আমার বয়েস ছিল। আমার অভিনয় দেখতে লোক ছুটে আসতো। তাছাড়া তখন বাপি (নটগুরু গিরিশচন্দ্র) ছিলেন মাথার ওপরে। ভুলত্রুটি সংশোধন করে দিতেন। এখন আমার কি আছে?

—আছে, সব আছে, নইলে আজও আপনি যখন যুবক প্রবীর সাজেন, তখনও ত' যথেষ্ট দর্শক সমাগম হয়।

—না মশাই। কাগজওয়ালাদের আমি বড় ভয় করি। আবার কি বলে বসবে। এ বয়সে আর নিন্দে কুড়োতে রাজী নই।

নানান যুক্তিতর্কেও রাজী করাতে পারেন না অপরেশচন্দ্র। শেষ পর্যন্ত বলে বসেন—আপনি সরলার গদাধরচন্দ্রের 'ডি ডি টরলে' ভুলে যান। চাণক্যের মত বলুন—"ঐ অবিশ্বাসী বৌদ্ধযুগ ধরে ফেলেছে, ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব যেতে বসেছে—রাখতে পারবো না। তবু যাবার পূর্বে

এই কলির ব্রাহ্মণ একবার দ্বাদশসূর্যের মত আকাশ পুড়িয়ে দিয়ে চলে যাবো।"

চাণক্যের উত্তেজনাপূর্ণ সংলাপ শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন দানীবাবু। তারপব অপরেশচন্দ্রের হাত থেকে শ্যামাকান্তের পার্টটি নিলেন।

বহু কৌশলে শেষ পর্যন্ত দানীবাবুকে দিয়ে যে পার্টটি করান হয়েছিল সেইটাই তাঁর নট-জীবনেব শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তিরূপে আজো চিহ্নিত হয়ে আছে।

একদিন যে কাগজওয়ালাদের ভয়ে তিনি শ্যামাকান্তের ভূমিকায় মঞ্চাবতরণ কবতে রাজী হননি, সেই কাগজওয়ালাদেরই অন্যতম 'নাচঘর' পত্রিকা দানীবাবুর অসুস্থতার সময়ে তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন—"দানীবাবুব অভাবে পোষ্যপুত্রের অবস্থা হয়েছে বড় কাহিল। মাত্র একজন নাটুয়াব অভাবে যে নাটকের হাল হয় এমন ধারা, সে নাটক কেমন নাটক? তবে কি বুঝতে হবে যে, অপরেশবাবুর হাতযশ দানী-বাবুব কাছ থেকেই ধার করা? লোকে নাটক দেখতে যেতো, না দেখতে যেতো দানীবাবুকে—ভেল্কি খেলে যাঁর বুড়ো হাড়ে? হা অপরেশচন্দ্র! ধন্য দানীবাবু।"

॥ খ্যাতির বিড়ম্বনা ॥

১৮৮৪ সাল। স্টার থিয়েটারে 'চৈতন্যলীলা' নাটকের সুখ্যাতি লোকের মুখে মুখে। 'চৈতন্যলীলা' নাটক রচনা করে, গিরিশচন্দ্র শুধু দর্শকের সুখ্যাতিই লাভ করেননি, সেই সঙ্গে বাংলা রঙ্গমঞ্চেরও মর্যাদা এনে দিয়েছিলেন। যাঁরা থিয়েটারের নাম শুনে নাক সিঁট্‌কাতেন, তাঁরাও 'চৈতন্যলীলার' অভিনয় দেখে, উত্তরকালে রঙ্গমঞ্চের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

তাই অমৃতলাল বসু লিখেছিলেন—

'লিখিলা চৈতন্যলীলা, হীরক হইল লীলা
নাটাশালা হ'ল তীর্থ ভক্তমেলা থিয়েটার
বাজে শিঙা বাজে খোল, রঙ্গমঞ্চে হরিবোল
বিলাসী নতশির আঁখিজলে ভেসে যায়।'

'চৈতন্যলীলা' মঞ্চস্থ হওয়ার পর গিরিশচন্দ্র একদিকে যেমন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সান্নিধ্যলাভের পরম সৌভাগ্যলাভ করেছিলেন, অপর দিকে তেমনি বহু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী তার কাছে সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে আসতেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র এইসব বৈষ্ণব সাধুদের নিয়ে সময় সময় বড়ই বিব্রতবোধ করতেন। তিনি মদ্যপায়ী, নোটো। কণ্ঠীতিলক-ধারীরা তাঁর সঙ্গে পরিচয় করতে আসবে, বৈষ্ণব-তত্ত্ব নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করবে, আর তিনি যা নন, তেমনতর বিশেষণে তাঁকে ভূষিত করবে, এটা তিনি মোটেই সহ্য করতে পারছিলেন না। তা ছাড়া তত্ত্বকথা নিয়ে আলোচনা করবার মত তাঁর সময়ই বা কোথায়? বৈষ্ণব সাধুদের পাল্লায় পড়ে, ক্রমশই তিনি যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিলেন।

একদিন সকালে গিরিশচন্দ্র তাঁর বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের বাড়িতে বসে পড়াশোনা করছেন এমন সময় এক বৈষ্ণব সাধু এসে ঘরে ঢুকলেন। গিরিশচন্দ্র সসম্মানে তাঁকে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানালেন। বৈষ্ণব সাধুটি বললেন:

—আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এলাম। 'চৈতন্যলীলা' নাটক রচনা এবং অভিনয় করে, আপনি দেশের প্রভূত উপকার করেছেন।

—তা হবে।

—আপনি পরমভাগবত।

গিরিশচন্দ্র বৈষ্ণব সাধুর কথায় চমকে ওঠেন! বলেন:

—বলছেন কি! আমি ভাগবত?

—হ্যাঁ। তা না হলে কি আর আপনি এমন ভক্তিমূলক নাটক রচনা করতে পারেন?

—না না, ওসব আমি কিছুই নই। খেয়াল-খুশিতে নাটক রচনা করেছি। ভক্তি-টক্তি আমার মোটেই নেই—

বৈষ্ণব সাধু গিরিশচন্দ্রের কাটা ছেঁড়া জবাবের পরেও বলতে থাকেন ঃ

—আহা! আপনি বিনয়ের আধার। পরম বৈষ্ণব না হলে কি আর এমন নিরহঙ্কার হওয়া যায়?

সাধুর কথায় গিরিশচন্দ্র ক্রমশ বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কি করে সাধুকে ওঠান যায়, তারই ফিকির খুঁজতে থাকেন। তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে উঠে, আলমারীটা খোলেন। তারপর মদের বোতল ও গ্লাস বার করে, নিজের জায়গায় ফিরে এসে গ্লাসে মদ ঢাল্‌তে থাকেন। বৈষ্ণব সাধু জিজ্ঞাসা করেন ঃ

—আপনি কি অসুস্থ?

—না।

—তবে ওষুধ খাচ্ছেন যে?

—ওষুধ নয়। এটা মদ—

গিরিশচন্দ্রের কথায় বৈষ্ণব সাধু চমকে ওঠেন। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। গিরিশচন্দ্র বলেন ঃ

—এ কি? উঠছেন কেন? বসুন—বসুন। ভাগবতের ভগবদ্ভক্তিটা একবার পরীক্ষা করে যান।

বৈষ্ণব সাধু ততক্ষণে উত্তরীয় দিয়ে নাক চেপে ধরেছেন। আর মুখে বলছেন ঃ রাধে! রাধে।

—এ কি! আপনার ভাগবতের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস এক নিমিষেই উবে গেল।

গিরিশচন্দ্রের শেষ কথাগুলি বৈষ্ণব সাধুর কানে গিয়ে পৌঁছাল কি না কে জানে! কিন্তু গিরিশচন্দ্র লক্ষ্য করলেন, সাধুটি তখন ঘর ছেড়ে বল্‌তে বল্‌তে চলেছেন ঃ

—ছিঃ ছিঃ! এই লোক গৌরলীলা কীর্তন করছে। রাধে! রাধে!

আর ওদিকে তখন দাওয়াই কাজে লেগেছে দেখে, গিরিশচন্দ্র উচ্ছ্বসিত হাসিতে ঘর ভরিয়ে তুলেছেন। ইতিমধ্যে গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুরথকুমারী ঘরে ঢোকেন। গিরিশচন্দ্রকে আপন মনে হাসতে দেখে, হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করেন। গিরিশচন্দ্র সমস্ত ঘটনা বিবৃত করেন সুরথকুমারীর কাছে। সব শুনে সুরথকুমারী বলেন :

—আচ্ছা, তুমি কি বল তো ?

—কি আবার ! আমি যা তাই সাধুকে জানিয়ে দিলাম। ভাগবত হতে গেলে, আমাকে যে ভণ্ড হতে হতো !

স্বামীর কথা শুনে, শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে সারা দেহমন। কোন জবাব দিতে পারেন না সুরথকুমারী। শুধু সবিস্ময়ে চেয়ে থাকেন, তাঁর দিকে।

॥ লাঞ্ছনা ও লাভ ॥

১৯৩১ সাল। শ্রীযুক্ত প্রবোধ গুহ মহাশয়ের 'নাট্য নিকেতন' সে সময়ে নাট্যামোদীদের কাছে আসর জাঁকিয়ে বসেছে। এখানে তখন নিয়মিত অভিনয়-শিল্পীর তালিকায় আছেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূমেন রায়, মণি ঘোষ, নীহারবালা প্রভৃতি।

স্বর্গত নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সতীতীর্থ' নাটকের মহলায় শিল্পীরা তখন ব্যস্ত।

একদিন সন্ধ্যায় মহলা শুরু হবে এমন সময় এক বয়স্কা মহিলা ঘোমটা দিয়ে একটি বছর পনেরর মেয়ের হাত ধরে, সোজা প্রবোধবাবুর সামনে এসে হাজির হলেন। মহলার উদ্যোগ-পর্বেই বাধা পড়লো। মনে মনে সকলেই একটু বিরক্ত হলেন। বিশেষ করে দুর্গাবাবু।

প্রবোধবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি চাই ?

—আজ্ঞে, আমার এই মেয়েটিকে যদি আপনার থিয়েটারে ভর্তি

করে নেন।

মা ঘোমটার আড়াল থেকে আসার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে জানালেও, মেয়েটি কিন্তু তখন লজ্জায় ভেঙে পড়েছে। মায়ের হাত ধরে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মাটির দিকে চেয়ে। মায়ের কথায় প্রবোধবাবু আর শিল্পীদের দৃষ্টি ততক্ষণে নিবদ্ধ হয়েছে মেয়ের দিকে।

মেয়েটি কালো। তার ওপরে মোটা। সুন্দরী ত নয়ই—মোটামুটি সুশ্রী বলতেও যেন সকলের কুণ্ঠা। এরই মাঝে প্রবোধবাবু মেয়েটির মা-কে প্রশ্ন করেন—লেখাপড়া করেছে কিছু?

—আজ্ঞে হাঁ। সামান্য। কি যেন ইস্কুলটায় পড়েছিলি?

মায়ের প্রশ্নে মেয়েটি এবার ধীরে ধীরে মুখ তুলে ইস্কুলের নাম বলে। সকলের দৃষ্টি পড়ে এবার মুখের দিকে। সত্যিই মুখখানি বড় সুন্দর। সেই সঙ্গে চোখ দুটিও।

প্রবোধবাবু জিজ্ঞাসা করেন—অভিনয় করেছে কোথাও?

—আজ্ঞে না। শেফালিকা (পুতুল) একবার নিয়ে গিয়েছিল বড়বাবুর (নাট্যাচার্য শিশিরকুমার) কাছে। কিন্তু তাঁর ওখানে হোল না।

—গান জানে?

—হ্যাঁ। শিখছে।

এরই মাঝে দুর্গাবাবু বলে বসেন—কি হবে ওকে নিয়ে? দেখতে ভাল হলেও বা যা হোক চেষ্টা করা যেত। তার ওপরে যে রকম লাজুক! ওর মুখ দিয়ে কোন কালেই কথা বেরুবে না।

প্রবোধবাবু দুর্গাবাবুর কথায় সায় দিয়ে বলেন—তা যা বলেছেন।

মেয়ের মা বুঝলেন এখানে কোন আশা নেই। তাই বার কয়েক সবিনীত অনুরোধ জানালেন যাতে মেয়েটার একটা হিল্লে হয়। কিন্তু কোন উপরোধ-অনুরোধই কাজে এলো না। দুর্গাবাবু বিরক্তভাবেই সাফ্ জবাব দিলেন। সেই সঙ্গে প্রবোধবাবুও দুর্গাবাবুকে সমর্থন করলেন। মা মেয়ের হাত ধরে ব্যর্থতার বোঝা নিয়েই ফিরে যাচ্ছিলেন—

কিন্তু সহসা নীহারবালা যেন মেয়েটির চোখেমুখে অভিনয়ের সম্ভাবনা দেখতে পেলেন। প্রবোধবাবুকে বলে কয়ে মেয়েটিকে থিয়েটারে ভর্তি করিয়ে নিলেন। মাইনে ঠিক হোল—মাসিক ২৫৲ টাকা। এবং নীহারবালার চেস্টায় 'সতীতীর্থ' নাটকে মেয়েটি একটি ভূমিকায় অভিনয় করারও সুযোগ পেল।

কিন্তু গোল বাধলো দুর্গাবাবুকে নিয়ে। তাঁর অমতে মেয়েটিকে এইভাবে থিয়েটারের শিল্পী-গোষ্ঠীভুক্ত করায় তিনি মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন। শুধু তাই নয়—মেয়েটিকে স্টেজে মহলা দিতে দেওয়াতেও তিনি আপত্তি করলেন। অত্যন্ত খামখেয়ালী মানুষ ছিলেন দুর্গাবাবু। একবার 'না' বললে, তাঁকে 'হঁ্যা' করান খুবই কস্টকর ব্যাপার ছিল। তাই, তাঁর অমতে কেউ কিছু করতে সাহস করতো না। মেয়েটিকে নেওয়ার জন্যে শেষ পর্যন্ত যে এমন পরিস্থিতি হবে, তা নীহারবালাও ভাবতে পারেননি। তাই বাধ্য হয়ে নিজের সাজঘরে বসে, নীহারবালা মেয়েটিকে পৃথকভাবে মহলা দেওয়াতে লাগলেন।

কিন্তু গোল বাধলো—স্টেজ রিহার্সালের দিন। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ এবং মঞ্চের অপরাপর শিল্পীদের উপস্থিতিতে মেয়েটি ঘাব্ড়ে গেল। মুখ দিয়ে কথাই বেরোয় না! নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিরক্ত হন। সেই সঙ্গে দুর্গাবাবুর চোখেমুখেও বিরক্তি প্রকাশ পায়। শচীন্দ্রনাথ মেয়েটিকে সংলাপ বলানোর চেস্টা করেন কিন্তু মেয়েটি কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। কোন কথাই তার মুখ দিয়ে আর বেরোয় না। শচীন্দ্রনাথ রাগের মাথায় চড় মেরে বসেন মেয়েটিকে। ঘুরে পড়ে যায় মেয়েটি। কাঁদতে থাকে। থিয়েটারের অভিনেত্রী হওয়ার বাসনা ত্যাগ করে মেয়েটি চলে যেতে যায়। কিন্তু নীহারবালা সস্নেহে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মেয়েটিকে আটকে রাখেন।

'সতীতীর্থ' নাটকের প্রথম অভিনয়ে কিন্তু মেয়েটি সকলকে বিস্মিত করে দিল। প্রতিটি দৃশ্যে অভিনয় করে, দর্শকদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করলো মেয়েটি। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ ত অবাক। এই

কি সেই মেয়েটি? যে ফুল রিহার্সালে কথা বলতে না পারার জন্যে তাঁর কাছে চড় খেয়েছিল? সাজঘরে গিয়ে মেয়েটিকে অভিনন্দিত করলেন শচীন্দ্রনাথ। পরম শ্রদ্ধায় পায়ের ধুলো নিল মেয়েটি। আর দুর্গাদাস? যাঁর অমতে মেয়েটিকে নেওয়ার জন্যে তিনি বিরক্ত হয়েছিলেন, তিনি মেয়েটির জন্যে নিয়ে এলেন রসগোল্লার হাঁড়ি।

উত্তরকালে এই মেয়েটিই—সর্বজন স্নেহধন্যা রাণীবালা রূপে অভিনয়-জগতে খ্যাতি অর্জন করেছিল।

। গদা বিভ্রাট ॥

এক সময়ে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রায়ই সম্মিলিত অভিনয়ের (combination play) আয়োজন করা হোত। এই সম্মিলিত অভিনয়ের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সে সময়ের মিনার্ভা থিয়েটারের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীচণ্ডী বাঁড়ুয্যে মশাই। একবার পর পর দু'-দিনের জন্যে একটি সম্মিলিত অভিনয়ের আয়োজন করেন। প্রথম দিন 'চরিত্রহীন', দ্বিতীয় দিন 'কর্ণার্জুন'। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নরেশ মিত্র, শ্রীযুক্ত ছবি বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত কমল মিত্র, শ্রীমতী সরযূবালা প্রভৃতি।

'চরিত্রহীনে' কমল মিত্রের পার্ট ছিল অনঙ্গ ডাক্তার। আর 'কর্ণার্জুনে' দুর্যোধন। কমল মিত্র ইতিপূর্বে 'কর্ণার্জুন' নাটকে কোন ভূমিকাতেই অভিনয় করেননি। তাই চণ্ডীবাবু যখন তাঁকে 'দুর্যোধন' সাজাতে চান, তখন তিনি প্রথমটায় রাজী হননি। কিন্তু চণ্ডীবাবুর একান্ত অনুরোধে তাঁকে শেষ পর্যন্ত রাজী হতে হয়।

সম্মিলিত অভিনয়ের আয়োজন ব্যাপারে চণ্ডীবাবু ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তি। যেহেতু কমল মিত্র কখনও 'কর্ণার্জুন' নাটকে অভিনয় করেননি, সেই হেতু তাঁকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় নামিয়ে এই প্রথম

বলে বিজ্ঞাপন দিতে পারলে অতিরিক্ত আকর্ষণ হতে পারে, এই আশায় কমলবাবুকে দুর্যোধন সাজান।

কমলবাবুর হয়েছে তখন 'উপরোধে ঢেঁকি গেলা'। চণ্ডীবাবু দুর্যোধন সাজার ব্যাপারে কমলবাবুকে রাজী করানোর সময় মহলার আয়োজন করবেন বলে আশ্বাস দিলেও শেষ পর্যন্ত মহলার কোন আয়োজনই করেননি। মোটামুটি সংলাপগুলি মুখস্থ করে অভিনয়ের দিন কমলবাবু মঞ্চে উপস্থিত হলেন। ভয়-ভাবনার অন্ত নেই। শুধু সংলাপ আবৃত্তি করলেই ত' হবে না—সেই সঙ্গে কোথায় কি করণীয় সেগুলিও শিল্পীর জানা চাই। যাই হোক, যাঁরা এর আগে একাধিকবার কর্ণার্জুনে অভিনয় করেছেন তাঁদের কাছে সেগুলি জেনে নেবার চেষ্টা করলেন কমলবাবু। তারপর সজ্জাগৃহে গিয়ে সাজসজ্জা করে মঞ্চে অবতরণ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে উইংসের পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর বুকের ভেতরে কে যেন তখন হাতুড়ি পিটছে। ইতিমধ্যে চণ্ডীবাবু কমলবাবুর সামনে এসে তাঁকে উৎসাহিত করার জন্যে বলে বসলেন,—বাঃ! বেশ মানিয়েছে। ঠিক যেন original দুর্যোধন।

চণ্ডীবাবুর কথায় বিরক্তিতে মন ভরে ওঠে কমলবাবুর। চণ্ডীবাবুকে বলে বসেন—সরে যান মশাই সামনে থেকে। আমি বলে মরছি বুক টিপ্‌টিপ্ করে। আর আপনি কিনা এসেছেন এখন original দেখাতে। রিহার্সালের কোন ব্যবস্থা করলেন না। আপনার জন্যে আজ যদি আমি দর্শকদের কাছে হাস্যাস্পদ হই, তাহলে আপনাকেও আমার originality সহ্য করতে হবে। এই বলে রাখলাম।

যাই হোক, কমলবাবুর কথায় চণ্ডীবাবু ত' ভয়ে ভয়ে সেখান থেকে সরে গেলেন।

অভিনয় যথাসময়ে আরম্ভ হোল। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের দৃশ্যে যেখানে দুঃশাসন বস্ত্রহরণে উদ্যত হন এবং ভীম প্রতিশোধ স্পৃহায় উন্মত্ত হয়ে ওঠেন তার আগে কে যেন কমলবাবুকে জনান্তিকে বলে বসলো—এখানে দুর্যোধন গদাটা একবার ধরবে মনে রেখো। কিন্তু কোন্ কথার

পর গদাটা ধরতে হবে, তা আর তিনি বললেন না।

যাই হোক বস্ত্রহরণের দৃশ্য অভিনয় হতে আরম্ভ হলো। দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণে উদ্যত হলেন। ভীম—'নভ বরিষণ ধারা' ইত্যাদি সংলাপ বলে গদা নিয়ে আস্ফালন করে উঠলেন।

কমলবাবু ভাবলেন ভীম যখন গদা নিয়ে আস্ফালন করে উঠে দাঁড়িয়েছে তখন এই জায়গাতেই বোধহয় দুর্যোধনকে গদা নিয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। কমলবাবু গদাটি বাগিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে যাবেন, এমন সময় কর্ণবেশী অহীন্দ্র চৌধুরী তাঁকে বাধা দিলেন।

দৃশ্যটা অভিনয় শেষ হলে কমলবাবু অহীন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন—গদা তোলাটা কি এ-জায়গায় নয় দাদা? অহীন্দ্রবাবু জানালেন দুর্যোধনের গদা নিয়ে কোন business-ই নেই ঐ জায়গায়। অহীনবাবুর কাছে সব শুনে গদা নিয়ে আস্ফালন করতে শুরু করলেন কমলবাবু এবং খোঁজ করতে লাগলেন চণ্ডীবাবুর—যিনি মহলার প্রতি-শ্রুতি দিয়ে কোন আয়োজনই তার করেননি। কিন্তু চণ্ডীবাবু তখন থিয়েটার ছেড়ে চলে গেছেন।

॥ পাবলিক থিয়েটারের কারসাজি ॥

আন্দাজ ১৯২৭ সালে। আর্ট থিয়েটার লিমিটেড জলপাইগুড়িতে পাঁচদিন অভিনয় করার জন্য আহূত হয়েছেন। দ্বিতীয় দিন "সাজাহান" অভিনয় হওয়ার কথা। "সাজাহানের" ভূমিকালিপি ছিল এইরূপ: সাজাহান—নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, ঔরঙ্গজেব—রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, দারা—তিনকড়ি চক্রবর্তী, দিলদার—নরেশচন্দ্র মিত্র, মহম্মদ—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জাহানারা—কৃষ্ণভামিনী, নাদিরা—নিভাননী, পিয়ারা—নীহারবালা।

সে যুগে উল্লিখিত ভূমিকালিপি ছিল খুব আকর্ষণীয়। প্রথম দিন

"কর্ণার্জুন" নাটকের অভিনয় হয়। প্রথম দিনের ভূমিকালিপিতে অহীন্দ্রবাবু ছিলেন না। কথা ছিল, দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ যেদিন "সাজাহান" অভিনয় হবে, সেইদিন সকালে অহীনবাবু জলপাইগুড়ি পৌঁছুবেন। কিন্তু সহসা অহীনবাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যেতে পারলেন না। যথাসময়ে অহীনবাবু টেলিগ্রাম করে তাঁর অসুস্থতার সংবাদ জানিয়ে দিলেন আর্ট থিয়েটারের তদানীন্তন কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত প্রবোধ গুহ মশাইকে। প্রবোধবাবু তাঁর সহকারী শ্রীযুক্ত বিজয় মুখোপাধ্যায়কে ডেকে, অহীনবাবুর টেলিগ্রামের কথা জানালেন ; কিন্তু প্রবোধবাবুর চোখেমুখে এই দুর্ঘটনার জন্যে কোন উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠার চিহ্ন দেখা গেল না।

টেলিগ্রামের খবর শুনে, বিজয়বাবু তখন কিন্তু খুব ঘাবড়ে গেছেন। তাই প্রবোধবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন—তাহলে এখন কি করা যায়? সাজাহানের পরিবর্তে এখন কি অন্য কোন নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হবে?

—না। এই নাটকই অভিনয় হবে। এখন কাউকে কিছু বলো না! টিকিট বেচে যাও।

টিকিট বিক্রি হতে থাকলো, অচিরে house full-ও হয়ে গেল। অহীনবাবু যথাসময়ে না আসায়, কথাটা চাপাও থাকলো না! দলের সকলেই খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। প্রবোধবাবু কিন্তু নির্বিকার। ক্রমশ অভিনয় আরম্ভ হওয়ার সময় ঘনিয়ে এলো। মাত্র আর একঘণ্টা বাকী। প্রবোধবাবু সাজঘরে ঢুকে, প্রথমেই অনুরোধ করলেন তিনকড়ি-বাবুকে সাজাহানের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে। তিনকড়িবাবু কিন্তু কিছুতেই রাজী হলেন না। তখন প্রবোধবাবু ধরে বসলেন রাধিকানন্দবাবুকে।

প্রবোধবাবুর প্রস্তাবে রাধিকানন্দবাবু খুবই বিব্রতবোধ করলেন। বললেন—তা কি করে হয়? আমি ঔরঙ্গজেব করবো বলে আপনারা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন।

—বিজ্ঞাপন বজায থাকবে। তুমি ভাই সাজাহান আব ঔরঙ্গজেব দুটি ভূমিকাতেই অভিনয করো।

—কিন্তু শেষ দৃশ্যে যে সাজাহান ও ঔবঙ্গজেবেব একই সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছে।

—যা-হোক। শেষ দৃশ্য অভিনয হতে এখনো চাবঘণ্টা দেবি—ভেবেচিন্তে তখন যা হোক কবা যাবে।

থিযেটাবেব এই বকম দুর্ঘটনাব ব্যাপাবে প্রবোধবাবুব যেমন একাধাবে অসীম ধৈর্য এবং উপস্থিত বুদ্ধি ছিল, তেমনি অবিচলিত চিত্তে তিনি বিপদকে কাটিযে উঠতেন। থিযেটাব চালানোব ব্যাপাবে প্রবোধবাবু যেমন সুদক্ষ, তেমনি দুঃসাহসিক ব্যক্তি।

প্রবোধবাবুব বিপন্ন অবস্থাব কথা উপলব্ধি কবে শেষ পর্যন্ত বাধিকানন্দবাবু নিমবাজী হলেন এবং জানালেন—অভিনয আবম্ভ হওযাব পূর্বে দর্শকদেব কাছে পবিষ্কাবভাবে বর্তমান পবিস্থিতিব কথা জানাতে হবে।

বাধিকানন্দবাবুব প্রস্তাবমত প্রবোধবাবু তিনকড়িবাবুকে সঙ্গে নিযে অভিনয আবম্ভেব পূর্বে দর্শকদেব সামনে মঞ্চে এসে দাঁড়ালেন। তিনকড়িবাবু সবিনযে দর্শকদেব জানালেন, আমাদেব থিযেটাবেব কর্মকর্তা শ্রীযুক্ত প্রবোধ গুহ মহাশয আপনাদেব কাছে আমাদেব এক দুর্ঘটনাব কথা নিবেদন কববেন। প্রবোধবাবু টেলিগ্রাম হাতে নিযে সঙ্গে সঙ্গে বলতে আবম্ভ কবলেন—আজ সকালে অহীন্দ্রবাবুব আসাব কথা; কিন্তু তিনি সকালেব ট্রেনে না আসায, আমবা পববর্তী ট্রেনেব জন্যে গভীব উৎকণ্ঠাব মধ্যেই অপেক্ষা কবছিলাম। তাবপব টেলিগ্রামটি দেখিযে বললেন—এই কিছুক্ষণ আগে, টেলিগ্রাম পেলাম। অহীন্দ্রবাবু সহসা অসুস্থ হযে পড়েছেন। এমন সময টেলিগ্রামটা এসে পৌঁছুলো যে আব নাটকেব পবিবর্তন কবাও সম্ভব নয। কাজেই আমবা এক বিকল্প ব্যবস্থা কবেছি, অবশ্য আপনাবা যদি আমাদেব এ ব্যবস্থায সন্তুষ্টচিত্তে সম্মতিদান কবেন।

প্রবোধবাবুর কথায় দর্শকেবা একযোগে বলে উঠলেন—বলুন,

বলুন—কি বিকল্প ব্যবস্থা করেছেন।

প্রবোধবাবু বলতে থাকেন—আমরা এই ব্যবস্থা করবো মনস্থ করেছি যে, সুঅভিনেতা শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আপনাদের সম্মুখে যুগপৎ সাজাহান ও ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

একজন দর্শক প্রশ্ন করে বসলেন। —তা না হয় করলেন। কিন্তু শেষ দৃশ্যে যে সাজাহান আর ঔরঙ্গজেবের দেখা আছে সেখানে কি হবে ?

প্রবোধবাবু সদম্ভে ঘোষণা করলেন—সেখানে পাবলিক থিয়েটারের কারসাজি আমরা দেখাব।

প্রবোধবাবুর কথায় দর্শকেরা সম্মতি জানালেন। মনে করলেন কি না কি কারসাজি দেখাই যাক।

যাই হোক, অভিনয় শুরু হোল। রাধিকানন্দবাবু যোগ্যতার সঙ্গে অভিনয় করতে লাগলেন। সকলেই উন্মুখ শেষ দৃশ্যের জন্যে। ইতিমধ্যে প্রবোধবাবু তাঁর সহকারী বিজয়বাবুকে ঔরঙ্গজেব সাজিয়েছেন। বিজয়বাবুর উচ্চতা এবং চেহারার সঙ্গে রাধিকানন্দবাবুর সাদৃশ্য ছিল। প্রবোধবাবু বিজয়বাবুকে নির্দেশ দিলেন দর্শকদের দিকে যতটা সম্ভব পিছন ফিরে সংলাপ বলবে। বিজয়বাবু প্রবোধবাবুর নির্দেশমত অভিনয় করলেন। যবনিকা পড়লো। তখন দর্শকদের ভিড় সাজঘরে। বিজয়বাবু ততক্ষণ মেক্-আপ তুলে ফেলেছেন এবং সোজা গিয়ে বসেছেন বুকিং অফিসে। আর রাধিকানন্দবাবু তখন সাজাহানের মেক্ আপ তুলছেন। আর দুর্যোগ কাটিয়ে ততক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, প্রবোধবাবু তৃপ্তির হাসি হাসছিলেন।

॥ রঙ্গজগতের কাপ্তেন ॥

অভিনেত্রী মনোরমা। অভিনয় জগতে কাপ্তেন মোনা নামে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন। অভিনেত্রীর নামের সঙ্গে কাপ্তেন শব্দটা

শুধু বেমানান নয়, একটু যেন শালীনতার অভাব বলেও মনে হয়। কিন্তু ঐ শব্দটা নামের আগে যুক্ত হওয়ার অবশ্য কারণও ছিল। যৌবনে অভিনেত্রী মনোরমা যেমন প্রচুর অর্থের ও সম্পদের মালিক হয়েছিলেন, তেমনি সে অর্থ তিনি রীতিমত কাপ্তেনী করেই দু'হাতে উড়িয়েছিলেন। তাই নাম হয়েছিল—কাপ্তেন মোনা।

কাপ্তেনীর বহরও ছিল তেমনি, যা আজকের দিনে কল্পনাও করা যায় না। মনোরমার শখ হোল, ঘুড়ি ওড়াবার। ঘুড়ির সঙ্গে দশ টাকার নোট বেঁধে ঘুড়ি ওড়াতে লাগলেন। এ ছাড়া বিলাস-ব্যসনের ব্যয়ও ছিল প্রচুর। জুড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে রেড রোডে হাওয়া খাওয়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বছরে একবার করে বাইরে চেঞ্জে যাওয়ার খরচ ছিল মোটা রকমের। দাসদাসী, রিজার্ভ ট্রেন, বড় হোটেলে ওঠা ইত্যাদি ব্যাপারে মুঠো মুঠো টাকা তিনি ব্যয় করেছেন। দশ টাকার একটা নোট, তাঁর কাছে ছিল সেদিন একটা পয়সার সামিল। অর্থের প্রাচুর্য এমনি করেই সেদিন তাঁর জীবনের বহু অনর্থ ঘটিয়েছিল। তার মধ্যে ঘোড়দৌড়ের নেশাটিও অন্যতম। অভিনেত্রী মনোরমা এইভাবে চরম কাপ্তেনী করে, রঙ্গজগতে কাপ্তেন মোনারূপে পরম পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

এ যুগের নাট্যরসিকদের কাছে কাপ্তেন মোনার বিশেষ কোন পরিচয়-পরিচিতি ছিল না। কিন্তু সে যুগে কাপ্তেন মোনা ছিলেন নামকরা অভিনেত্রী। নাচতে পারতেন, গাইতে পারতেন, আর সেই সঙ্গে সব-রকমের চরিত্রে রূপদান করতে পারতেন।

মনোরমার অভিনেত্রী-জীবন শুরু হয়েছিল কিশোরী বয়সে। অভিনেত্রী জীবনের হাতেখড়ি হয়েছিল, নটগুরু গিরিশচন্দ্রের আর অর্ধেন্দুশেখরের কাছে। তখন ছোট ছেলে বা মেয়ের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করতেন। ক্রমে বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম চরিত্রে তিনি রূপদান করতে থাকেন।

১৯০০ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করেন। সে সময়ে

মিনার্ভা থিয়েটারের মালিক ছিলেন শ্রীপুরের জমিদার নরেন্দ্রনাথ সরকার। এই সময় থেকেই মনোরমার ভাগ্যের মোড় ফিরতে থাকে। ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হয়, তখন নানাদিক থেকেই অর্থাগম শুরু হতে থাকে। তাই সে যুগের প্রায় প্রতিটি ছায়াছবিতেই তার আত্মপ্রকাশ এবং অর্থপ্রাপ্তি ঘটেছে। এমন কি সুদূর লাহোর থেকেও তাঁর ডাক এসেছিল হিন্দী ছবিতে অভিনয় করার জন্যে। কিন্তু অর্থের আতিশয্যেই হোক, আর খাম-খেয়ালীপনার জন্যেই হোক তিনি মধ্যে মধ্যে রঙ্গজগৎ থেকে আত্মগোপন করে থাকতেন।

শৈশব-কৈশোরে যিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে কাটিয়েছেন, যৌবনে তিনি অর্থের আতিশয্যে অতীত দিনের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। আবার শেষ জীবনে কঠোর দারিদ্র্যের সঙ্গে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। সে সংগ্রামী জীবনের অবসান ঘটেছে, কিছুদিন হোল।

দীর্ঘজীবন লাভ করেছিলেন কাপ্তেন মোনা। আর এই দীর্ঘজীবনের মধ্যে যতদিন তিনি সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়েছেন, তার চেয়ে বেশিদিন তাঁকে দুঃখে-কষ্টে কাটাতে হয়েছে। ইদানাং মধ্যে মধ্যে সে-যুগের কোন কোন নাটকে—যেমন, প্রফুল্লতে জগমণি, রঘুবীরে সখার মা ইত্যাদি ভূমিকায় তিনি শৌখীন সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভিনয় করে কিছু কিছু উপার্জন করতেন।

মৃত্যুর মাস পাঁচেক আগে এই রকম এক শৌখীন সম্প্রদায়ের সঙ্গে অভিনয় করতে এসেছেন স্টার থিয়েটারে। আমায় দেখে, মনোরমা এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন। বললাম—আপনারা বয়েসে বড়, দেখা হলেই এই যে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন, এতে বড সঙ্কোচবোধ করি।

—তা ত' করেন। কিন্তু আমি যে এতে তৃপ্তি পাই। জানেন, মহারাজ নন্দকুমার লক্ষ বামুনের পায়ের ধুলো সংগ্রহ করেছিলেন। আমি ত' আজ পর্যন্ত তার সিকির সিকি ভাল লোকেরও পায়ের ধুলো নিতে পারলাম না।

—আছেন কেমন ?

—আছি এখনও। মরণটা ত' নিজের হাতে নয়, তাই থাকা।

—এ্যামেচারের কাজকর্ম কেমন ?

—খুব কম। মধ্যে মধ্যে যা আসে তাতে পেটের ভাত, পরণের কাপড়ও জোটে না।

—আপনার অদৃষ্ট! নইলে এ কষ্ট ত' আজ আপনার পাওয়ার কথা নয়।

—না দাদা, আমারই পাওয়ার কথা। যা আমাব পাওনা তাই আমি পাচ্ছি। এর জন্যে অবশ্য আমার কোন দুঃখু নেই। বরং এক এক সময় ভাবি, এ-অবস্থা না হলে হয়ত ঠাকুরকে ডাকতে পারতাম না। আশীর্বাদ করুন, তাঁকে ডাকতে ডাকতে এবার যেন যেতে পারি।

মনোরমার কথাগুলো বলার মধ্যে সেদিন কোন ক্ষোভ ফুটে ওঠেনি, বরং পরম তৃপ্তির সঙ্গেই তিনি কথাগুলো বলেছিলেন।

প্রথম জীবনের কাপ্তেন মোনা অনেকদিন আগেই মরেছিল, আর সেদিন যে ইহলোক ত্যাগ করলো—সেই ছিল মনোরমা।

॥ শাসন ও সাফল্য ॥

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের গোড়ার যুগে অভিনেত্রী তিনকড়ি তাঁর অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সে-যুগে একাধিক নাটকের দুরূহ চরিত্রে তিনি রূপদান করে যশস্বিনী হয়েছিলেন। যেমন গিরিশ-চন্দ্রের 'জনা' নাটকে জনার চরিত্র-চিত্রণে তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। যার ফলে, পরবর্তীকালে তারাসুন্দরীর মত প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীও জনার ভূমিকায় অভিনয় করতে ইতস্তত করেছিলেন।

তিনকড়ি ছিলেন অশিক্ষিতা নারী। কিন্তু নটগুরু গিরিশচন্দ্রের

শিক্ষাধীনে, পরবর্তীকালে তিনি 'ম্যাকবেথ' নাটকে লেডী ম্যাকবেথের মত কঠিন ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করে দর্শকদের বিস্ময়াভিভূত করেছিলেন। এ ছাড়া 'আবুহোসেন' নাটকে দাই, 'কেরামতী বাঈ' নাটকে নাম-ভূমিকায় সার্থক অভিনয় করেন।

তিনকড়ির অভিনয়ের ওপর সে-যুগের দর্শকদের যথেষ্ট আস্থা ছিল।

অত্যন্ত এক কুৎসিত পল্লীর মাঝে জন্ম নিয়েছিলেন তিনকড়ি। আর সে পল্লীর পরিবেশটা ছিল ততোধিক জঘন্য। বার বছরের কিশোরী। নাচে, গান গায়। চেহারাটিও সুশ্রী। যেন গোবরে পদ্মফুল। মেয়ের দিকে চেয়ে, তিনকড়ির মা মনে মনে আশা-আকাঙ্ক্ষার জাল বোনেন। আর ক'টা বছর। তারপরেই ত' মেয়ে সাবালক হয়ে উঠবে। মায়ের দুঃখ ঘুচবে।

মায়ের সঙ্গে মেয়ে গিয়েছে ন্যাশনাল থিয়েটারে 'রাবণ বধ' নাটকের অভিনয় দেখতে। ঐটুকু মেয়ে নাটকের অভিনয় দেখে অভিভূত হয়েছে। প্রলুব্ধ হয়েছে, নাট্যশালার সংস্পর্শে আসার জন্যে। মায়ের আঁচল ধরে, বায়না ধরেছে—আমায় থিয়েটারে ভর্তি করে দাও না মা। আমি ওদের মত নাচবো, গাইবো।

মেয়ের বায়না শুনে মা ভাবে, তা মন্দ কি! থিয়েটারে ভর্তি করতে পারলে, দু-পয়সা ঘরেও আসবে আর সেই সঙ্গে নাচ-গানটাও ভালভাবে শিখতে পারবে।

মেয়েকে থিয়েটারে ভর্তি করার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন তিনকড়ির মা। বেশ ক'বছর কেটে গেল। মায়ের চেষ্টা বিফল হোল। শেষে ১৮৮৭ সালে স্টার থিয়েটারে 'রূপসনাতন' নাটকে একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ এলো তিনকড়ির জীবনে। প্রথম রাত্রের অভিনয়ের পর পারিশ্রমিক বাবদ একটি টাকা জুটলো তিনকড়ির ভাগ্যে। টাকা ত' নয়,—ওটা মোহর। তার জীবনের প্রথম উপার্জিত অর্থ। টাকাটি বার বার কপালে ঠেকিয়ে সযতনে তুলে রাখেন তিনকড়ি। শোনা যায়—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই টাকাটি নাকি

তাঁর বাক্সে তোলা ছিল।

এর কিছুকাল পরে তিনকড়ি বীণা থিয়েটারে যোগদান করেন। মাইনে মাসিক কুড়ি টাকা। টাকার অঙ্কটা যাই হোক না কেন, অভিনয়ের সুযোগ এলো তিনকড়ির জীবনে। 'মীরাবাঈ' নাটকে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ পেলেন।

কিশোরী তিনকড়ি এখন ভরাযৌবনা। বীণা থিয়েটারের 'মীরাবাঈ' নাটকের অভিনয়ে তিনকড়ি মুগ্ধ করেছেন দর্শকসমাজকে। সঙ্গীতে স্বপ্নজাল বচনা করেছেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মায়েব চোখেও আশার আলো দেখা দিয়েছে।

মায়েব চোখে যে আশার আলো ছিল এতদিন সুদূরে—একদিন শুভসন্ধ্যায় তা নিকটবর্তী হোল। তিনকড়িদের ঘরে এলো দুটি অবস্থাপন্ন সুদর্শন যুবক। তাদের মহা-সমাদরে অভ্যর্থনা জানান তিনকড়ির মা।

—আপনার মেয়ের অভিনয় দেখে আমরা মুগ্ধ। তাই, এলাম তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে।

বেশ, বেশ। বসুন। তিনকড়ি থিয়েটারে গেছে। রিহার্সাল দিতে।

—কখন আসবে?

—আসার ত' কিছু ঠিক নেই। তবে রিহার্সাল থ'কলে আসতে একটু রাতই হয়।

—থিয়েটারের খাটুনী ত' কম নয়।

খাটুনী আছে বৈকি! কিন্তু উপায় কি? রোজগার ত' করতেই হবে।

—তা ত' বটেই। শুনেছি, থিয়েটারের মাইনে ত' বেশি নয়।

—না, না। মেয়ের শখ তাই থিয়েটারে দেওয়া।

—থিয়েটারের কাজ ছাড়িয়ে দিন, আমরা প্রতি মাসে দুশো করে টাকা দেব।

যুবকদের প্রস্তাব শুনে, তিনকড়ির মায়ের চোখমুখ খুশীতে ভরে যায়। এই ত' চেয়েছিল তিনকড়ির মা। কোথায় মাস মাইনে মাত্র কুড়ি টাকা। আর কোথায় দুশো টাকা। তিনকড়ির মায়ের সম্মতির অপেক্ষা না রেখেই, যুবকদের মধ্যে একজন সর্ত আরোপ করে বসে :

—আপনার মেয়েকে কিন্তু থিয়েটার ছাড়তে হবে।

—নিশ্চয়ই ছাড়বে। তোমরা মাস গেলে এতগুলো করে যখন টাকা দেবে—

মায়ের সম্মতি পেয়ে সেদিনের মত যুবকদ্বয় চলে যায়। আর সেই সঙ্গে জানায়—পরের দিন সন্ধ্যায় তারা আবার আসবে।

তিনকড়ি থিয়েটারের রিহার্সাল থেকে ফিরে এসে, মায়ের মুখ থেকে সব কথা শুনলেন। সমস্ত দেহমন ঘৃণায় আর বিরক্তিতে ভরে উঠলো। মাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন তিনকড়ি—থিয়েটার ছেড়ে দুশো টাকার বিনিময়ে মানুষের মনোরঞ্জন করতে পারবেন না তিনি।

মায়ের মাথায় দপ্ করে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। বচসা চলে। পরের দিন সন্ধ্যায় যাতে তিনকড়ি থিয়েটারে যেতে না পারে তার জন্যে বাড়ির আর পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে তিনকড়ির মা। পরের দিন শুধু তিনকড়ির মা-ই নয়—সেই সঙ্গে বাড়ির মেয়েরাও চোখে চোখে রাখে তিনকড়িকে। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসে, আর সেই সঙ্গে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে তিনকড়ি যথারীতি থিয়েটারে পালিয়ে যান।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরেই তিনকড়ির ঘরে এসে হাজির হলেন আগের দিনের বাবু দুটি। কিন্তু তিনকড়িকে না পেয়ে তিনকড়ির মাকে বেশ গোটাকতক কড়া কড়া কথা শুনিয়ে চলে গেল তারা।

মেয়ের জন্যে না-হোক কতকগুলো কথা শোনবার মেয়ে তিনকড়ির মা নন। থিয়েটার থেকে মেয়ে ফিরে এলে, শুধু যে গালাগালি দিয়েই নিরস্ত হয়েছিল তিনকড়ির মা, তা নয়—। সেই সঙ্গে বেশ ঘা কতক বসিয়ে দিয়েছিল মেয়ের অঙ্গে। যার ফলে, গায়ের ব্যথায় ও প্রবল

জ্বরে, বেহুঁস অবস্থায় ক'দিন কাটাতে হয়েছিল তিনকড়িকে।

সেদিন যদি মায়ের শাসন-বারণকে উপেক্ষা করতে না পারতেন তিনকড়ি—তাহলে হয়ত ঐ দিনই তাঁর জীবনে নেমে আসতো শিল্পী-জীবনের যবনিকা।

॥ সসম্মানে পিট্‌টান্‌ ॥

নটগুরু গিরিশচন্দ্রের পুত্র অভিনেতা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ অর্থাৎ দানী-বাবুব নামটি রঙ্গজগতের লোকেদের কাছে আজো স্মরণীয় হয়ে আছে। সামান্য কিছু বাংলা লেখাপড়া আর সেই সঙ্গে কোনরকমে ইংরাজীতে নিজের নামটি সই করা ছাড়া, পুঁথিগত কোন বিদ্যাই তিনি অর্জন করেননি। কিন্তু, তাঁর পিতার কাছে যে অভিনয়বিদ্যা তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন, উত্তরকালে সেই বিদ্যার প্রভাবে তিনি লোকপ্রিয় ও সম্মানিত হয়েছিলেন। তাঁর যেমন অভিনেতার উপযুক্ত চেহারা আর ভরাট গলা ছিল, তেমনি অভিনেতার উপযুক্ত ভাবভঙ্গিমা প্রকাশের ক্ষমতাও ছিল। বিশেষ করে যে সকল ভূমিকা তিনি তাঁর পিতার কাছে শিক্ষা করেছিলেন, সেইসব ভূমিকা অভিনয়ে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর আগে ও পরে সেইসব ভূমিকায় অন্যান্য অভিনেতারা কেউ কেউ রূপদান করে থাকলেও দানীবাবুর তুলনায় তা নিষ্প্রভ। তাই আজও সেইসব নাটক যদি কখনও কোথাও অভিনয় হয়, তাহলে সর্বাগ্রে দানী-বাবুব কথা মনে পড়ে।

মনোমোহন থিয়েটারের অবলুপ্তির পর দানীবাবু বেশ কিছুদিন রঙ্গালয়ের সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। এই সময়ে স্টার থিয়েটারে, আর্ট থিয়েটার লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্ট থিয়েটারের অধ্যক্ষ ছিলেন নট ও নাট্যকার অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অপরেশ-চন্দ্রের অধ্যক্ষতায় আর্ট থিয়েটার অতি অল্পকালের মধ্যেই অত্যন্ত জন-

প্রিয়তা অর্জন করে। আর সেই সঙ্গে অপরেশচন্দ্রের নাট্য-শিক্ষাদান-নৈপুণ্যে বহু নূতন নূতন নট-নটীর আবির্ভাব হয়।

সে সময়ে পেশাদারী থিয়েটারগুলিতে সপ্তাহে চারদিন করে অভিনয় হোত। অপরেশচন্দ্র মধ্য সাপ্তাহিক আকর্ষণরূপে পুরানো নাটকগুলি অভিনয়ের মনস্থ করেন এবং আর্ট থিয়েটারের ডিরেক্টারদের কাছে দানী-বাবুকে নিয়ে আসার প্রস্তাব করেন। কিন্তু বেশি টাকা মাইনে দিয়ে দানীবাবুকে নিয়ে আসার ব্যাপারে ডিরেক্টারদের মধ্যে অনেকেই আপত্তি জানান। অপরেশচন্দ্র শেষ পর্যন্ত ডিরেক্টারদের যুক্তিতর্কের দ্বারা সম্মত করান এবং মাসিক এক হাজার টাকা মাহিনায় আর্ট থিয়েটারে দানীবাবুকে নিয়ে আসেন। দানীবাবু আসার পর সপ্তাহে একদিন করে দ্বিজেন্দ্রলালের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অভিনয়-ব্যবস্থা করা হয়। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের ভূমিকালিপিতে ছিলেন : চাণক্য—দানীবাবু, সেলুকস—অহীন্দ্র চৌধুরী, চন্দ্রগুপ্ত—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এন্টিগোনস —ইন্দু মুখোপাধ্যায়, কাত্যায়ন—নরেশ মিত্র, নন্দ—দুর্গাপ্রসন্ন বসু, বাচাল—সন্তোষ দাস (ভুনো)। 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের অভিনয়ে দুই হাজার—দুই হাজার তিনশত টাকা পর্যন্ত এই সময় বিক্রি হোত। কাজেই অপরেশচন্দ্রের নতুন ব্যবস্থায় আর্ট থিয়েটারের ডিরেক্টাররা শেষ পর্যন্ত দানীবাবুকে নিয়ে আসার ব্যাপারে সকলেই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

একদিন জনৈক রাশিয়ান নাট্য-রসিক চন্দ্রগুপ্তের অভিনয় দেখতে আর্ট থিয়েটারে আসেন। অভিনয় দর্শনে তিনি মুগ্ধ হন। বিশেষ করে চাণক্যের অভিনয়ে তিনি এতই প্রীত হন যে, অঙ্কের বিরতির মাঝে অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে জানান যে, তিনি দানীবাবুর সঙ্গে পরিচিত হতে চান। অপরেশচন্দ্র তাঁকে অভিনয়ের শেষে তাঁর কক্ষে আসতে আমন্ত্রণ জানান এবং দানীবাবুকে সাজঘরে খবর পাঠান তিনি যেন অভিনয়ের শেষে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন।

অভিনয়ের শেষে রাশিয়ান ভদ্রলোকটি দানীবাবুর সঙ্গে পরিচয় করার বাসনায় অপরেশচন্দ্রের ঘরে আসেন এবং এ-কথা সে-কথার পর

জিজ্ঞাসা করেন দানীবাবুর মত বড় অভিনেতা থিয়েটারের কাছ থেকে মাসে কত টাকা মাইনে পান।

উত্তরে অপরেশচন্দ্র জানান—মাসে এক হাজার টাকা।

—মাত্র! আমাদের দেশে এই রকম অভিনেতা এক রাত্রি অভিনয়ের জন্য কমপক্ষে একশো পাউণ্ড পেয়ে থাকেন।

তারপর থিয়েটারের নানা বিষয় নিয়ে অপরেশচন্দ্রের সঙ্গে বিদেশী ভদ্রলোকের আলাপ-আলোচনা চল্‌তে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে যাওয়ার পর অপরেশচন্দ্র গ্রীনরুমে লোক পাঠান দানীবাবুকে ডেকে আনার জন্যে, কিন্তু তার অনেক আগেই দানীবাবু সাজ-পোশাক ছেড়ে, মেক্‌-আপ তুলে বাড়ি চলে গেছেন। লোকটি গ্রীনরুম থেকে ফিরে এসে, দানীবাবুর চলে যাওয়ার কথা জানান। রাশিয়ান ভদ্রলোক হতাশ হয়ে চলে গেলেন। আর সেই সঙ্গে দানীবাবুর ব্যবহারে অপরেশচন্দ্র মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন।

পরের দিন দানীবাবু থিয়েটারে এলে, অপরেশচন্দ্র তাঁর কাছে আগের দিন রাত্রে দেখা না করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন।

দানীবাবু বললেন—আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না মশাই। কাজের ব্যাপারে আপনি ডাকলে ঠিকই দেখা করতাম। কিন্তু ও সাহেবসুবোদের নাম শুনলে বড় ভয় পাই।

সাহেবসুবোদের কথা আপনি জানলেন কার কাছে? আমি ত সে সব কথা আপনাকে জানাইনি।

—আপনি না জানালে কি হবে! থিয়েটার বলে কথা, এখানে দেওয়ালেরও যে কান আছে।

—কিন্তু সাহেবের সঙ্গে দেখা করতেই বা আপনার এত ভয় বা কুণ্ঠা কেন? জানেন? আপনার অভিনয় দেখে সাহেব কত সুখ্যাতি করে গেল—

—ঐ পর্যন্তই ভাল। দূর থেকে অভিনয় দেখে, যা বলে গেল, কাছে থেকে দেখে কি আর তাই বল্‌তো? আমি মশাই মুখ্যু মানুষ,

ইংরাজীতে কথা বলতে পারতাম না। সাহেবটার ধারণা হোত, এ দেশের সব অভিনেতারই বুঝি বিদ্যের দৌড় আমার মত। পাছে জাতের অসম্মান হয়, তাই সসম্মানে নিজেই পিট্‌টান্‌ দিয়েছিলাম।

॥ অবিস্মরণীয় অভিনয় ॥

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কেবলমাত্র সে-যুগের একজন নামকরা অভিনেতাই ছিলেন না। তিনি ছিলেন বহু গুণের অধিকারী। একাধারে নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতারূপে তিনি যেমন দর্শকদের আস্থাভাজন ছিলেন, তেমনি অন্যদিকে দর্শকদের মধ্যে উপহার দেওয়ার ব্যবস্থা, প্রাচীরপত্র ও হ্যাণ্ডবিলে নিত্য-নতুন ভাষার চটক, সাধারণ মানুষকে থিয়েটারের প্রতি অনুরাগী করে তোলার জন্যে 'রঙ্গালয়', 'নাট্যমন্দির' পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি যে-সব কাজ তিনি করে গেছেন, তার দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, থিয়েটারকে শুধু তিনি সেই দুর্দিনে বাঁচিয়েই রাখতে চাননি, সেই সঙ্গে জনপ্রিয়ও করে তুলতে চেয়েছিলেন।

আর এই সব কাজের জন্যে তাঁকে প্রচুর আর্থিক ক্ষতি সহ্য করতে হয়েছে। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রতিকূল অবস্থায় প্রচুর লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা তাঁকে নীরবে সইতে হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অবিচলিত চিত্তে তিনি তাঁর কর্তব্য করে গেছেন।

অমরেন্দ্রনাথ ২৭ বছর বয়সে রঙ্গালয়ের সংস্পর্শে আসেন এবং ৪০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। মাত্র ১৩ বছর তিনি রঙ্গালয়েব সেবা করে গেছেন। এই অল্পকালের মধ্যে অভিনেতা, পরিচালক ও নাট্যকাররূপে তিনি যেমন প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, তেমনি রঙ্গালয়ের উন্নতির জন্য তাঁর সর্বপ্রকার প্রযত্ন নাট্যশালার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

অমরেন্দ্রনাথের সেদিনের সেই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার ফলেই যে

আজকের নাট্যশালা এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি করা হবে না।

শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে অমরেন্দ্রনাথের অপরিসীম নিষ্ঠা ছিল। কেবলমাত্র শিল্পের প্রতিই তাঁর দরদ ছিল না। সেই সঙ্গে শিল্পকে যাঁরা বাঁচিয়ে রাখেন, অর্থাৎ দর্শক, তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

১৯১৫ সালেব ৪ঠা ডিসেম্বর স্টার থিয়েটারে তিনি ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সওদাগর' নাটক মঞ্চস্থ করেন।

এই নাটকটি মঞ্চস্থ করার কিছুদিন আগে থেকেই তিনি শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। অধিক রাত্রি পর্যন্ত মহলা দেওয়ার কাজে তাঁর শরীর আরো ভেঙে পড়ে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেরা তাঁকে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে অনুরোধ করেন। কিন্তু সকলের সব অনুরোধ উপেক্ষা করেই তিনি যথারীতি কাজ করতে থাকেন। ভাঙা শরীরে শুধু নাটক পরিচালনার দায়িত্বই তিনি বহন করেননি, সেই সঙ্গে 'সওদাগর' নাটকের প্রধান ভূমিকায় অবতরণ করেন।

যাই হোক, ৪ঠা ডিসেম্বর নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার পর তাঁর শরীব আরও ভেঙে পড়ে।

১১ই ও ১২ই ডিসেম্বরের প্রাচীরপত্র ও হ্যাণ্ডবিলে ঘোষণা করা হয় যে ১১ই 'সওদাগর' নাটকে অমরেন্দ্রনাথ কুনীরকের ভূমিকায় এবং ১২ ডিসেম্বর 'সাজাহান' নাটকে ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। কিন্তু ১১ই তারিখে তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হলেন এবং সেই সঙ্গে রক্তবমি করতে লাগলেন। কিন্তু ঐ অবস্থাতেও তিনি বাড়ি গেলেন না। থিয়েটারেই শুয়ে রইলেন। অমরেন্দ্রনাথের পরিবর্তে তাঁর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন—কুঞ্জ চক্রবর্তী মশাই। কিন্তু দর্শকেরা কুঞ্জবাবু মঞ্চাবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই হট্টগোল শুরু করে দিলেন। দর্শকদের কিছুতেই বুঝিয়ে প্রতিনিবৃত্ত করা গেল না যে, সত্যিই অমরেন্দ্রবাবু অসুস্থ।

অমরেন্দ্রনাথ পূর্ব থেকেই আঁচ করেছিলেন যে, দর্শকেরা গোলমাল করতে পারে। আর সেই কারণেই তিনি অসুস্থ শরীর নিয়ে থিয়েটারে

পড়েছিলেন। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত অমরেন্দ্রনাথ শয্যা ছেড়ে, মঞ্চে এসে দাঁড়িয়ে তাঁর অসুস্থতার কথা দর্শকদের জানালেন—দর্শকদের মনস্তুষ্টির জন্যে তিনি একটি অঙ্ক অভিনয় করবেন। দর্শকেরা অমরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে সম্মত হলেন। অমরেন্দ্রনাথ অতিকষ্টে একটি মাত্র অভিনয় করে শয্যা নিলেন।

পরের দিন ১২ই ডিসেম্বর 'সাজাহান' নাটকে তাঁকে সকলেই অভিনয় করতে বারণ করলেন। কিন্তু আগের দিন রাত্রের ঐ ঘটনার পর তিনি আর কারুর কথা শুনলেন না। ঔরঙ্গজেবের 'মেক-আপ' নিয়ে সাজপোশাক পরে, মঞ্চে এসে দর্শকদের অভিবাদন জানালেন। প্রথম অঙ্ক কোন রকমে অভিনয় করলেন। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের অভিনয় আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন রক্তবমি শুরু হোল যে, তিনি আর উঠতে পারলেন না। দর্শক-দরদী শিল্পীর ঔরঙ্গজেবের অসমাপ্ত অভিনয়ই —শেষ অভিনয়।

এর পঁচিশ দিন পরে অর্থাৎ ১৯১৬ সালের ৬ই জানুয়ারী তারিখে অমরেন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন।

মৃত্যুর দিন-দুই আগে থেকেই তাঁর অবস্থা খারাপ হয়। আত্মীয়-বন্ধুরা উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় অমরেন্দ্রনাথের বাড়ির নীচের তলার বাইরের ঘরে অপেক্ষা করতে থাকেন। সহসা মৃত্যুর দিন সকালে বাড়ির সদর দরজার দিক থেকে সমবেত কণ্ঠের কান্না ভেসে এলো। সকলেই মনে করলেন অমরেন্দ্রনাথের জীবনদীপ বুঝি নির্বাপিত হয়েছে। কিন্তু যখন বোঝা গেল, কান্নার রোল ওপরতলা থেকে আসছে না, তখন সকলে সদরের দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখা গেল, কতকগুলি অন্ধ ও পঙ্গু ভিখিরীর দল কাঁদছে আর বলছে, আমাদের কি গতি হবে? আমরা যে বাবুর দয়ায় বেঁচে আছি। এরপর কে আমাদের খেতে দেবে?

তাদের কথা শুনে, সকলে বিস্মিত! স্তম্ভিত!

অমরেন্দ্রনাথের জীবনের যবনিকা নেমে আসার কিছুক্ষণ আগে জানা গেল, মঞ্চের বাইরে তিনি কি মহৎ অভিনয় করে চলেছিলেন।

॥ একটি অবিস্মরণীয় শিক্ষাদান ॥

গিরিশচন্দ্রের 'জনা' ১৩০০ সালের ৯ই পৌষ, বড়দিন উপলক্ষে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

'জনা' নাটকে যুগ্ম-শিক্ষকরূপে গিরিশচন্দ্র ও নটচূড়ামণি অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি নট-নটীদের শিক্ষাদান করেন।

প্রথম অভিনয়-রজনীতে 'জনা' নাটকের ভূমিকালিপি ছিল এইরূপ : জনা—তিনকড়ি, প্রবীর—দানীবাবু, বিদূষক—অর্ধেন্দুশেখর, নীলধ্বজ—হরিভূষণ, কৃষ্ণ—শরৎ বন্দ্যোঃ (রাণুবাবু), মহাদেব ও ভীম—দাশুবাবু, অর্জুন—চুনীলাল দেব, বৃষকেতু—কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, মদনমঞ্জরী—ভূষণকুমারী, নায়িকা—ভবতারিণী, ব্রাহ্মণী ও গঙ্গা—হরিমতী (গুল্‌ফম্)। নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার আগে নামভূমিকায় প্রমদাসুন্দরীকে নামানো হবে বলে ঠিক করা হয়। কিন্তু অনিবার্য কারণে তিনকড়িকেই শেষ পর্যন্ত 'জনা'র ভূমিকায় নির্বাচন করা হয়। এই নির্বাচনের ব্যাপারে গিরিশচন্দ্র অর্ধেন্দুশেখরের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। তিনকড়ি 'জনার' মত কঠিন চরিত্রের রূপদানে সক্ষম হবেন কিনা, এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের যথেষ্ট সংশয় ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্ধেন্দুশেখর গিরিশচন্দ্রকে রাজী করান এবং তিনকড়িকে শিক্ষাদানের ভার নিজেই গ্রহণ করেন।

অর্ধেন্দুশেখর তিনকড়ির জন্য পৃথক মহলার বন্দোবস্ত করে শিক্ষা দিতে থাকেন।

'জনা'র ভূমিকায় অভিনয় করার পূর্বে, তিনকড়ি অবশ্য বীণা থিয়েটারে 'মীরাবাঈ' নাটকে নামভূমিকায় অভিনয় করে কিছুটা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। কিন্তু 'জনা'র মত দুরূহ চরিত্রের তুলনায় 'মীরাবাঈ' কতকটা হাল্কা চরিত্র। তাই, তিনকড়িকে নির্বাচন করার পর গিরিশচন্দ্রের ভয়-ভাবনার অন্ত ছিল না। ওদিকে অর্ধেন্দুশেখর তিনকড়ির শিক্ষাদান ব্যাপারে অপরিসীম পরিশ্রম করতে লাগলেন।

তৃতীয় অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্কে 'জনা'র মস্তিষ্ক-বিকৃতির আগে যেখানে

জনা প্রবেশ করে বলেন :

'ওই ওই ওই যে কুমার বাপধন পড়েছ সংগ্রামে, তাই যাদুমণি, এস নাই মার কাছে ? হা পুত্র, হা প্রবীর আমার' ইত্যাদি,

উপরোক্ত কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে চোখে মুখে যে অভিব্যক্তি ফুটে ওঠা দরকার, তার একান্ত অভাব হতে লাগলো তিনকড়ির। অর্ধেন্দু-শেখর নানাভাবে চেস্টা করেও—তা তিনকড়িব কাছ থেকে আদায় করতে পারলেন না। শেষে অর্ধেন্দুশেখর কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

তিনকড়িব কোন সন্তানাদি ছিল না। পারিবারিক জীবনে তিনি পুত্রাধিক স্নেহ করতেন তাঁর ভাইপোকে।

অর্ধেন্দুশেখর একদিন তিনকড়িকে মহলা দেওয়াবার জন্য থিয়েটারে আসছেন, রাস্তায় তিনকড়ির ভাইপোর সঙ্গে দেখা। তিনি তিনকড়ির ভাইপোকে সস্নেহে নিজের কাছে ডাকলেন, তারপর তার সঙ্গে একথা-সেকথা বলতে বলতে থিয়েটারে এসে তাঁর ঘরে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনকড়ির ভাইপোকে ঘরে বসিয়ে রেখে, অর্ধেন্দুশেখর হন্তদন্ত হয়ে স্টেজে গিয়ে তিনকড়িকে জানালেন—সর্বনাশ হয়েছে তিনকড়ি। তোর ভাইপো গাড়িচাপা পড়েছে।

অর্ধেন্দুশেখরের কথা শুনে তিনকড়ি 'এ্যাঁ!' বলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। তখন অর্ধেন্দুশেখর তিনকড়িকে হাত ধরে তুলে বললেন—'কিছু হয়নি তোর ভাইপোর, বহাল তবিয়তেই আমার ঘরে বসে আছে।' ইতিমধ্যে অর্ধেন্দুশেখর লোক পাঠিয়ে তিনকড়ির ভাইপোকে ডেকে আনালেন। ভাইপোকে দেখে তিনকড়ি শান্ত হলে, অর্ধেন্দুশেখর বললেন—'ভাইপোর দুর্ঘটনার কথা শুনে, যে এ্যাঁ-টা তোর মুখ দিয়ে এখন বেরুলো—সেই এ্যাঁ-টা মনে রাখিস। কদিন ধরে এইটাই আমি আদায় করতে চাইছিলাম তোর কাছে। শোন, 'ওই ওই ওই যে কুমার' ঐ সংলাপ বলার আগে, এখন থেকে ঐ আগের

ছুটো 'ওই' আর বলিস না। বল—'এ্যাঁ! ওই যে কুমার বাপধন পড়েছ সংগ্রামে', তাহলেই দেখবি তোর চোখেমুখে বিস্ময় আর বেদনা একসঙ্গে ফুটে উঠবে।'

অর্ধেন্দুশেখরের এই সুকৌশলে শিক্ষাদান সার্থক হয়েছিল। জনার ভূমিকায় অভিনয় করে, তিনকড়ি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আর সেই সঙ্গে গিরিশচন্দ্রেরও জনা নাটক রচনা সার্থক হয়ে উঠেছিল।

॥ মৃত্যুর প্রস্তুতিপর্ব ॥

১৯৫২ সালে স্টার থিয়েটারে 'শ্যামলী' মঞ্চস্থ হয়। রবিদা অর্থাৎ স্বর্গত রবি রায় শ্যামলীব বাবার ভূমিকায় অভিনয় কবতেন। হাবা মেয়েকে নিয়ে বিব্রত পিতার ভূমিকাটি নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন রবিদা। 'শ্যামলী'র সে সময়ে একটানা ৪৮৪ রাত্রি পবিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে অভিনয় হয়েছিল। নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতেন উত্তমকুমার। ৪৮৪ রাত্রি অভিনয় হওয়ার কিছুদিন আগে থেকেই উত্তমকুমারের শরীর খারাপ হতে থাকে এবং ৪৮৪ রাত্রি পর্যন্ত অভিনয় করে, তিনি অবসর নেন। উত্তমকুমার সুস্থ থাকলে একটানা অভিনয়ে 'শ্যামলী' যে কতদিন চলত, তা হিসেব করে বলা থিয়েটার-কর্তৃপক্ষের পক্ষেও অসম্ভব ছিল সেদিন। তাড়া-তাডা চিঠি, টেলিফোনের ওপর টেলিফোন—কবে সুস্থ হবেন উত্তমকুমার? কত দিন পরে তিনি আবার অভিনয় করতে পারবেন? ইত্যাদি প্রশ্নে রবিদার বিব্রত পিতার চরিত্রচিত্রণ অপেক্ষা অধিকতর বিব্রত হয়েছিলেন সেদিন স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ।

আড়াই বৎসর কাল 'শ্যামলী'র একটানা অভিনয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। সেটি হচ্ছে এই যে, ঐ সময়ের মধ্যে যারা প্রথম রাত্রি থেকে অভিনয় শুরু করেছিলেন, সেইসব শিল্পীদের মধ্যে একজনেরও কোন দিন কামাই ছিল না। অর্থাৎ ঐ দীর্ঘ দিনের মধ্যে original

casting-এর কোন duplicate হয়নি।

উত্তমকুমার নাটক থেকে বিদায় নেওয়ার পর মধ্যে বার তিনেক অন্য অভিনেতাকে উত্তমকুমারের ভূমিকায় অভিনয় করান হয়েছে। কিন্তু রবিদার মৃত্যুর পরে যখন তাঁর ভূমিকাটি সন্তোষ সিংহকে দিয়ে অভিনয় করান হয়, সেদিন রবিদার স্মৃতিকে স্মরণ করে আমি বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম। এখন সেই কাহিনীটি বিবৃত করছি।

৪৮৪ রাত্রি অর্থাৎ উত্তমকুমার যেদিন শেষ অভিনয় করছে, সেদিন রবিদাকে দেখলাম অত্যন্ত বিমর্ষ। কারুর সঙ্গে ভাল করে কথা কইছেন না। যে মানুষ সর্বদা হাসিখুশি, তাঁর মুখে আজ গভীর বেদনার ছাপ ফুটে উঠেছে। শুধু রবিদা নয়, সেদিন শিল্পী, কর্মী এবং সংগঠন-কারীরা সকলেই একটু মনমরা হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু রবিদা যেন সকলের চেয়ে 'শ্যামলী'র অভিনয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার বেদনায় একটু বেশিই ভেঙ্গে পড়েছিলেন।

প্রথম অঙ্কের যবনিকা পড়লে, রবিদা ধীরে ধীরে আমার ঘরের পর্দা ঠেলে প্রবেশ করলেন। চুপচাপ সামনের চেয়ারে এসে বসলেন। মুখে কোন কথা নেই। রবিদার মনের অবস্থা বুঝে আমিই কথাটা পাড়লাম।

বললাম—মন খারাপ করে আর কি হবে রবিদা? ৪৮৪ রাত্রি পর্যন্ত ত চললো। 'শ্যামলী'র এই পরমায়ুই বা আমরা কি আশা কবেছিলাম?

—একশো রাত্রির পর থেকে আমি আশা করেছিলাম।

—কত?

—আরো আড়াই বছর। নাটক ভাল হয়, পয়সা দেয়। কিন্তু এমনটা হয় না। আজ পর্যন্ত কোন পার্টের একটা duplicate হয় নি? ৪৮৪-তে বন্ধ হোল। পুরেপুরি ৫০০টা হলে তবু যা হোক একটা রাউণ্ড ফিগার হোত।

—যা হোল না, তা নিয়ে আর মন খারাপ করে লাভ কি রবিদা? 'শ্যামলী' অগণিত দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ করেছে সত্যি। কিন্তু

কেউ কেউ ত আবার এ কথাও বলেছেন যে, আমরা আফিমের নেশায় দর্শকদের ভুলিয়ে রেখেছি।

আমার কথা শুনে রবিদা চটে গেলেন। সজোরে টেবিলে চপেটাঘাত করে বলে উঠলেন—কি ? ঐ সব ফালতু কথায় তুমি কান দাও ? আফিমের নেশা ? একটা জড়ো, হাবা মেয়ে—সে তার মনুষ্যত্ব ফিরে পাচ্ছে না নাটকে ? শাশুড়ীর পায়ে মাথা খুঁড়ে স্থান ভিক্ষে করছে না ? একটা মূক মেয়ের কাকুতি দর্শকদের অভিভূত করছে না ? আফিমের নেশায় মানুষ বুঁদ হয়ে ঝিমোয়—চোখ দিয়ে জল গড়ায় না ?

স্টেজের ঘণ্টা বেজে উঠলো—রবিদা উঠে গেলেন। যাবার সময় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—যাই, আর দুটো অঙ্ক করে শ্যামলীকে গলা টিপে মেরে আসি।

রবিদা স্টেজে চলে গেলেন। দেখলাম ; চোখ দুটো জলভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে।

পাশের ঘরে 'শ্যামলী'র পরিচালক শ্রীযুক্ত শিশির মল্লিক ও শ্রীযুক্ত যামিনী মিত্র মহাশয় বসেছিলেন। তাঁদের কাছে এসে বললাম, রবিদার কথা।

যামিনীদা বললেন—রবির সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়েছে। দেখছি ত কারুর সঙ্গে কোন কথাই কইছে না।

—আমি এতক্ষণে আজ একটা সিগারেটও খেতে দেখিনি রবিদাকে।

মল্লিকসাহেব বললেন—রবি খুব সেন্টিমেণ্টাল।

আমি বললাম—আজকে সকলের সেন্টিমেণ্টেই নাড়া দিয়েছে। তবে রবিদার একটু বেশি।

আমাদের সেদিন কারুরই মনের অবস্থা ভাল ছিল না। এমন কি থিয়েটারের ঝাড়ুদার চাকর-বাকরেরাও 'শ্যামলী' বন্ধ হয়ে যাওয়ার দুঃখ অনুভব করেছিল।

মল্লিকসাহেব ও যামিনীদার সঙ্গে কথা কয়ে নিজের ঘরে এসে

বসেছি। কিছুক্ষণের মধ্যে দ্বিতীয় অঙ্কের যবনিকা পড়লো। বিরতির মাঝে রবিদা মল্লিকসাহেবের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। তৃতীয় অঙ্কের যবনিকা উত্তোলনের সাঙ্কেতিক ঘণ্টা বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রবিদা পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

স্টেজে যাবার আগে আমার ঘরের পর্দাটা ঠেলে মুখ বাড়িয়ে বললেন—আর একটা অঙ্ক। এসো, দেখে নাও। আর ত 'শ্যামলী'কে দেখতে পাবে না।

কথাকটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রবিদার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। মনে হোল, 'শ্যামলী'র বাপের ভূমিকায় দীর্ঘদিন অভিনয় করে, সত্যিই যেন তিনি কন্যার বিয়োগ-ব্যথায় কাতর হয়ে পড়েছেন। তাঁর এ কথার আর কোন জবাব দিলাম না। উঠেও গেলাম না 'শ্যামলী'র শেষপর্ব দেখতে। রবিদা বলতে লাগলেন—বুঝলে, অক্সিজেন দেওয়া রোগীকে মৃত্যুর প্রস্তুতিপর্ব বলতে পার। 'শ্যামলী'র হোল অপঘাত-মৃত্যু।

রবিদা চলে গেলেন 'শ্যামলী'র শেষপর্ব অভিনয় করতে।

এর এক বছর পরে রবিদা চোখ কাটাতে গেলেন। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সুষ্ঠুভাবেই চোখ অপারেশন হয়েছিল। কিন্তু অন্য উপসর্গ দেখা দেওয়ায় রবিদাকে চক্ষু-বিভাগ থেকে সাধারণ বিভাগের শয্যায় নিয়ে আসা হোল। যেদিন সাধারণ বিভাগে তাঁকে নিয়ে আসা হয়, সেই দিন বিকালে হাসপাতালে গিয়ে দেখি, তিনি অচৈতন্য। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে। সহসা রবিদার কথাগুলো মনে পড়ে গেল। 'অক্সিজেন দেওয়া রোগীকে মৃত্যুর প্রস্তুতিপর্ব বলতে পার।' সত্যিই প্রস্তুতিপর্ব—পরের দিন সকালে খবর পেলাম—রবিদা শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। 'শ্যামলী'ই রবিদার শেষ অভিনয়।

॥ অভিনয় ও অভিযোগ ॥

ঘরের পর্দাটা নড়ে উঠলো। থিয়েটারের কয়েকটা জরুরী কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। বিরক্তভাবেই চাইলাম দরজার দিকে। পর্দার ওপার থেকে অতিপরিচিত অভিনেত্রীব কণ্ঠ ভেসে এলো।

—আসতে পারি ?

—এসো।

—কাজে বাধা দিলাম নাকি ?

—না না, বাধা কি ? তাছাড়া কাজ তো তোমাদের নিয়েই—কি ব্যাপার বলো।

—দেখুন, এখানে তো আমার আর কাজ করা চলে না।

নামকরা অভিনেত্রীর মুখে কথাটা শুনে চমকে উঠলাম। নতুন নাটক। ক্রমশ বিক্রি বাড়ছে। এমন সময় এ কি সর্বনেশে কথা ! তাই ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলাম।

—কেন ? কি হোল ?

—সেসব কথা আপনাকে বলতে পারবো না। মোটকথা, ব্যাপার-স্যাপার দেখে বেশ বুঝতে পারছি যে, আমার পেছনে একটা দল হয়েছে।

—সে কি ! কি বলছ তুমি ?

—ঠিকই বলছি। আপনি যদি নিজে গিয়ে আমার সিন্‌গুলো দিন-দুই লক্ষ্য করেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।

—বেশ লক্ষ্য করবো। আর তুমি যা বলছো তা যদি সত্য হয়, তাহলে তোমার সেই বিপক্ষ দলকে কখনই ছেড়ে কথা কইবো না।

—তার দরকার নেই। কি হবে আমার জন্যে আপনাদের অশান্তি ভোগ করার ? বরং আমাকেই ছেড়ে দিন।

—কেন বার বার তুমি ছেড়ে দেওয়ার কথা বলছো ? সবেমাত্র নতুন নাটক খোলা হয়েছে। তোমাকে ছাড়ার ইচ্ছাই যদি আমাদের থাকতো—তাহলে ত' নাটক খোলার আগেই তোমাকে বলে দিতাম।

—কিন্তু আমার মন ভেঙে গেছে। এই ভাঙা মন নিয়ে অভিনয় করতে পারবো না আমি।

—বুঝতে পারছি না। এর মধ্যে কি এমন ঘটলো। সবকথা যদি খুলে বলা তোমার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহলে না হয় লিখে জানাও। অন্ধকারে আমিই বা কি করে কি করি বলো ?

—আপনাকে কিছুই করতে হবে না। ভাগ্য! আমার ভাগ্য! নইলে এমনই বা হবে কেন ?

অভিনেত্রীটি কাঁদ-কাঁদভাবে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। আর আমি তখন আকাশ-পাতাল ভাবতে আরম্ভ করলাম। কি এমন ঘটনা ঘটলো যা ও মুখ ফু'টে বলতেও পারছে না অথচ প্রতিটি কথায় ক্ষোভ প্রকাশ করছে।

রঙমহল থিয়েটার তখন রিসিভারের হাতে। রিসিভারের হয়ে আমি সব দেখাশোনা করি। মনে মনে ঠিক করলাম ব্যাপারটি যাই ঘটে থাকুক, রিসিভারের কানে কথাটা তোলা দরকার। যাই হোক, হাতের কাজ চাপা দিয়ে রেখে, ঠিক করলাম স্টেজের মধ্যে গিয়ে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসি। উঠতে যাব ইতিমধ্যে জনৈক প্রবীণ অভিনেতা ঘরে প্রবেশ করলেন।

—উঠছ নাকি ব্রাদার ?

—হ্যাঁ। ভাবছিলাম একটু নীচেয় যাব।

—আমি যে উঠে এলাম তোমার ঘরে এককাপ চা খাব বলে।

—বেশ তো, বসুন।

চায়ের অর্ডার দিয়ে প্রবীণ অভিনেতাটিকে জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা দাদা, অমুকের কি হয়েছে বলুন ত' ?

—তুমি শুনলে কার কাছে ?

—এই ত' আপনি আসবার একটু আগে ও আমার ঘরে এসেছিল।

—কি বললে ?

—বললে না কিছুই। শুধু বার বার বলতে লাগলো—এখানে কাজ করা আমার দ্বারায় চলবে না। আমি ছেড়ে দেব। কত করে বললাম, কেন ছেড়ে দেবে? কি হয়েছে বলো? কিন্তু কিছুই ভাঙলো না। শুধু যাবার সময় কাঁদ-কাঁদভাবে বলে গেল—ভাগ্য! আমার ভাগ্য! নইলে এমনই বা হবে কেন?

—হুঁ। তা এতকাল ঘর করে কপাল যখন পুড়েছে, তখন ভাগ্য বলতে হবে বৈকি।

—কপাল পুড়েছে? সে আবার কি?

—আছে, ভায়া আছে। সে তুমি বুঝবে না। তবে হ্যাঁ, তোমার নাটকের গুণ আছে ভায়া। রিহার্সাল থেকে আর এই সাত-আটটা অভিনয়ের মধ্যেই হিরো-হিরোইনের মধ্যে ভাব-ভালবাসটা বেশ দানা বেঁধেছে। র‍্যাপিড প্রগ্রেস।

—বলেন কি?

—হ্যাঁ। আর সেই সঙ্গে নাটকটাও ধরেছে বলে মনে হচ্ছে। এখন তুমি নিশ্চিন্ত। এই সুখবরটা তোমায় দিয়ে, তোমার কাছে চা খাব বলেই ত' এলাম।

—নাটক চালানোর দিক থেকে ভাব-ভালবাসার খবরটা হয়ত সুখবর। কিন্তু অল্প বয়সের হিরোটির জন্যে যে দুঃখ হচ্ছে।

—দুঃখ হচ্ছে কেন? আমি তো বলি, এই ভাল হয়েছে।

—না দাদা, আপনার কথা সমর্থনযোগ্য নয়। একটা অল্প বয়েসের ছেলে এইভাবে বয়ে যাবে—

—বয়ে যাওয়ার বাকীটা কি ছিল শুনি? তোমার কাছে একটু আগে কপাল চাপড়ে যিনি ভাগ্যের দোহাই দিয়ে গেছেন, এর আগে হিরোটির যে তার সঙ্গেই—

—এ্যাঁ! বলেন কি!

—ঠিকই বলছি ভায়া। পাকা খবর।

—কিন্তু হিরোর সঙ্গে যে ওর অন্তত দশবছরের বয়সের তফাৎ।

—তাতে কি। থিয়েটারে এর আগে ওর চেয়ে অনেক বেশি বয়সের তফাৎ আমরা দেখেছি। তাইত বলছি ভাই, তোমার নাটকের গুণ আছে।

—কিন্তু এ তাহলে সত্যি সত্যিই ছেড়ে যাবে নাকি?

—না। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার। টীমওয়ার্ক ঠিকই বজায় থাকবে। তবে ওর এখন থেকে একটা-না একটা complain প্রায় রোজই লেগে থাকবে। কোনদিন ভাগ্য দেখিয়ে কপাল চাপড়াবে। কোনদিন হিরো-হিরোইন ওকে স্টেজের ওপর ল্যাং মারার চেষ্টা করছে বলবে। কোনদিন ওদের দুটির দিকে জুলজুল করে চেয়ে থাকবে; কোনদিন বা কটমট করে চাইবে। মোটকথা, নাটক যখন জমেছে, টীমওয়ার্ক বজায় রাখার জন্যে এটুকু তোমায় সহ্য করতেই হবে।

—ভাগ্যিস আপনি এসে পড়েছিলেন। নইলে ওর কথা শুনে ত' এখুনিই স্টেজে যাচ্ছিলাম, সরেজমিনে তদন্ত করতে।

—তা হলে ঠিক সময় বুঝেই এসেছি বলো?

—তা এসেছেন বৈকি। কিন্তু ও যে বলে গেল ওর বিপক্ষে একটা দল হয়েছে।

—না না, দল আবার কি! তবে ছেলেছোকরারা এই নিয়ে একটু হাসিঠাট্টা করছে এই আর কি।

—ছেলেছোকরাগুলো তো আপনার কথা শোনে। ওদের একটু বারণ করে দেবেন। এই নিয়ে যেন আর—

—বেশ। তা দেব। ও দু-একদিন নতুন নতুন দু-একটা ফুট কাটবে, তারপর আপনিই চুপ করে যাবে। কিন্তু তোমার নাটক ত' চুপ করে থাকবে না?

—তার মানে?

—মানে দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে মা, ছেলে আর ছেলের বৌ যেখানে কথা বলছে, সেখানে ছেলে যখন বলে—মা তুমি কি! ছেলের

মুখ চেয়েও কি এই দুঃখিনী মেয়েটাকে তুমি সহ্য করতে পার না? তখন—?

প্রবীণ অভিনেতার কথা শুনে সহাস্যে শুধু তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। উত্তর করতে পারলাম না।

॥ আপত্তি ও সম্মতি ॥

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু) অভিনয়-জগতের একটি স্মরণীয় নাম। যে মানুষটি দিকপাল অভিনেতারূপে একদা খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তাঁর পুঁথিগত বিদ্যা বিশেষ কিছুই ছিল না। শৈশবে শ্যামবাজারের জগবন্ধু মোদকের পাঠশালায় পড়াশোনা করেন। পরে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে ভর্তি হন। কোন রকমে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত উঠে পড়াশোনায় ইস্তফা দেন।

দানীবাবু ছিলেন নটগুরু গিরিশচন্দ্রের একমাত্র পুত্র। গিরিশচন্দ্রের প্রথমা স্ত্রী প্রমোদিনীর গর্ভে দানীবাবু জন্মগ্রহণ করেন। গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠাভগিনী দক্ষিণাকালী দেবীই ছিলেন তাঁর সংসারের কর্ত্রী।

দক্ষিণাকালী অল্প বয়সে বিধবা হন। গিরিশচন্দ্রের পিতামাতার মৃত্যুর পর, দক্ষিণাকালীই গিরিশচন্দ্রকে মানুষ করেন। কাজেই তাঁর কর্তৃত্ব বা কথার ওপর কেউই কিছু বল্‌তে পারতেন না। দানীবাবু ছিলেন দক্ষিণাকালীর অত্যন্ত আদরের। পিসির অতিরিক্ত আদরই দানীবাবুর লেখাপড়ার পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

গিরিশচন্দ্রের অনুজ অতুলবাবু ছিলেন সুশিক্ষিত। আইনজীবী। ভ্রাতুষ্পুত্রের লেখাপড়ার জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি।

এদিকে বালক দানী পাড়ার ছেলেদের নিয়ে, কাগজের সিন তৈরি করে থিয়েটার করতে শুরু করেন। গিরিশচন্দ্রের প্রথম গীতিনাট্য

'আগমনী' যখন মঞ্চস্থ হয়, দানীবাবুর বয়স তখন আট বছর মাত্র। ঐ আট বছর বয়সেই 'আগমনী'র অভিনয় দেখে দানীবাবু আকৃষ্ট হন। এবং এরপর থেকে অভিনয়ের নেশা তাঁকে পেয়ে বসে।

গিরিশচন্দ্র যখন দেখলেন ছেলের লেখাপড়ায় বিশেষ মন নেই, তখন তিনি দানীবাবুকে আর্টস্কুলে ভর্তি করে দিলেন। কিন্তু অঙ্কন-বিদ্যাতেও দানীবাবুব মন বসলো না। আর্টস্কুল ছেড়ে, এখানে ওখানে এ্যামেচার থিয়েটার করতে শুরু করে দিলেন। এই সময়ে শৌখীন দলে দানীবাবুব সঙ্গে যাঁরা অভিনয় করতেন, তার মধ্যে গঙ্গাধরবাবু, পরবর্তীকালে যিনি স্বামী অখণ্ডানন্দ নামে খ্যাতিলাভ করেন, তিনিও ছিলেন। 'লক্ষ্মণ বর্জন' নাটকে রামের ভূমিকায় গঙ্গাধরবাবু আর লক্ষ্মণের ভূমিকায় দানীবাবু অভিনয় করেন। এইভাবে এখানে ওখানে দানীবাবুর অভিনয় করার কথা গিরিশচন্দ্রের কানে যখন আসতে লাগলো, গিরিশচন্দ্র পুত্রের জন্য তখন বড়ই চিন্তিত হয় পড়লেন। গিরিশচন্দ্র পুত্রকে অভিনেতা করাব মোটেই পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই ব্ল্যাক উড কোম্পানীতে শিক্ষা-নবীশরূপে তাঁকে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু অতি অল্পদিনেব মধ্যেই দানীবাবু সে কাজে ইস্তফা দেন। এই সব ব্যাপারে গিরিশচন্দ্র পুত্রেব ওপর মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেও, বড়বোনের জন্যে মুখে কিছুই প্রকাশ করতেন না। এদিকে অভিনয়ের নেশায় দানীবাবু তখন মত্ত।

ছেলের অভিনযের প্রশংসা ক্রমশ গিরিশচন্দ্রের কানেও আসতে লাগলো, কিন্তু কোন গুরুত্বই আরোপ করতেন না গিরিশচন্দ্র।

একদিন দক্ষিণাকালী সরাসরি গিরিশচন্দ্রকে বলে বসলেন—দানী ত' শখের দলে ভালই অভিনয় করে, তা নে না ওকে তোদের থিয়েটারে ঢুকিয়ে।

—তোমার সব কথা রাখতে রাজী আছি দিদি, শুধু ঐ অনুরোধটা তুমি আমায় করো না।

—তাহলে ও কি করবে শুনি ?

—কি করবে তা আমি কি জানি। যা ভাল বোঝে করুক।

—কিন্তু ও যে থিয়েটারই করতে চায়।

—করুক। কিন্তু আমাদের থিয়েটারে আমি ওকে নিতে পারবো না।

—ও এখন বড় হয়েছে। অন্য থিয়েটারে কি ওকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। তোর ওখানে থাকলে, তবু তোর চোখে চোখে থাকতো—

—তুমি যাই বলো, আর যাই করো, মোট কথা—বাপ হয়ে থিয়েটারে ওকে আমি কিছুতেই ঢোকাতে পারবো না।

গিরিশচন্দ্রের জেদ দেখে দক্ষিণাকালী আর কিছু বললেন না। পিসিমার কাছে সব কথা শুনে দানীবাবু দমে গেলেন। শেষে পিসিমা বলে-কয়ে, সে যুগের বিখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল মিত্রের কাছে তাঁকে পাঠালেন। অমৃতলাল ছিলেন গিরিশচন্দ্রের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র। দক্ষিণাকালীর অনুরোধক্রমে একদিন অমৃতলাল গিরিশচন্দ্রের কাছে কথা পাড়লেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র রাজী হলেন না। শেষে অমৃতলাল নানা যুক্তিতর্ক দিয়ে গিরিশচন্দ্রকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তাতেও কিছু হোল না। গিরিশচন্দ্রের সেই একই মনোভাব—বাপ হয়ে ছেলেকে এ লাইনে দেব না। অমৃতলাল কিন্তু দমবার পাত্র নন। তিনি গিরিশচন্দ্রের অজ্ঞাতসারে দানীবাবুকে অভিনয় শিক্ষা দিতে লাগলেন।

এই সময় গিরিশচন্দ্র 'চণ্ড' নাটক রচনা করেন। 'চণ্ড' নাটকে 'রঘুদেবের' ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য উপযুক্ত অভিনেতার সন্ধান করা হচ্ছিল। সুযোগ বুঝে, অমৃতলাল এই সময় গোপনে দানীবাবুকে রঘুদেবের ভূমিকায় অভিনয় করানোর জন্য তৈরি করতে লাগলেন। বেশ কিছুদিন সন্ধান করেও যখন গিরিশচন্দ্র উপযুক্ত কোন অভিনেতা পেলেন না, তখন অমৃতলাল পুনরায় দানীবাবুকে থিয়েটারে নেবার জন্য অনুরোধ করলেন এবং বেশ জোরের সঙ্গেই বললেন—দানীর অভিনয় আমি দেখেছি। রঘুদেবের ভূমিকায় নিশ্চয়ই ও ভাল অভিনয় করতে পারবে। এবার গিরিশচন্দ্র কোন কথা বললেন না বটে, তবে

সম্মতিও জানালেন না।

পরের দিন অমৃতলাল দানীবাবুকে সঙ্গে নিয়ে থিয়েটারে এলেন এবং গিরিশচন্দ্রের সম্মুখে রঘুদেবের ভূমিকায় মহলা দেওয়ালেন। গিরিশচন্দ্র দেখলেন, রঘুদেব মঞ্চাবতরণ করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এবং সেই সঙ্গে এ কথা বুঝতেও তাঁর বাকী থাকলো না যে, অমৃত-সুহৃদ অমৃতলাল সুযোগ বুঝে তাঁকে সম্মত হতে বাধ্য করালেন।

বাংলা ১২৯৭ সালের ১১ই শ্রাবণ (ইং ১৮৯০, ২৬শে জুলাই) 'চণ্ড' নাটকটি স্টার থিয়েটারে সর্বপ্রথম মঞ্চস্থ হয়। দানীবাবুর পেশাদারী মঞ্চে প্রথম অভিনীত নাটক 'চণ্ড'।

॥ একটি স্মরণীয় নাটকের বরণীয় কাহিনী ॥

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রবল বন্যায় দেশ যখন আন্দোলিত, সেই সময় বাংলার সাধারণ রঙ্গালয়ও তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। এই সময় গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলাল পর পর কয়েকখানি দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করেন।

১৯০৫ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' মঞ্চস্থ হয়।

প্রথম অভিনয় রজনীর ভূমিকালিপি ছিল এই রূপ : সিরাজ—দানীবাবু, মোহনলাল—তারক পালিত, ক্লাইভ—ক্ষেত্রবাবু, করিম চাচা—নাট্যকার স্বয়ং, দানশা ফকির—প্রথম রাত্রিতে অতুল গাঙ্গুলী অভিনয় করেন। দ্বিতীয় অভিনয় রজনী থেকে অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি দর্শকদের অভিবাদন জানান।

মিনার্ভা থিয়েটার 'সিরাজদ্দৌলা' অভিনয় করে ঐ সময়ে জনসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসালাভ করে।

একদিকে দেশব্যাপী আন্দোলন, অন্যদিকে মঞ্চের মাধ্যমে দেশাত্ম-

বোধক নাটকের অভিনয় ইংরেজ সরকারকে বেশ বিব্রত করে তুলেছিল। এবং শেষ পর্যন্ত 'সিরাজদ্দৌলা' নাটক রাজরোষে পতিত হয়। মিনার্ভা থিয়েটার 'সিরাজদ্দৌলার' অভিনয় বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়।

'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের সম্পর্কে তুটি মজার কাহিনী শোনা যায়। একটি মহলার কাহিনী। অপরটি অভিনয়ের কাহিনী।

দানীবাবুকে 'সিরাজের' ভূমিকায় মহলা দেওয়ানোর সময় সিরাজের সিংসাসনে বসা এবং সিংহাসন থেকে নেমে আসার ভঙ্গিমা গিরিশচন্দ্রের কিছুতেই মনঃপূত হচ্ছিল না।

একদিন সকাল থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত গিরিশচন্দ্র এ বিষয়ে দানী-বাবুকে শিক্ষাদান করতে লাগলেন। অর্ধেন্দুশেখর ইতিমধ্যে মহলায় এসে উপস্থিত হয়েছেন।

অনেকক্ষণ লক্ষ্য করে তিনি গিরিশচন্দ্রকে বললেন—দানীর সিংহাসনে বসা এবং সিংহাসন থেকে নেমে আসাটা তোমার ভাল লাগছে না কেন ?

—নবাবী চালের অভাব হচ্ছে।

—মোটেই হচ্ছে না। ঠিক আছে। কালিদাসকে আর তুমি খাটিও না।

অর্ধেন্দুশেখর বলতেন, কালিদাসের জিহ্বায় যেমন সরস্বতী বিরাজ করতেন, তেমনি দানীবাবু বিশেষ কিছু লেখাপড়া না শিখলেও অভিনয়-বিদ্যাটি সহজেই আয়ত্ত করেছেন। তাই দানীবাবুকে অর্ধেন্দুশেখর কালিদাস বলে ডাকতেন।

অর্ধেন্দুশেখরের মন্তব্য শুনে গিরিশচন্দ্র পুত্রকে সিংহাসনে বসা এবং সিংহাসন থেকে নেমে আসার মহলা থেকে রেহাই দিলেন।

দ্বিতীয় কাহিনীটি অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয় সম্পর্কে। দ্বিতীয় অভিনয় রজনী থেকে অর্ধেন্দুশেখর দানশা ফকিরের চরিত্রটিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন।

একদিনের অভিনয়ে অর্ধেন্দুশেখর জনৈক দর্শকের হাত থেকে অন্নের

জন্যে রেহাই পেয়ে যান।

দানশা ফকিরের চরিত্রটি দর্শকদের কাছে মোটেই সহানুভূতি পাবার চরিত্র নয়। কেন না দানশা ফকির কোম্পানীর লোকদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে সিরাজকে ধরিয়ে দেয়। দানশা ফকির যেখানে কোম্পানীর লোকদের পথের সন্ধান দিচ্ছে, সেই জায়গাটায় যখন অর্ধেন্দুশেখর একদিন অভিনয় করছেন, সহসা জনৈক মুসলমান দর্শক আসন থেকে উঠে অর্ধেন্দুশেখরকে মারতে উদ্যত হল। অন্যান্য দর্শকেরা মুসলমান দর্শকটিকে ধরে ফেললেন। এবং এটা যে অভিনয় সেই কথাটা অনেক করে বুঝিয়ে তবে তাঁকে শান্ত করেন।

আজকের দিনে দর্শক এবং শিল্পীদের কাছে এটা গল্পকথা বলে মনে হলেও—কাহিনী বাস্তব সত্য।

।। একটি শাস্তির নমুনা ।।

অভিনেত্রীটির ঘরে সম্প্রতি এক বড়লোক বাবুর শুভাগমন হচ্ছে। অগাধ পয়সা, বিপুল ঐশ্বর্য। অল্প দিনের মধ্যেই অভিনেত্রীর ঘরের চেহারা পাল্টে দিয়েছেন বাবুটি। দেওয়ালে বড় বড় আয়না; ফ্রেস্‌কো পেনটিং, সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধানো কয়েকটা বড় বড় ছবি। ঘরের মেঝেতে দামী গালিচা বিছানো। পানদানি থেকে পিক্‌দানিটি পর্যন্ত রূপোর। ঘরের ভোলটাই শুধু পাল্টায়নি, সেই সঙ্গে সোনার আর জড়োয়ার গহনাও উঠেছে অভিনেত্রীটির অঙ্গে। বড়লোক বাবুটি কি অভিনেত্রীর রূপে মজে দরাজ হস্তে অর্থ ব্যয় করে চলেছেন? না—তা নয়। রূপ দেখে রূপো ঢালছেন না তিনি। রূপো ঢালছেন, মধুকণ্ঠির গান শোনার জন্যে।

শরীর ভাল নয়—এই অজুহাতে অভিনেত্রীটি এখন আর থিয়েটারের অভিনয়ে বা মহলায় হাজিরা দিচ্ছেন না। শুধু গান নয়, খুব ভাল

নাচতেও পারেন অভিনেত্রীটি। কাজেই থিয়েটারের মঞ্চ ছেড়ে প্রতিটি সন্ধ্যা এখন মুখর হয়ে ওঠে তাঁর ঘরটি। রজনীগন্ধার ঝাড়, কবরীর বেল-যুঁইয়ের গন্ধে ভরপুর করে তোলে বাবুর মন। অভিনেত্রীর দৌলতে সাবেঙ্গী-তবলচিরও কিছু আয় হচ্ছে আজকাল।

অভিনেত্রীটি তখন যে থিয়েটারে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন, সেই থিয়েটারের অধ্যক্ষ নাট্যকার অপরেশচন্দ্র। বড় দূরদর্শী অধ্যক্ষ ছিলেন অপরেশচন্দ্র। চুক্তিভঙ্গ করছেন বলে, অভিনেত্রীটিকে কিন্তু তিনি কোন কড়া পত্র বা কড়া তলব করে থিয়েটারে ডেকে পাঠাচ্ছেন না। প্রথম দিকে নিয়মিত গাড়ি পাঠাচ্ছিলেন। এখন আর তাও পাঠান না।

সব কথাও ইতিমধ্যে অপরেশচন্দ্রের কানে গেছে। কেউ কেউ অপরেশচন্দ্রকে বলেছেন, অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য। কিন্তু তাঁদের কথা এক কানে শুনেছেন, অপর কান দিয়ে বার করে দিয়েছেন অপরেশচন্দ্র। নতুন নাটকের মহলা চলছিলো। তাতেও একটি নাচ-গানের বড় ভূমিকায় অভিনয় করার কথা ছিল অভিনেত্রীটির। অবস্থা বুঝে, ইতিমধ্যে সে ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য অন্য এক অভিনেত্রীকে ঠিক করা হয়েছে। কিন্তু এত অসুবিধা এবং ঝঞ্ঝাট নীরবে সহ্য করেও থিয়েটারের চাকরকে দিয়ে অপরেশচন্দ্র নিয়মিত মাস-মাইনেটা পাঠিয়ে দিচ্ছেন। টাকা দিয়ে রসিদ সই করে নিয়ে আসছে চাকরটি।

ওদিকে বাবুটির মাস কয়েক পরেই নাচ-গানের মোহ কেটে গেল। নূপুরের আওয়াজ থেমে গেল। সেই সঙ্গে খসে পড়লো—কবরীর মালা।

একদিন সকালে অপরেশচন্দ্র থিয়েটারে নাটক রচনায় ব্যস্ত এমন সময় অভিনেত্রীটি এলেন।

—বাবা!

কাগজ থেকে মুখ তুলে চাইলেন অভিনেত্রীটির দিকে। তারপর সস্নেহে কাছের একটি আসন দেখিয়ে বলেন—এই যে! এস, এস।

তারপর কেমন আছ এখন ?

এমনভাবে কথাগুলো বললেন, যেন কোন ক্ষোভই তাঁর মনে নেই। অভিনেত্রীটি অধ্যক্ষের কথায় আশ্বস্ত হয়ে বললেন—বসে বসে আর যে ভাল লাগছে না।

—শরীর যখন ভাল নয়, আরো কিছুদিন না হয় বিশ্রাম করো।

—না না। বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না।

—ভাল লাগছে না ? কেন বল ত ?

—সন্ধ্যে হলে মনটা বড় খারাপ হয়ে যায়।

—বুঝেছি। ঘরের সন্ধ্যেটা এখন খুবই অন্ধকার লাগছে। শোন, অভিনেতা-অভিনেত্রী যদি দর্শকদের সামনে বেশ কিছুদিন অনুপস্থিত থাকে, তা'হলে দর্শকেরাও তাদের ভুলে যায়। তোমার ব্যবহারে খুবই ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। তাই মনে করেছিলাম মাইনে দিয়ে তোমাকে বসিয়ে রাখবো এবং সেই সঙ্গে দর্শকদের মন থেকে তোমাকে সরিয়ে দেব। তা যাক্। এসেছ যখন কাজ করো। তবে মনে রেখো—ঘরের গান আর ঘরের ঘুঙুর ঘরেই আবদ্ধ থাকে। তার যশও নেই, খ্যাতিও নেই।

অপরেশচন্দ্রের কথায় অভিনেত্রীটি তখন শুধু লজ্জিতই নন, সেই সঙ্গে অনুতপ্ত ! ঘন ঘন আঁচলে চোখ মুছলেন।

।। তাতিয়ে দিয়ে মাতানো অভিনয় ।।

অক্ষয় চক্রবর্তী মশাই সেকালের একজন নামকরা কৌতুক অভিনেতা ছিলেন। তাঁর অভিনয়ে দর্শকেরা প্রচুর হাসির খোরাক পেলেও, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। অভিনয় করা কালীন ভূমিকার সঙ্গে তিনি একাত্ম হ'য়ে যেতেন। অনেক সময় তিনি নিজেকে ঠিক রাখতে পারতেন না। ভুলে যেতেন যে, তিনি অভিনয় করছেন। এইরকম আত্মভোলা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে অনেক

সময়ে বিভ্রাটে পড়তে হয়। অক্ষয়বাবুকে নিয়েও মাঝে মাঝে বিভ্রাটে পড়তে হোত।

যে সময়ের কথা বল্‌ছি, অমর দত্ত মশাই সে-সময়ে স্টার থিয়েটারের প্রযোজক-পরিচালক। অক্ষয়বাবুও তখন স্টার থিয়েটারের শিল্পী-গোষ্ঠীভুক্ত।

রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মশাইয়ের 'কাল-পরিণয়' নাটকে অক্ষয়বাবু শম্ভুর ভূমিকায় অভিনয় করতেন। শম্ভুর চরিত্রটি একটু অদ্ভুত ধরনের। 'হরিবোল' শুনলেই শম্ভু চটে যায়। তখন আর তার দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান থাকে না। যা মুখে আসে, তাই বলে গালাগালি দিতে শুরু করে। নাটকের এক জায়গায় আছে, বৃদ্ধ চাকর শম্ভুকে হুঁকাটি হাতে ধরিয়ে দিয়ে, ফিরে যাওয়ার সময় আপন মনে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে। আর কোথায় আছে? শম্ভু শুধু চটে ওঠে না, সেই সঙ্গে তেড়ে মারতে যায় চাকরকে। অক্ষয়বাবু ঐ জায়গায় এমন নিখুঁত অভিনয় করতেন যে, দর্শকেরাও প্রেক্ষাগৃহ থেকে হরিধ্বনি দিয়ে উঠতো। সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়বাবুরও উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতো।

একদিন 'কাল-পরিণয়' হচ্ছে। প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে পরিপূর্ণ। অক্ষয়বাবু চাকরের মুখে 'হরিবোল' শুনে যেই তেড়ে মারতে যাবেন, এমন সময় প্রেক্ষাগৃহ থেকে সেদিন একজন মাত্র দর্শক 'হরিবোল' বলে উঠলো। আর কোথায় আছে। সঙ্গে সঙ্গে অক্ষয়বাবু ঘুরে দাঁড়ালেন। তারপর পাদ-প্রদীপের সম্মুখে এগিয়ে এসে, সেই দর্শকের প্রতি যথেচ্ছ কটুক্তি করে বল্‌লেন—সাহস থাকে ত সামনে এসে বলো? শুধু এই কথা বলেই ক্ষান্ত হলেন না। সেই সঙ্গে গালাগালিও করে বস্‌লেন। সেদিন অভিনয় করতে করতে অক্ষয়বাবু এতই আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন যে, খেয়ালই ছিল না তিনি অভিনয় করছেন।

যাই হোক, অক্ষয়বাবু মঞ্চ থেকে চলে এলে, সর্বাধ্যক্ষ অমরেন্দ্রনাথ মঞ্চে দাঁড়িয়ে দর্শকদের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করলেন। এবং সেই সঙ্গে একথাও জানালেন যে, অক্ষয়বাবুর এই ত্রুটি ইচ্ছাকৃত নয়। কেন না

অভিনয় করতে করতে তিনি নিজেই ভুলে যান যে অভিনয় করছেন।

অমরেন্দ্রনাথের ত্রুটি স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকেরা একযোগে বলে উঠলেন যে, অক্ষয়বাবুর অভিনয়ে তাঁরা মুগ্ধ। 'হরিবোল' বলে তাঁরা তাঁকে শুধু তাড়িয়েই দেননি, সেই সঙ্গে তাঁর স্বাভাবিক অভিনয় দর্শনে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন।

॥ দর্শক নাট্যাচার্য ॥

মনোমোহন থিয়েটারে টিকিট কিনে অভিনয় দেখতে এসেছেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার।

সেদিন 'মীরাবাঈ' আর 'সরলা' নাটকের অভিনয় ছিল মনোমোহন থিয়েটারে। 'সরলা' নাটকে দানীবাবুর গদাধরচন্দ্রের অভিনয় দেখার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই সেদিনের অভিনয়-আসরে উপস্থিত হয়েছিলেন শিশিরকুমার।

প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের আসনে শিশিরকুমারের উপস্থিতির কথা চাপা রইলো না। অচিরেই সে খবর গিয়ে পৌঁছলো সাজঘরে। দানীবাবু ডেকে পাঠালেন শিশিরকুমারকে। দানীবাবুর অনুরোধে শিশিরকুমার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন সাজঘরে। দুই দিকপাল অভিনেতার মধ্যে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় হোল। শেষে দানীবাবু শিশিরকুমারের টিকিটটি চেয়ে নিয়ে বুকিং অফিসে পাঠিয়ে দিয়ে জানালেন—টিকিটের দাম রিফাণ্ড দিয়ে তার বদলে ভাল আসনের পাশ লিখে দিতে। শিশিরকুমার আপত্তি জানাতে কসুর করলেন না। কিন্তু কে কার কথা শোনে? বাধ্য হয়ে দানীবাবুর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত শিশিরকুমারকে টিকিটের দাম ফেরত নিতে হোল।

তখনকার দিনে অধিক রাত্রি পর্যন্ত থিয়েটার হোত। প্রথম নাটক ছিল 'মীরাবাঈ', পরে 'সরলা'। নাট্যাচার্য 'সরলা' নাটকের অভিনয়

দেখলেন। অভিনয় যখন শেষ হোল তখন মধ্যরাত্রি। শিশিরকুমার দানীবাবুর অভিনয়দর্শনে মুগ্ধ। সাজঘরের দিকে পা বাড়ালেন। মনোমোহন থিয়েটারের জনৈক কর্মচারী তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়ে দানীবাবুব কাছে নিয়ে গেল। দানীবাবু তখন মেকআপ তুলছিলেন। দরজার সামনে শিশিরকুমারকে দেখে স্বাগত জানালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন লাগল ?

—অপূর্ব ! আপনার গদাধরচন্দ্রের কথা শুনেই আসছিলাম এতদিন। আজ তা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হোল। ভেবেছিলাম, 'সরলা' স্টেজ করবো এবং ইচ্ছে ছিল গদাধরচন্দ্র সাজবো। কিন্তু সে সাধ আপনার এই অভিনয় দেখার পর আব আমার নেই। আপনি অদ্বিতীয় গদাধরচন্দ্র !

নাট্যাচার্য শিশিরকুমাবের প্রশংসায় দানীবাবুকে তখন বারবার এই কথাই বলতে শোনা গেল—না ঠাকুর, না, তুমিও পার। ইচ্ছে করলে তুমি সব পার। কত বড় পণ্ডিত তুমি—এই গদাধবকে তুমি অন্য রূপ দিতে পার।

॥ দুই দিকপাল অভিনেতার দুই যুক্তি ॥

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের নাট্য-মন্দিরে (কর্ণওয়ালিশ থিয়েটার) 'প্রফুল্ল' নাটকের সম্মিলিত অভিনয় হচ্ছে। যোগেশ—সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু)। রমেশ—শিশিরকুমাব। প্রেক্ষাগৃহ দর্শকে পরিপূর্ণ। সেদিনকার সে অভিনয়ে দানাবাবু যেন একাই দর্শকদের হৃদয় জয় করে বসে আছেন। সম্মিলিত অভিনয়ে সেদিন যে সব অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অভিনয় করেছিলেন তাঁদের অনেকেই রঙ্গজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত। সকলেই নিজ নিজ ভূমিকায় যথাযোগ্য রূপদান করলেও সেদিনের সে অভিনয়ে সবচেয়ে বেশি সুনাম অর্জন করলেন দানীবাবু। প্রতিটি দৃশ্যে দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করতে লাগলেন। শিশির-

কুমারের যাঁরা অতি প্রিয়জন সেদিন দানীবাবুর অভিনয় দেখে তাঁদের মধ্যে অনেকেই যেন একটু মুষড়ে পড়লেন। পুরাতন শ্বেতহস্তীর (দানীবাবুকে সে সময় একজন শ্বেতহস্তী বলে অভিহিত করতেন) এত প্রশংসা তাঁদের কাছে যেন একটু অসহনীয়ই হয়ে উঠ্‌লো। তাঁরা শিশিরকুমারকে গিয়ে ধরে বসলেন কিছু প্যাঁচপোঁচ্‌ কষার জন্যে।

শিশিরকুমার একটু হাসলেন। তারপর বেশ রূঢ়ভাবেই তাঁদের জানালেন—'রমেশের প্যাঁচের পরিণতিতেই তো যোগেশের সংসারটা ছারখার হয়ে যাচ্ছে। তার বেশি প্যাঁচ তো আমার জানা নেই।'

ভক্তেরা অমন উত্তর পেয়েও সন্তুষ্ট নন। তবুও বলে বসলেন—শরীরটা বোধ হয় স্যার আজ আপনার ভাল নেই। তাই—

—না না, শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ আছে।

—কিন্তু মনে হচ্ছে যেন—

—মনে হতে পারে। অনেক কিছুই মনে হতে পারে তোমাদের। কিন্তু ভুলে যেও না 'ভীল শিশু সিংহ সনে করে রণ।' যাও।

স্তাবকের দল সরে পড়লেন।

পরের দিন সকালে দানীবাবু বসে আছেন তাঁর বোসপাড়া লেনের বাড়ির বৈঠকখানায়। দানীবাবুর জনৈক ভক্ত এসে হাজির হলেন। আগের দিন রাত্রে সম্মিলিত অভিনয়ে দানীবাবু যে দর্শকের অভিনন্দন কুড়িয়েছেন সে কথা বেশ ফলাও করে রংচং দিয়ে বলতে শুরু করলেন। এ আতিশয্য কিন্তু দানীবাবুর কাছে অসহ্য হয়ে উঠ্‌লো, দানীবাবু শিশিরকুমারকে ঠাকুর বলতেন।

শেষে ভক্তটিকে থামিয়ে বলেন—ঠাকুর অমন অভিনয় না করলে, আমার একার কি ক্ষমতা ছিল হাততালি কুড়োবার? অভিনয়টা কি জান, ওটা কতকটা তোমাদের ব্যাট্‌মিনটন্‌ খেলার মত। একপক্ষ যদি অপর পক্ষে টুংটাং করে বল পাঠাতে পারে, তবেই না খেলাটা জমে? অভিনয় করাটাও কতকটা সেই রকম। ঠাকুর কাল রমেশের পার্ট অত ভাল না করলে কি আর আমার যোগেশ ভাল হোত?

॥ মর্যাদার মূল্য ॥

সেযুগের নাম করা ইংরাজী কাগজওয়ালারা মঞ্চাভিনেত্রী বিনোদিনীকে কেউ কেউ 'ফ্লাওয়ার অব দি নেটিভ স্টেজ' বলতেন। কেউ বা বলতেন 'সাইনোরা'। সত্যিই তাই। সেযুগে বিনোদিনী ছিলেন অভিনেত্রী-কুলশিরোমণি।

অভিনয়-জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে সারা জীবন তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছে। পাঁচ বছব বয়সে বিনোদিনীকে গৌরীদান করেছিলেন তাঁর দিদিমা। কিন্তু গৌরীদানের কোন পুণ্যই তিনি অর্জন করতে পারেননি। গৌরীকে ফেলে রেখে মহাদেব স্বামীটি পালিয়ে গিয়েছিলেন। আর শেষ পর্যন্ত ঘর বেঁধেছিলেন আর এক গৌরীকে নিয়ে। যাব ফলে বিনোদিনীকে জীবনধারণের জন্যে অভিনেত্রীর বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল।

অভিনেত্রী জীবনে তিনি খ্যাতি, প্রতিপত্তি সবই পেয়েছিলেন। কিন্তু শান্তি পাননি কোনদিন। সারাজীবন তাঁর ওপর দিয়ে অশান্তির ঝড় বয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওরই মধ্যে তাঁর অভিনেত্রা জীবনের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা ছিল এই যে তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আশীর্বাদলাভে ধন্য হয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন—'মা, তোর চৈতন্য হোক।' ভোগবিলাসের তমসাচ্ছন্ন তিমির অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত ঠাকুরের আশীর্বাদে তাঁর চৈতন্য হয়েছিল। ভোগবিলাস ত্যাগ করে শেষ জীবনে তিনি গৈরিক ধারণ করেছিলেন। নিত্য গঙ্গাস্নান করে, তিনি হবিষ্যান্ন গ্রহণ করতেন। চরম ভোগের পরে, ঠাকুরের আশীর্বাদই হয়েছিল তাঁর শেষ জীবনের পরম পাথেয়।

অভীনেত্রীরূপে যখন তিনি 'সাইনোরা', সেই সময়ে এক জমিদার-পুত্রের আবির্ভাব ঘটলো তাঁর জীবনে। এই জমিদার-পুত্রের ভালবাসায় মুগ্ধ হলেন বিনোদিনী। অতবড় অভিনেত্রী হয়েও জমিদার-পুত্রের ভালবাসার অভিনয়কে তিনি অভিনয় বলে ধরতে পারেননি। কিন্তু

বিনোদিনী তাঁকে সত্যিই ভালবেসেছিলেন। তাঁর ভালবাসার মধ্যে এতটুকু কপটতা ছিল না।

কিন্তু বিনোদিনী মানুষের চেয়ে ভালবাসতেন মঞ্চকে। তাই জমিদার-পুত্র যখন তাঁকে অভিনেত্রীর কাজ ত্যাগ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তখন বহু অর্থের বিনিময়েও তা তিনি ত্যাগ করতে পারেননি। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে এমনতর শর্ত শুধু জমিদার-পুত্রটিই আরোপ করেননি—বিনোদিনীর জীবনে বিত্তশালী এমন অনেক ব্যক্তিই তাঁকে মঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে অনুরোধ করেছিলেন।

বিনোদিনী জানতেন, মঞ্চ তাঁকে যে যশ ও প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, সে যশ ও সে প্রতিষ্ঠার কাছে অর্থ অতি তুচ্ছ বস্তু, যাই হোক, জমিদার-পুত্রটি শেষ পর্যন্ত সহধর্মিণীর মর্যাদা দেবেন বলেও জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও বিনোদিনীকে রাজী করান সম্ভব হয়নি। বিনোদিনী বেশ জানতেন, থিয়েটার ছাড়ানোর জন্যে জমিদার-পুত্রের এ আর একটি কৌশল মাত্র। বিনোদিনী কোনমতেই থিয়েটার ছাড়তে রাজী না হলেও জমিদার-পুত্রের কিন্তু বিনোদিনীর ঘরে আসা-যাওয়া বন্ধ হয়নি। কিন্তু হঠাৎ বেশ কিছুদিন তিনি ডুব মারলেন। কোন খবর নেই। মাসখানেক পরে, সহসা এক সন্ধ্যায় বিনোদিনীর ঘরে পুনরাবির্ভাব হোল জমিদার-পুত্রের। বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করলেন—

—এতদিন আস নি যে? কোথায় ছিলে?

—জমিদারীর কাজকর্ম দেখার জন্যে দেশে যেতে হয়েছিল।

বিনোদিনী মুচকে হাসলেন মাত্র! কোন জবাব দিলেন না। কেন না, জমিদার-পুত্রের প্রবঞ্চনা বিনোদিনীর কাছে আগেই ধরা পড়ে গিয়েছিল। বিনোদিনী জানতে পেরেছিলেন জমিদার-পুত্র দেশে গিয়েছিলেন—বিয়ে করতে।

॥ **একটি অবিশ্বাসী মনে আঘাত** ॥

গিরিশচন্দ্রের বাগবাজার বোসপাড়া লেনের বাড়ি থেকে, স্টার থিয়েটারের ঘোড়ার গাড়িতে করে গিরিশচন্দ্র ও ভূনীবাবু (অমৃতলাল বসু) আসছেন থিয়েটারে। গিরিশচন্দ্রের নির্দেশে গাড়ি বাগবাজারের গঙ্গার ধার দিয়ে আসছে। গিরিশচন্দ্র সিদ্ধেশ্বরীতলায় এসে গাড়ি থামাতে বললেন।

ভূনীবাবু মাঝপথে গাড়ি থামাতে বলায় জিজ্ঞেস করেন : এখানে কেন ?

—সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে যাব। মাকে প্রণাম করবো।

গাড়ি থামলো। গিরিশচন্দ্র গাড়ি থেকে নেমে মন্দিরে গেলেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ফিরে এলেন। গাড়ি ছাড়লো।

মদনমোহনতলার পাশ দিয়ে গাড়ি রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে ঢুকতে যাবে, গিরিশচন্দ্র আবার গাড়ি থামাতে বললেন।

ভূনীবাবু একটু বিরক্তভাবেই বলেন : এখানে আবার কি ?

—মাকে দর্শন করবো।

—এই তো করলে !

—এখানেও মায়ের মন্দির। দেখছো না ?

—দেখেছি। দেখেছি। আমিও এই পাড়ার ছেলে। তুমি আর নতুন কি দেখাবে আমায়।

গিরিশচন্দ্র কোন উত্তর করলেন না। গাড়ি থেকে নেমে মন্দির-দ্বারে মাথা ঠেকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণাম করলেন। গাড়িতে ফিরে এলেন। গাড়ি ছাড়লো। গাড়িতে এসে, ভূনীবাবুর বিরক্তি-মাখানো মুখের দিকে লক্ষ্য করলেন গিরিশচন্দ্র। বললেন : ব্যস্ত কেন হে ! থিয়েটার আরম্ভ হতে ত' এখনো দেরি আছে।

—তা আছে। তবে তোমার ব্যাপার-স্যাপার দেখে তাজ্জব বনে গেছি।

—কেন ?

—এক কালীকে প্রণাম করে হোল না—আর এক কালী। বলি, দুটিতে তফাৎ কি শুনি?

—তফাৎ কিছুই নেই। শুধু মনের তফাৎ। তুমি নামলে না কোন জায়গায়—আমার মন টানলো, আমি নামলাম।

—আরো গোটাকতক পথের মাঝে থাকলেও, নামতে বোধ হয়?

—বললাম ত' মন টানলে নিশ্চয় নামতাম।

—বলিহারী তোমার মনের টান! এইরকম টান হলে, আর দিনকতক বাদে কাজকর্ম সব শিকেয় উঠ্‌বে।

—তা আর হচ্ছে কৈ? সে টান হলে ত' এমন করে আর থিয়েটারে ছুটতাম না। টান কি বে-টান বুঝি না ভূনী। শুধু বুঝি, ঠাকুর যা করাচ্ছেন, তাই করছি—

গিরিশচন্দ্র গম্ভীর। মুখে কোন কথা নেই। থমথম করছে সে মুখ। গাড়ি এসে থামলো থিয়েটারে। গ্রীনরুমে ঢুকতে ঢুকতে বললেন: মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কি তুমি সন্দিহান?

ভূনীবাবু এ কথার কোন জবাব দেন না। তিনি ভালভাবেই চেনেন গিরিশচন্দ্রকে। মুখের ভাব দেখে বুঝতে তাঁর কষ্ট হয় না যে, গিরিশ-চন্দ্র আহত হয়েছেন তাঁর কথায়। তাই পাশ কাটিয়ে গ্রীনরুমে নিজের আসনে গিয়ে মেক-আপ করতে আরম্ভ করেন।

অভিনয় আরম্ভ হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের আজকের অবস্থা দেখে সকলে বেশ একটু ভয়ে ভয়ে আছেন। রাশভারী মানুষ। যাও বা দু'-একটা কথা বলেন, তাও আজ আর বলছেন না। শুধু এক-একটা দৃশ্য অভিনয় করে আসেন, আর স্টেজের পেছনে 'মা-মা' বলে চিৎকার করে পায়চারী করতে থাকেন।

মধ্যরাত্রি। থিয়েটার ভাঙতে আর সামান্যই দেরি আছে। গিরিশ-চন্দ্র ডেকে পাঠালেন ভূনীবাবুকে। তারপর নিজে আসন করে বসলেন। ভূনীবাবু ত' গিরিশচন্দ্রের ভাবান্তর দেখে অবাক।

—আমার সামনে তুমি বসো ভূনী।

ভূনীবাবু বসলেন।

গিরিশচন্দ্র বলেন: মায়ের মন্দিরে নেমে প্রণাম করাতে তুমি বিরক্ত হয়েছ। তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই। থাকলে—অমন তাচ্ছিল্য করে কথাগুলো তখন বলতে পারতে না। যাই হোক, আমি আসন করে বসেছি। তুমি আমাকে স্পর্শ করো।

—স্পর্শ করলে কি হবে?

—কি হবে সেইটাই তোমাকে দেখাতে চাই।

ভূনীবাবু গিরিশচন্দ্রের দুটো হাঁটুর ওপর হাত রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছিটকে পড়ে গেলেন। যেন ইলেকট্রিকের শক্ খেলেন তিনি।

এই ঘটনার পর থেকে ভূনীবাবুর মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। গিরিশচন্দ্রের তিনি অন্তরঙ্গ সুহৃদ-সচিব হলেও, গিরিশচন্দ্রকে তিনি এতকাল গুরু বলেই ডাকতেন। এই ঘটনার পর থেকে, তাঁর জীবনের গুরুত্ব যেন বেশি করেই এনে দিলেন গিরিশচন্দ্র।

॥ সত্য বই মিথ্যা বলিব না ॥

আশু বোস। কৌতুক-অভিনেতা হিসেবে এই নামটি চিহ্নিত হয়ে আছে রঙ্গজগতে।

কর্পোরেশন-এ ওয়াটার ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টে কাজ করতেন। শেষ জীবনে সামান্য কিছুদিন থিয়েটারকে পেশারূপে গ্রহণ করলেও, জীবনের বেশির ভাগ সময় অবৈতনিক (এ্যামেচার) অভিনেতারূপে কাজ করে গেছেন। অভিনয়ের ব্যাপারে অদম্য উৎসাহ আর নিষ্ঠা ছিল আশুবাবুর।

দর্শকেরা তাঁকে যেমন কৌতুক-অভিনেতারূপে জানতেন, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি ছিলেন সুরসিক, কৌতুকপ্রিয়।

সবসময়ে ফিটফাট। আদ্দির গিলে করা পাঞ্জাবি। একটু চওড়া

কালাপাড় দেশী কোঁচান ধুতি, পায়ে বার্নিশ করা পাম্পস্যু। হাতের আঙুলে নানারকমের পাথর বসানো আংটি। একটি-আধটি নয়—দশ আঙুলে অন্তত আটটি। তা ছাড়া সোনার চেন দেওয়া বোতাম। এ ছাড়া সবসময়ে মুখে থাকতো সুগন্ধি জর্দাপান।

কর্পোরেশনের ওয়াটার ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের উড়িষ্যাবাসী কর্মীদের সঙ্গে কাজ করে, আশুবাবু উড়িয়া ভাষাটি বেশ ভালভাবেই রপ্ত করেছিলেন। উড়িয়া ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারতেন। কয়েকটি নাটকে উড়িষ্যাবাসীর ভূমিকায় তিনি যে অভিনয় করে গেছেন, তা আজও নাট্যামোদীদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে।

থিয়েটারের ভেতরে সকলেই তাঁকে পরিহাস করে রায়বাহাদুর বলে ডাকতেন। ইদানীং আর আশুদা বা আশুবাবু বলে ডাকলে উত্তর দিতেন না। রায়বাহাদুর বলে ডাকলে তবে সাড়া মিলতো।

একদিন সন্ধ্যায় রঙমহলের বুকিং অফিসে বসে আমরা গল্প করছি, এমন সময় হেলেদুলে আশুবাবু এসে ঢুকলেন। তারপর আমার সামনে এসে ডান হাতটা কপালে ঠেকিয়ে বললেন: Good evening Madam!

—ভুল হোল রায়বাহাদুর!

—Yes, slip of tongue. Excuse me.

কথা ক'টি বলেই সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে পানজর্দার কৌটটা আমার দিকে এগিয়ে ধরলেন। স্বর্গত অভিনেতা প্রফুল্ল দাস (হাজুবাবু) ছিলেন আমার পাশে। তিনি বললেন: ওটা তোমার slip of tongue নয় রায়বাহাদুর। ওটা তোমার অভ্যাস। মিস্টারদের চেয়ে ম্যাডামদেরই তুমি বেশির ভাগ সময়ে good evening করে থাকো কিনা, তাই—

হাজুবাবুর কথার উত্তরে একটু এ্যাক্টিং-এর ভঙ্গিতেই আশুবাবু বললেন: সত্য বই মিথ্যা বলিব না। ম্যাডামদের একটু বেশি সমীহ করেই চলি। কারণ নাটক ত' ওঁদের নিয়েই।

আশুবাবুর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আমি বললাম: কেন আপনিই

বা কম কিসে ?

—অনেক কম। আমরা কমা, অথবা সেমিকোলন। ওঁরা আজ 'পোষ্যপুত্র' নাটকে খরখরে 'শিবানী'র মা সাজলেন—আর তারপরের দিন 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকে দ্রৌপদী সাজলেন, তরতর করে চলে গেল! কিন্তু আমি পোষ্যপুত্রে গাঁটকাটা সাজার পর কর্ণার্জ্জুনে কেষ্ট- সাজলেও যে পান্নালাল সেই পান্নালাল! ওঁদের উত্থান আছে অথচ পতন নেই। কিন্তু—

—অর্থাৎ ?

—তা হলে বলি শুনুন, ঢাকায় গিয়েছি প্লে করতে। প্রথম দিন 'পোষ্যপুত্র' নাটকে গাঁটকাটা সেজেছি। আমার অভিনয় দেখে অডিয়ান্স ভারি খুশি। পরের দিন সকালে শহর দেখতে বেরিয়েছি—এই গাঁটকাটার পেছনে অন্ততঃপঞ্চাশটা ফেউ লেগে গেল! কি খাতির তাদের!—এ বলে পান খান, ও বলে চা খান। কেউ বলে ঢাকায় এসেছেন পাতক্ষীর খাবেন না ? অথচ সেইদিন রাত্রে 'কর্ণার্জ্জুন' নাটকে কেষ্ট সেজে যেই বেরিয়েছি—অমনি তারস্বরে তারাই কিনা চিৎকার করে উঠলো—'গাঁটকাটাটা টাকে পরচুলো পইরা কেষ্ট সাজছে।'—বলবো কি এমন চিৎকার করলে যে, আমাকে এ্যাক্টিংই করতে দিলে না! অথচ আগের রাত্রের শিবানীর মা পরের দিন দিব্যি কুন্তী করে গেলেন। কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করলে না! তা মিস্টারদের চেয়ে ম্যাডামদের যদি একটু বেশি খাতির করি সেটা কি অন্যায় ?—আপনিই বলুন ?

আশুবাবু কথার শেষে আমাকে সালিশী মেনে বসলেন। কাজেই বলতে হোল : না না, অন্যায় কি!

॥ নোলা বিভ্রাট ॥

নাটকে পল্লীরমণীদের মুখে একটি গান আছে। গানের লাইন এরূপ :

'ঘরে যাবো না যাবো না,
যাবো না লো !'

ব্যালে মেয়েদের দিয়ে গানটি রপ্ত করাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন অপেরা মাস্টার। সকাল-সন্ধ্যায় রিহার্সাল দেওয়াচ্ছেন। রিহার্সালে চা আর জলখাবারের খরচ বেড়ে গেছে। তা ছাড়া দু'বেলা গাড়ি করে নিয়ে আসা আবার পৌঁছে দেওয়া। ক'টা মেয়ের মুখে একটা গান তুলতে শুধু অপেরা মাস্টারই নন, সেইসঙ্গে মিউজিক স্টাফের দশজন লোককেও কম ভোগান্তি ভুগতে হচ্ছে না। তা ছাড়া গানের সঙ্গে নাচের মাস্টারও আছেন।

গানটা ঘষে-মেজে কোনরকমে যদিও বা খানিকটা রপ্ত হয়ে ওঠে, নাচের পা ফেলতে বা ফিগার করতে গিয়ে গানটা আবার ভুল করে বসে মেয়েরা !

শেষ পর্যন্ত মেয়েদের ভুলের ব্যাপারটা, নাচ আর গানের মাস্টারের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিতে দাঁড়ায়।

গানের মাস্টার বলেন : দুটো একসঙ্গে হবে না। আমি মিউজিকের সঙ্গে গানটা তৈরি করে দিই, তারপর তুমি নাচ কম্পোজ করো।

উত্তরে নাচের মাস্টার বলেন : আমি মিউজিকের সঙ্গে নাচটা ঠিক করেছি—তারপর তোমার গান ঠিক কি বেঠিক তুমি দেখে নাও গে।

—তুমি কি বলতে চাও, শুধু নাচটা হলেই হবে ? গানের দরকার নেই ?

—আমিও তো তোমায় ঐ কথাই বলতে পারি। গানটা হলেই হোল ? নাচের দরকার নেই ?

এমনিভাবেই তর্কাতর্কিটা দুই মাস্টারের মধ্যে শেষ পর্যন্ত চরমে

পৌঁছলো। প্রায় হাতাহাতি হয় আর কি!

যাই হোক, মিউজিসিয়ানরা তখনকার মত দুই মাস্টারকে শান্ত করে। দোষ মাস্টারদের নয়, দোষ মেয়েগুলোর। একটা করতে যায় তো আর একটা ভুল করে বসে। আর মাস্টার দুটি এদের সঙ্গে দিবারাত্র তালিম দিতে দিতে তিতিবিরক্ত। ফলে, এই বিরক্তিই শেষ পর্যন্ত বিরাগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কথাটা মালিকের কানে উঠলো। মালিক প্রথমে গানের মাস্টারকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন: ব্যাপার কি?

উত্তরে গানের মাস্টার বললেন: চা আর জলপানির পয়সা পেয়ে ওদের নোলা বেড়েছে। আজকের দিনটা দেখবো, তারপর দেবো সবক'টাকে বিদেয় করে। ফ্রেস্ ব্যাচ্ নিয়ে আসবো।

মালিক বললেন: আজকের রিহার্সালে আমি থাকবো। দেখবো।

—বেশ তো। তা হলে তো ভালই হয়।

গানের মাস্টার চলে গেলেন।

মালিক এবার নাচের মাস্টারকে ডেকে পাঠালেন। নাচের মাস্টার বললেন: মিউজিকের নোটেশান্ ধরে নাচটা আমি শেখাতে পারি, কিন্তু গানের গণ্ডগোলের জন্যে নাচটা ঠিক করে দিতে পারছি না।

যাই হোক, দুই মাস্টারের কাছে দু'রকম কথা শুনে নিয়ে, থিয়েটারের মালিক সন্ধ্যায় রিহার্সালে এসে বসলেন।

গান শুরু হোল, সেই সঙ্গে নাচও। কয়েক কলি গান আর নাচ চলার পর, গানের মাস্টার থামিয়ে দিলেন। বললেন: আবার ভুল হোল।

সঙ্গে সঙ্গে নাচের মাস্টার বলে বসলেন: আমার ঠিক আছে।

একজন বেঠিক ও অপরজন ঠিক বলায় মালিক গানের মাস্টারকে বললেন: কি ভুল হোল?

—ওদের নোলায় স্যার। এই একটা কথা আমি ক'দিন ধরে ওদের আর ঠিক করাতে পারছি না। গানের লাইনটা হচ্ছে—

ঘরে যাবো না, যাবো না—
যাবো না লো।

আর ওরা বলছে—

ঘরে যাবো না, যাবো না,
যাবো নোলা—

তাইত বলছি স্যার ক'দিনে ওদের নোলাটাকে ঠিক করাতে পারলাম না। এখন আপনি যদি চা আর জলপানিটা বন্ধ করে ওদের নোলাটাকে সংযত করতে পারেন।

গানের মাস্টারের কথায় মালিক হেসে ওঠেন। মেয়েরা লজ্জিত হয় এবং সেই সঙ্গে 'নোলা' সংযমেও সচেষ্ট হয়।

॥ নাট্যলোকের একটি অবিস্মরণীয় কাহিনী ॥

১৮৮০ সালের কথা। শরৎ ঘোষ মশাইয়ের বেঙ্গল থিয়েটার বায়না নিয়ে অভিনয় করতে চলেছে—চুয়াডাঙ্গায়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে আছেন, অমৃতলাল বসু, বনবিহারিণী, সুকুমারী দত্ত (গোলাপী), বিনোদিনী, এলোকেশী আর ভূনী।

ভূনী কিছুদিন আগে বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেছে। তার কোলে তখন ছ'মাসের এক শিশুকন্যা। বিদেশে থিয়েটার করতে যাবে, অথচ বাড়িতে তার এমন কেউ নেই যে, ঐ শিশুকন্যাটির রক্ষণাবেক্ষণের ভার নেয়। তাই বাধ্য হয়েই কন্যাটিকে নিয়ে অভিনয় করতে চলেছে ভূনী—চুয়াডাঙ্গায়।

থিয়েটারের মালিক শরৎ ঘোষ মশাইয়ের জ্ঞাতি ভ্রাতা উমিচাঁদবাবু ছিলেন করিৎকর্ম্মা লোক। তাই শরৎবাবু বিদেশে দলবল নিয়ে যাবার সময় তাঁকে দলে টেনেছেন। উমিচাঁদবাবুর বাড়ি থেকে আপত্তি উঠেছিল—চুয়াডাঙ্গায় যাওয়ার। কিন্তু তাঁর মা-কে গিয়ে অনেক করে

বলে-কয়ে রাজী করিয়েছেন শরৎবাবু।

গরম কাল। বেঙ্গল থিয়েটার যেদিন চুয়াডাঙ্গা যাত্রা করেন সেদিন আবার ছিল অসহ্য গরম। শিয়ালদহ থেকে গাড়ি ছাড়লো। সকলে নির্বিঘ্নে গাড়িতে আসন দখল করে বসলেন। ঘণ্টা দুই বাদে একটা বড় স্টেশনে এসে গাড়ি থামলো। (বোধহয় রাণাঘাট) সকলে খাওয়ার জন্যে বায়না ধরলেন। উমিচাঁদবাবু ছুটলেন খাবার কিনতে। বেশ মোটাসোটা স্বাস্থ্যবান মানুষ ছিলেন উমিচাঁদবাবু। তাই এই অসহনীয় গরমে তিনি ঘেমে নেয়ে উঠেছেন। কিন্তু তা বললে কি হয়? গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্টেশনের বাইরে চলে গেছেন, খাবার কিনতে।

বড় স্টেশন। গাড়ি মিনিট দশেক থামে। কিন্তু অতগুলো লোকের খাবার কিনতে কিনতে বেশ দেরি হয়ে গেল উমিচাঁদবাবুর। শেষ পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করে, কোন রকমে খাবার কিনে নিয়ে এসে চলন্ত গাড়িতেই ঝাঁপিয়ে উঠে পড়লেন। গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে গেলেন উমিচাঁদবাবু। সকলে ব্যস্ত হয়ে বাতাস করতে লাগলেন। "জল" "জল" বলে ব্যস্ত হলেন কেউ কেউ। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য, সারা গাড়িতে এমন কি পায়খানার কলেও জল মিললো না।

মেল ট্রেন। যেখান থেকে ছেড়েছে, তারপর একেবারে চুয়াডাঙ্গায় গিয়ে থামবে। সকলে মুষড়ে পড়লেন। জলের অভাবে কি মানুষটা মারা যাবে? অমৃতবাবুর সহসা মনে পড়ে গেল—ভূনীর কোলে তার শিশু সন্তানের কথা। কোন উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত অমৃতবাবু ভূনীকে ঝিনুকে করে স্তনদুগ্ধ দিতে বললেন। অমৃতবাবুর নির্দেশে ভূনী স্তনদুগ্ধ দান করলো। উমিচাঁদবাবুর মুখে সেটুকু কোন রকমে দেওয়াও হোল। কিন্তু উমিচাঁদবাবুকে বাঁচানো গেল না। কস্ বেয়ে গড়িয়ে পড়লো দুধটুকু।

উমিচাঁদবাবু ছিলেন শরৎবাবুর একাধারে আত্মীয় এবং বন্ধু। তিনি শিশুর মত কেঁদে উঠলেন। কলকাতায় ফিরে গিয়ে কি জবাবদিহি করবেন তিনি উমিচাঁদবাবুর মায়ের কাছে? সান্ত্বনা দিয়ে শরৎবাবুকে

শান্ত করা গেল না। তিনি চেন টেনে গাড়ি থামাতে চাইলেন। অমৃতবাবু কোন রকমে তাঁকে প্রতিনিবৃত্ত করে বললেন—'চেন টানলে আরো বিপদে পড়তে হবে। মৃতের খবর গেলে, পরের ছোট স্টেশনেই হয়ত শব নামিয়ে দেবে। ফলে, সৎকার করার অসুবিধা হবে।'

অমৃতবাবুর যুক্তি সকলে মেনে নিলেন। গাড়ি চুয়াডাঙ্গা স্টেশনে এসে থামলো। বেঙ্গল থিয়েটার সদলবলে স্টেশনে প্লাটফরমে এসে নামলেন; আর সেই সঙ্গে ধরাধরি করে নামানো হোল—উমিচাঁদবাবুর প্রাণহীন দেহটাকে।

সেদিন আর অভিনয় হোল না। মঞ্চ আঁধারে ঘিরে রইলো। আর তার পরিবর্তে উমিচাঁদবাবুর চিতার আগুন প্রোজ্জ্বল করে তুললো শশ্মানকে।

পেশাদারী থিয়েটারের গোড়ার যুগে উমিচাঁদবাবুর পথে-প্রবাসে মৃত্যুর এই কাহিনী হয়ত মানুষ এতদিনে ভুলে যেত, কিন্তু ভূনীর স্তন-দুগ্ধ দানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তটি "চন্দ্রার্কো যত্র সাক্ষিণঃ"র মতই এ কাহিনীকে বাঁচিয়ে রেখেছে—সেইসঙ্গে উমিচাঁদবাবুকেও।

॥ এক বিত্তহীন সার্থক শিল্পী ॥

তুলসী চক্রবর্তী। রঙ্গজগতের একটি অবিস্মরণীয় নাম। যিনি পাঁচ দশকেরও অধিককাল রঙ্গজগতের সেবা করে গেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। নাটকে এবং ছবিতে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি এখনো মাঝে মাঝে নয়নপথে ভেসে ওঠে। তুলসীদা ছিলেন জাত-শিল্পী। অভিনয়ে, নাচে, গানে এমনকি যন্ত্রী হিসাবেও তিনি ছিলেন পারদর্শী। এতগুলো গুণ একজন শিল্পীর মধ্যে আমি খুব কমই দেখেছি। সদাহাস্যময় রঙ্গজগতের এই মানুষটির মধ্যে কোন মালিন্য ছিল না। অভিনয় জগতে তুলসীদা ছিলেন এক দুর্লভ ব্যক্তি। যা আজকের দিনে সচরাচর চোখে

পড়ে না। তাঁর অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রার সঙ্গে ছিল উচ্চ চিন্তা। তাঁকে কখনও পরনিন্দা বা পরচর্চা করতে দেখিনি, বরং গুণী ব্যক্তির সুখ্যাতিতে তিনি পঞ্চমুখ হয়ে উঠতেন। আমার সঙ্গে তুলসীদার পরিচয় ১৯৪৪ সাল থেকে। 'রামের সুমতি' নাটকে ভোলার ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেন। সে-সময় মহলায় তুলসীদাকে একদিন কথায় কথায় বলেছিলাম, ভোলা আর রামলাল প্রায় সমবয়সী। শরৎচন্দ্র 'রামের সুমতি'তে সেই কথাই লিখে গেছেন। কিন্তু এই ডানপিটে রামলালকে সামলে নিয়ে চলার জন্যে আমি ভোলাকে প্রৌঢ়বয়স্ক রূপে চিত্রিত করেছি। কিন্তু তাই বলে ভোলাকে গম্ভীর প্রকৃতির লোক হিসেবে চিত্রিত করিনি। চেষ্টা করছি, বয়স ভোলার যাই হোক না কেন, মনের দিক থেকে সে রামলালের মতই চঞ্চল, সরল গ্রাম্যব্যক্তি। আমার কথাগুলো শুনে, সেইদিন থেকে তুলসীদা চরিত্রটিকে নতুনভাবে রূপ দিতে শুরু করলেন। এতদিন যেভাবে মহলা চলছিল—তার পরিবেশটা যেন সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। ভোলার চরিত্রটিকে সরল গেঁয়ো মানুষরূপে জীবন্ত করে তুললেন। শুধু তাই নয়, সে সময় মহলায় তিনি হরিহরের গানের সঙ্গে নাচের পরিকল্পনা করে, নিজে নেচে শিক্ষাদানও করেছিলেন। এর পর থেকে একাধিক নাটকে ও ছায়াছবিতে তাঁকে নিয়ে কাজ করার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল।

'শ্যামলী' নাটকের শেষের দিকে অর্থাৎ ১৯৫৫ সালে তাঁকে স্টার থিয়েটারে নিয়ে আসি। শেষ জীবনে সুদীর্ঘ আট বৎসরকাল তুলসীদা স্টার থিয়েটারে কাজ করেছেন। স্টার থিয়েটারেই তুলসীদার কর্মজীবনের শুরু এবং শেষ।

চোদ্দ কি পনেরো বছর বয়সে তুলসীদা স্টার থিয়েটারে শিল্পী হিসেবে কর্ম শুরু করেছিলেন। তার আগে এক সার্কাস-এর দলে বছর খানেক প্যারালাল বারের খেলোয়াড় হিসেবে রেঙ্গুনে যান। অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হয়ে, জ্যাঠামশায়ের কাছে লালিত-পালিত হন তুলসীদা। পড়াশোনায় বিশেষ মন ছিল না। ছেলে বয়েস থেকে

গান, বাজনা, অভিনয়ের দিকে যেমন ঝোঁক ছিল, তেমনি পাড়ার আখড়ায় নিয়মিত যেতেন শারীরিক কসরৎ করতে। খুব অল্পদিনের মধ্যে প্যারালাল বারের খেলায় সকলকে চমৎকৃত করেন। শেষ পর্যন্ত এক সার্কাস পার্টির কর্মকর্তা তাঁর খেলা দেখে, তাঁকে দলভুক্ত করে নেন। তুলসীদা কাউকে কিছু না বলে চুপি চুপি সার্কাস-এর দলের সঙ্গে রেঙ্গুনে পাড়ি দেন। বছর খানেক পর ঐ দল কলকাতায় ফিরে এলে, তুলসীদার জ্যাঠামশাই তাঁকে ধরে নিয়ে আসেন এবং স্টার থিয়েটারে শিক্ষানবীশ শিল্পী হিসাবে ঢুকিয়ে দেন। এই হচ্ছে তুলসীদার শিল্পী-জীবনের আদি পর্ব বা গোড়ার কথা।

যে সময়ে তুলসীদা থিয়েটারে ঢোকেন, সে-সময় থিয়েটার আরম্ভ হওয়ার পূর্বে কনসার্ট বাজত। এই কনসার্ট এর দলের কর্তা ছিলেন তুলসীদার জ্যাঠামশাই। তুলসীদা কখনো নির্বাক সৈন্য, কখনো বা নির্বাক গ্রামবাসী, কখনো বা বোরাসের দলের গায়ক হিসাবে মঞ্চে অবতরণ করতেন। মাইনে ছিল মাসিক আট টাকা। এই সময়ে নিজের কাজ ছাড়া, তুলসীদা সব সময়ে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে উইংস-এর ধারে বসে দেখতেন, কে কেমন অভিনয় করছেন। এইভাবে তাঁর অভিনয়-শিক্ষা শুরু হয়। এরই মধ্যে হঠাৎ তাঁর জীবনে একদিন সবাক ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ এল। 'দুর্গেশ-নন্দিনী' নাটকে হকিমের ভূমিকায় যাঁর অভিনয় করার কথা, তিনি না আসায় থিয়েটারের কর্তাব্যক্তিরা তুলসীদাকে বললেন—কি হে ছোকরা! খুব তো উইংসের ধারে বসে মন দিয়ে অভিনয় দেখো, হকিমের পার্টটা করতে পারবে? তুলসীদা সাহসের সঙ্গে বলে বসলেন—পারব। সেদিন নবাব আর দলনী বেগমের ভূমিকায় অভিনয় করছিলেন পালিত সাহেব ও তারাসুন্দরী। প্রথম সবাক অভিনয়ে তুলসীদা কিন্তু কৃতকার্য হলেন না। স্টেজে নেমে নার্ভাস হয়ে গিয়ে উল্টোপাল্টা সংলাপ বলে ফেললেন। হকিমের কথা ছিল—'আর চিন্তা নাই বেগম সাহেবা, নবাব সাহেব এ যাত্রায় রক্ষা পেয়েছেন।' কিন্তু তুলসীদা বলে ফেললেন—'আর

রক্ষা নাই বেগম সাহেবা, নবাব সাহেব এ যাত্রায় চিন্তা পেয়েছেন।' তুলসীদার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকেরা হেসে উঠলেন। তারাসুন্দরী সিন থেকে বেরিয়ে এসে বললেন—দুটো কথাই যদি গোছ করে বলতে পারবে না, তো এখানে এসেছ কি জন্যে? আর পালিত সাহেব তো চিৎকার করে বলে বসলেন—কোথায় গেল সে হারামজাদা। পালিত সাহেবের কথা শুনে হকিমের দাড়ি-গোঁফ আর সাজ-পোশাক নিয়ে পাঁচিল টপকে তুলসীদা পিটটান দিয়েছিলেন সেদিন বাড়িতে। তুলসীদা বলতেন—পালিত সাহেব খুব রাশভারি লোক ছিলেন। সকলেই তাঁকে ভয় করত। এমনি করে অনেক গালাগালি খেয়ে, অনেক লাঞ্ছনা ও অপমান সয়ে তুলসীদার শিল্পী-জীবন গড়ে উঠেছিল। সেকালের থিয়েটারের অনেক কাহিনী শুনেছি তুলসীদার মুখে। যা শুনে মনে হয়েছে, অর্থের মোহে নয়—অভিনয়েব প্রতি অনুরাগবশতঃই সেদিন অনেকেই অর্ধাহারে, অনাহারে মঞ্চ-শিল্পীরূপে জীবন কাটিয়ে গেছেন।

স্টার থিয়েটারের গ্রীনরুমের লবীতে তুলসীদা গানে, গল্পেই শিল্পীদের মাতিয়ে রাখতেন। এই রকম এক মজলিশি আসরে তুলসীদাকে একদিন বলেছিলাম—অনেকদিন তো কাজকর্ম নিয়েই কাটালেন, এবার বৌদিকে নিয়ে দিনকতক তীর্থ দর্শন করে আসুন না? আমার কথাটা শুনে, বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর বললেন—তুমি এই কথা বলছ ভাই? বললাম—বলছি বই কি! উত্তরে তুলসীদা বললেন—এর চেয়ে বড় তীর্থ আর আছে নাকি? এই যে স্টার থিয়েটার এর ওপরে আশীর্বাদ আছে ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের। এই বাড়িতে এসেছেন স্বামীজী, সিস্টার নিবেদিতা, মঠের সন্ন্যাসীরা, এসেছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে দেশের বড় বড় কবি সাহিত্যিকেরা। তাছাড়া দিনের পর দিন, কত ভাল কথা শোনানো হয়েছে মানুষকে। তাই বলছিলাম, এর চেয়ে বড় তীর্থ আর আছে নাকি? জ্যাঠামশাইয়ের হাত ধরে, কৈশোর পেরিয়ে এখানে এসেছিলাম। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, শেষ জীবনটা এখানে কাটিয়েই যেন যেতে পারি।

তুলসীদার শেষ কামনা পূর্ণ হয়েছিল। এখানে কাজ করতে করতেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর সুদীর্ঘ নট-জীবনে তিনি অসংখ্য নাটকে এবং ছায়াছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করে গেছেন। হাসি-কান্নায় তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। শৃঙ্খলাবোধ ছিল তাঁর অপরিসীম। কখনও তাঁকে দেরি করে আসতে দেখিনি। মহলার প্রতি ছিল তাঁর অত্যন্ত নিষ্ঠা। বলতেন—মহলায় ঠিকমত হাজিরা না দিলে, আগাগোড়া মহলা না দেখলে, আমার চরিত্রটার যথাযথ রূপ দিতে পারব কেন?

শেষ জীবনে তুলসীদা হাওড়ায় ছোটখাট একটা বাড়ি করেছিলেন। একদিন মহলার শেষে দেখি, তুলসীদা যথারীতি বসে আছেন। অথচ তাঁর পার্ট শেষ হয়েছে—দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে। তুলসীদাকে এতক্ষণ বসে থাকতে দেখে নিজেকে বিব্রত বোধ করলাম। বললাম—তুলসীদা, আপনি বসে কেন? উত্তরে তুলসীদা বললেন—তুমি তো আমাকে যেতে বলনি ভাই। তুলসীদাকে বৃদ্ধ বয়সে এতক্ষণ বসে থাকতে দেখে প্রথমে বিব্রত বোধ করেছিলাম, এতক্ষণে তুলসীদার কাছে জবাব পেয়ে লজ্জিত বোধ করলাম। এরপর থেকে তুলসীদার পার্ট হয়ে গেলেই তাঁকে চলে যেতে বলতাম। যে শৃঙ্খলাবোধ তুলসীদার মধ্যে দেখেছি, আজকের দিনে তা দুর্লভ বস্তু।

তুলসীদা ছিলেন নিঃসন্তান। স্ত্রী এবং বড়ভাইয়ের বিধবা স্ত্রী এই নিয়ে ছিল তার ছোট্ট সংসার। আর ছিলেন নারায়ণ শিলা। এই গৃহদেবতার নিত্য পূজা হত সাড়ম্বরে। এক নিষ্ঠাবান পুরোহিত এই গৃহদেবতার পূজার জন্য নিযুক্ত ছিলেন। এই পূজারী ব্রাহ্মণকে তুলসীদা বলতেন—গুরুদেব। গুরুর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। আর শখ ছিল পাখী পোষার। নানা রকমের পাখী ছিল তাঁর বাড়িতে। এই পাখীদের আহার্য সংগ্রহ করা এবং নিত্য নিজে বাজার করা, এটা ছিল তাঁর নিয়মিত সাংসারিক কার্যের অন্যতম। এক অভিনয়ের দিনে তুলসীদা গ্রীনরুমের লবীতে যথারীতি আসর জাঁকিয়ে

বসে আছেন, তাঁর পাশের আসনটি দখল করে বসে বললাম—আজ কি. বাজার করলেন? তুলসীদা বললেন—আর বল'না ভাই, বড্ড হয়রানি হতে হয়েছে আজ বাজারে গিয়ে—

—কেন?

—ফুল,-কিনতে গিয়ে দেখি কোথাও কর্তাপাতা নেই।

—কর্তাপাতা?

—হ্যাঁ। বল তো ভাই, কর্তাপাতা না হলে কি নারায়ণের পূজা হয়?

স্নুলালদা (স্বর্গত জহর গাঙ্গুলী) বসে ছিলেন তুলসীদার অপর পাশে। হো হো করে হেসে উঠে বললেন—ওর বউ তো তুলসী-কথাটা উচ্চারণ কবতে পারে না, তাই বলে কর্তাপাতা। আমাদের কাছে সেই কথাটা কেমন কায়দা করে জানিয়ে দিলে দেখছেন তো। এমনিতর রসিকতায় গ্রানরুমের লবীটি প্রতিদিনই হাস্যমুখর করে তুলতেন তুলসীদা!

এক অভিনয়ের দিনে নীচে গেছি, দেখি, তুলসীদা স্টেজে যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন—এখন একটু নীচেয় আছ তো ভাই, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। বললাম—আছি। আপনি সিনটা সেরে আসুন। কথাটা কি খুব জরুরী?

—না না। কথাটা শুনলে তুমি খুব খুশী হবে।

তুলসীদা সিন সেরে ফিরে এলেন। জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার?

—তোমাকে সুখবরটা না জানিয়ে স্বস্তি পাচ্ছিনে ভাই। বুড়ো বয়েসে সত্যজিৎবাবুর ছবিতে মস্ত বড় একটা কাজ পেয়েছি। হিরোও বলতে পার। পুরনো ডিরেক্টরদের কাছে যা পাইনি, এ যুগের নতুন ডিরেক্টরের কাছে তাই পেলাম।

তুলসীদা প্রায়ই অধিকাংশ ছবিতে কাজ করতেন। কিন্তু তা দু-একদিনের সাইড রোল। টাকার তাঁর চাহিদা ছিল না। যাঁর কাছে

যা পেতেন সন্তুষ্ট চিত্তে তাই নিতেন। তাঁর রেট বলে কিছু ছিল না। ছিল কাজের দিকে ঝোঁক। অনেক সময় বলতেন—শিল্পীকে দর্শকের সামনে থাকাটাই বড় কথা। দর্শকের চোখের আড়াল হলে, শিল্পীর জীবনে আর রইল কি! সে তো জীবন্মৃত। কথাটা খুবই সত্যি। সত্যজিৎবাবুর ছবিতে শেষ জীবনে একটা বড় ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ পেয়ে তুলসীদা ভারী খুশী হয়েছিলেন। তুলসীদাকে শেষ জীবনে কেউ যদি জাত-শিল্পী হিসাবে মর্যাদা দিয়ে থাকেন, তো সে সত্যজিৎবাবু।

সারা জীবনব্যাপী অভিনয় করে, তুলসীদা কোন অর্থ-সঞ্চয় করে রেখে যেতে পারেন নি বটে, কিন্তু অগণিত দর্শকের মানস-পটে তিনি তাঁর শিল্প-কীর্তিতে এক মহান শিল্পীরূপে আজও বেঁচে আছেন।

॥ মাঠ ও মঞ্চ ॥

রঙমহলে 'নিষ্কৃতি' নাটকের অভিনয় চলছে। প্রতিটি শো প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ অর্থাৎ হাউস ফুল। নাটকের সুখ্যাতি হয়েছে, আর তার সঙ্গে নাটকের গিরীশ ও সিদ্ধেশ্বরী ভূমিকায় যথাক্রমে জহর গাঙ্গুলী আর প্রভা দেবীর অনবদ্য অভিনয়ের কথা দর্শকদের মুখে মুখে ফিরছে।

সেদিন শনিবার। বেলা ৩টার মধ্যেই হাউস ফুল হয়ে আছে। আর ওদিকে সেদিন লীগের বড় খেলা। মোহনবাগান আর মহামেডান স্পোর্টিং। আমার বুক ঢিপঢিপ করছে। আজ ড্রপ উঠতে দেরি হবে। হারলেও দেরি, জিতলেও দেরি। এর কোন ব্যতিক্রম হবে না। তবে মোহনবাগান যদি জেতে তো অভিনয়টা যথাসময়ে শুরু হলেও হতে পারে। কারণ ?—কারণ, দুলালদা অর্থাৎ জহর গাঙ্গুলী মোহনবাগান ক্লাবের শুধু সাপোর্টার নন, দুলালদা ক্লাবের একজন মুরুব্বি। মুখ শুকিয়ে আছে চিন্তায়। ঘোরাঘুরি করছি গ্রীণরুমের আশেপাশে। প্রভা দেবীর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই একটা পান এগিয়ে দিয়ে বললেন,

'খান, পান খান। ভেবে আর কি হবে? পাঁচদশ মিনিট লেট আজ হবেই ড্রপ উঠতে।'

—পাঁচদশ মিনিট হলে তো বাঁচি। তার বেশী হলেই তো দর্শকদের গালাগালি শুনতে হবে।

—দর্শকেরা জানে স্বলালবাবু মোহনবাগানের লোক। অডিটোরিয়াম কি ভর্তি হয়ে আছে?

—ভর্তি হয়ে আছে। তবে অনেকেই এখনো আসেননি। আধা-আধি ফাঁকা।

—তবে আবার কিসের ভাবনা? বলে দেবেন হাউস ফুল। দর্শকেরা খেলার জন্যে এখনো এসে পৌঁছুতে পারেননি, সেইজন্যে আমরা অপেক্ষা করছি।

প্রস্তা দেবার এ যুক্তি আমাকে চিন্তামুক্ত করার জন্যে। ওর মধ্যে কোন যুক্তি নেই। তাই বললাম, 'ধরুন, যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ যদি বলেন, তাতে আমাদের কি? তাঁদের জন্যে আমরা ভোগান্তি ভুগতে যাব কেন?'

সহসা পেছন থেকে কে আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললে, কিচ্ছু ভুগতে হবে না। মাভৈঃ। ড্রপ তুলুন।

ফিরে দেখি স্বলদাদা। প্রাণ-চঞ্চল মানুষটি আজ খুশীতে ভরপুর। জিজ্ঞেস করলাম, রেজাল্ট? উত্তর এলো, থ্রী টু নীল।

আমার নীলবর্ণ ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। নিশ্চিন্ত মনে লম্বা লম্বা পা ফেলে নিজের ঘরে চলে এলাম। মাঠমুখো আমি কোনদিন হইনি। তবুও মনে মনে বললাম, ঠাকুর মুখ রেখেছো। এ জয় শুধু মাঠের নয়—মঞ্চেরও।

মাঠের মানুষ মঞ্চে থাকার কি জ্বালা বলুন তো? মোহনবাগান সেদিন হারলে আমি হয়তো মাঠে-মারা যেতাম।

॥ জনৈকা অভিনেত্রীর বিড়ম্বিত জীবন-কাহিনী ॥

শৈশবেই মাতৃহারা হল মেয়েটি। মুখে তখনও তার ভাল করে কথা ফোটেনি। সবেমাত্র পৃথিবীর আলো-আঁধারের অঞ্জন তার চোখে লেগেছে। মেয়েটির বাবা মেয়েটিকে নিয়ে বড়ই বিব্রত হয়ে পড়লেন। আত্মীয়-স্বজনেরা কেউই এগিয়ে এল না মেয়েটির ভার নিতে। মেয়েটির বাবা ছিল উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির তাই আত্মীয়-স্বজনেরা সকলেই তার প্রতি বিরূপ ছিল। স্ত্রীর প্রতি কোন কর্তব্যই সে যথাযথ পালন করেনি। সে যুগের এক নাম-করা অভিনেত্রীর ঘরে যাতায়াত ছিল ভদ্রলোকের। অভিনেত্রীটি ছিল নিঃসন্তান। ভদ্রলোকের কাছে মাতৃহারা মেয়েটির কথা জানতে পেরে, অভিনেত্রী মেযেটিকে মানুষ করতে চাইল। ভদ্রলোক যেন অকূলে কূল পেলেন। শিশুকন্যাকে এনে দিলেন অভিনেত্রীর কাছে। সন্তানের স্নেহে মানুষ হতে লাগল মেয়েটি। স্নেহ-যত্ন আর ঐশ্বর্যের মধ্যে দিনে দিনে বড় হতে লাগল। ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত হলেন—মেয়েটির সব দায়-দায়িত্ব অভিনেত্রীব হাতে তুলে দিয়ে।

সন্তানের অভাবে অভিনেত্রীটির যে হৃদয় এতকাল মরুভূমির মত খাঁ-খাঁ করত, এখন মেয়েটির মা হয়ে তার সে হৃদয় শুধু পরিপূর্ণই হল না, সেই সঙ্গে এই মেয়েটিকে ঘিরে দিনের পর দিন সে আশার জাল রচনা করে চলল। মেয়ের সে বিয়ে দেবে, জামাই আসবে, একঘর নাতি-নাতনী হবে। এমনি কত কি!

দেখতে দেখতে মেয়েটি দশ পূর্ণ হয়ে এগারো বছরে পড়ল। মা মনে মনে ঠিক করলেন, এই সময় মেয়েটির বিয়ে দিয়ে গৌরীদানের পুণ্য-সঞ্চয় করবেন। একটি সৎপাত্রের খোঁজ করতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত সৎপাত্রের সন্ধানও মিলল। কাশীতে পাত্রের পৈতৃক বাড়ি। চাকরি করে। অবস্থা মোটামুটি মন্দ নয়। মাতৃহৃদয়ের এতদিনের আশা পূর্ণ হল। অতীত ইতিহাসের সব কিছু জেনে-শুনেই তাঁরা রাজী হয়েছেন। সব দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনার হাত থেকে যেন রেহাই পেলেন অভিনেত্রীটি। পরের সন্তানকে মানুষ করার দায়-দায়িত্ব তো বড় কম নয়! সদ্বংশে

যার জন্ম, তাকে কি অজাত-বেজাতের হাতে সমর্পণ করা যায়? মায়ের যথা-কর্তব্য পালন না করেই কি মা হওয়া যায়? এতদিন পলে পলে তিলে তিলে তিনি যে শুভমুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করছিলেন, অবশেষে বহু-প্রতীক্ষিত সেই শুভক্ষণটি এল। মহাসমরোহের সঙ্গে কন্যাদান করলেন অভিনেত্রীটি। গা-সাজানো এক-গা গয়না, নগদ টাকা, তৈজস-পত্র, জামা-কাপড় কোন কিছু দিতেই কার্পণ্য করলেন না। অবস্থাপন্ন লোকের মেয়ের বিয়ে সাধারণতঃ যেমন ঘটা করে হয়, তেমনি ঘটা করেই তিনি পালিতা-কন্যার বিবাহ দিলেন। বর-কনেকে অশ্রুজলে বিদায় দিয়ে শূন্য মাতৃহৃদয় যেন হাহাকার করে উঠল। বিদায়কালে জামাইয়ের হাত দুটি ধরে জানালেন—'এক একবার এসে চোখের দেখা দেখিয়ে যেও বাবা। আমার যে আর কেউ নেই!'

কন্যাদান করলেন পাতানো মা, কিন্তু আশ্চর্যের কথা, মেয়ের বাপের দেখা নেই। লোক দিয়ে বহুবার খবর পাঠিয়েছিলেন অভিনেত্রী, কিন্তু আসেনি। মেয়েটিকে অভিনেত্রীর হাতে সমর্পণ করার পর প্রথমদিকে দু-একবার এসেছিলেন মেয়ের খোঁজখবর নিতে। কখনও কখনও মেয়ের জন্যে এটাসেটা হাতে করেও এসেছেন, কিন্তু অভিনেত্রীর মাতৃহৃদয় যখন কানায় কানায় ভরে উঠেছে, ঠিক সেই সময় থেকেই তিনি আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন।

মেয়ে বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অভিনেত্রীরও জীবনের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগের চেয়ে এখন তিনি অনেক সংযমী হয়ে উঠেছেন। তাই মেয়েটিকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে এখন যেন তাঁর আর সময় কাটতে চায় না। থিয়েটারের দিন থিয়েটার করা অথবা ছবির শ্যুটিং থাকলে স্টুডিও যাওয়া ছাড়া সব সময়েই যে তাঁর মেয়েকে নিয়ে কাটত। মেয়ে খেয়ে-দেয়ে স্কুলে যাবে তার ব্যবস্থা করা, স্কুল থেকে ফিরে এলে জলখাবার খাওয়ানো, চুল বেঁধে দেওয়া, পড়ার মাস্টার চলে গেলে গানের মাস্টার আসবে—তার চায়ের ব্যবস্থা করা—খুঁটিনাটি এমন কত কাজের মধ্যে দিয়েই না তাঁর দিন কাটত। এমন মেয়েকে

শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে নিঃসঙ্গ একা! থেকে থেকে বুকের ভেতরটা যেন খাঁ-খাঁ করতে থাকে। কখনও বা মেয়ের কথা ভাবতে-ভাবতে বিভোর হয়ে যান। মেয়ে-জামাই আসবে, মেয়ের ছেলে-মেয়ে হবে। নাতি-নাতনীদের নিজের কি কি গহনা দিয়ে মুখ দেখবেন—এমন কত কি সুখ-স্বপ্নে মধ্যে মধ্যে মনটা ভরে ওঠে।

বিয়ের মাস দুই বাদে একদিন মেয়ে এসে হাজির হল। কিন্তু একি! গা-ভর্তি এক গা গয়নায় সাজিয়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়েছিলেন, তার একটাও যে নেই। একেবারে শাঁখা-সার করে ছেড়েছে। মাকে জড়িয়ে ধরে মেয়ে কেঁদে ওঠে। 'ওরা আমার সব গয়না কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওখানে আর আমি যাব না মা! তোমার কাছেই থাকব।' মা মেয়েকে শান্ত করে বলেন—'তা কি হয় মা! স্বামীর ঘরই যে তোমার নিজের ঘর।'

জামাই ও তার অভিভাবকদের চিঠি লিখলেন অভিনেত্রী। অনেক অনুনয়-বিনয় করে। উত্তর এল 'সাংসারিক প্রয়োজনেই গহনাগুলো নিতে হয়েছে। ছেলেমানুষ! মেয়েকে একটু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলবেন, সংসারের সুরাহা হলে, এক-আধখানি করে গহনা আবার আমরা গড়িয়ে দেব।'

মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে চিঠি আসার পর অভিনেত্রীটি আশ্বস্ত হলেন। সংসারের অভাব-অনটনে অনেকেই তো সোনা-দানা বিক্রী করতে বাধ্য হয়। যাই হোক, অভিনেত্রী আবার দুটি-একটি গহনা গড়িয়ে দিলেন মেয়েকে। মেয়ে আসার মাস দুয়েক পরে একদিন জামাই এসে হাজির হল। লোলুপ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চেয়ে দেখে, আবার দু-একটা গয়না উঠেছে তার অঙ্গে। শাশুড়ীকে বলে—'মা! আপনার মেয়েকে নিতে এসেছি।' জামাইয়ের কথায় মা আশ্বস্ত হন। মেয়েকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আবার শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দেন।

কিছুদিন পরে মেয়ে আবার ফিরে আসে সব গহনা ঘুচিয়ে নোয়া-শাঁখা হাতে নিয়ে। মেয়ে এসে এবার জানায়—'এরা শুধু গহনা কেড়ে

নিয়েই দূর করে দেয়নি, সেই সঙ্গে মারধোরও করেছে। স্বামীটা যে মাতাল-চরিত্রহীন-লম্পট, মেয়েটি তার মায়ের কাছে তাও প্রকাশ করে অকপটে। এখন তারা নাকি বলে—নিজের মেয়েকে ব্রাহ্মণের মেয়ে বলে জোচ্চরি করে বিয়ে দিয়েছে। নালিশ করবে বলে শাসায়। অত্যাচার করে মেয়েটার ওপর। এ মেয়েকে যদি ব্রাহ্মণের সংসারে স্থান দিতে হয়, তাহলে টাকা চাই—আরো টাকা!

আরো টাকা! অভিনেত্রী ভাবতে থাকেন। টাকা দিলেই যদি মেয়েটার স্বামীর ঘর বজায় থাকে তো দেব টাকা। যত টাকা লাগে। টাকা ঘুষ দিয়ে আবার মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠান অভিনেত্রী। জামাই আসে। টাকা ট্যাঁকে গুঁজে, বৌকে নিয়ে চলে যায়। কিন্তু টাকার বিনিময়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে উল্টো ফল হল। এরপর মেয়ের ওপর চলতে লাগল অকথ্য অত্যাচার, আর সেই সঙ্গে টাকার দাবী আসতে লাগল। অবশেষে অভিনেত্রী মেয়েকে সুখী করার সব আশা ত্যাগ করলেন, নিয়ে এলেন নিজের কাছে।

স্নেহ নিম্নগামী। পরের মেয়েকে স্নেহ-মমতা উজাড় করে মানুষ করার যন্ত্রণা দিবারাত্র ভোগ করতে লাগলেন অভিনেত্রী। অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে ঠিক করলেন মেয়েকে নার্সিং শেখাবেন। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে মেয়েটা যাতে জীবিকা-নির্বাহ করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে তো। চেনা-শোনা লোকদের সুপারিশে কোনরকমে মেয়েকে নার্সিং-এর কাজে ঢুকিয়ে দিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নার্সিং শেখা মেয়েটির পক্ষে সম্ভব হল না। কিছুদিন যাওয়া-আসা করার পর মাকে বললে—'আমি ও কাজ পারব না।' সকলের পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব হয় না। মেয়েটির পক্ষেও নার্সিং শেখা সম্ভব হল না। অভিনেত্রী তখন মেয়েকে গান-বাজনা শেখাতে লাগলেন। গানের গলাটা মোটামুটি মন্দ ছিল না। গান শেখার সঙ্গে সঙ্গে টেবিল-অর্গ্যান বাজানোটাও সে রপ্ত করে নিয়েছিল খুব সুন্দর ভাবে।

এর কিছুদিন পরে মেয়েটি মিনার্ভা থিয়েটারে সখীর দলে ভর্তি হল।

মাস-মাইনে পনেরো টাকায়। কিছুদিন কাজ করার পর, সখীর দলে নাচতে তার আর ভাল লাগল না। কাজ ছেড়ে দিল। মেয়ের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিরুদ্ধে অভিনেত্রী কিন্তু কোন কথাই বলেন না। মেয়ের কাছে সব সময় তিনি নিজেকে অপরাধী বলে মনে করেন। তাঁর মনে হয়, গৌরীদানের বাসনা মেটাতে গিয়ে মেয়েটার জীবনে তিনিই বিপর্যয় ডেকে এনেছেন। তাই মেয়ে যেদিন স্বেচ্ছায় মিনার্ভা থিয়েটারে চাকরি নিয়েছিল, সেদিন তিনি যেমন কোন আপত্তি করেননি, তেমনি চাকরি ছেড়ে দেওয়াতেও তিনি দুঃখিত হননি।

মিনার্ভার চাকরি ছেড়ে সুদীর্ঘকাল ঘরে বসে গান-বাজনা নিয়ে দিন কাটিয়েছে মেয়েটি। থিয়েটার করা তো দূরের কথা, এর মধ্যে থিয়েটার দেখতেও যায়নি কোনদিন। মা ভাবলেন, মেয়ের থিয়েটার করার শখ বোধহয় চিরতরে ঘুচল। কিন্তু না—১৯২২ সালে সে আচার্য শিশির-কুমারের দলে যোগদান করল। ময়দানে এক্জিবিশানে শিশিরকুমার দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা' নাটকের অভিনয় করেন। মেয়েটিও সেই নাটকে অংশগ্রহণ করে।

এরপর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সে মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিল। নাট্যমন্দির, শ্রীরঙ্গম, রঙমহল, কালিকা প্রভৃতি থিয়েটারে সে বহু নাটকে অংশগ্রহণ করে তার অভিনয়-প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে তার একটি গুণের কথা উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার একবার তাঁর সম্প্রদায় নিয়ে ঢাকায় অভিনয় করতে গেছেন। 'সীতা' নাটকের অভিনয় হবে। কিন্তু যিনি অর্গ্যান বাজাতেন, তিনি সহসা অসুস্থ হয়ে পড়ায় সকলেই চিন্তিত হয়ে উঠলেন। শিশিরকুমারের কাছে কে একজন চুপি চুপি জানিয়ে এল—যে সে ভাল অর্গ্যান বাজাতে পারে। শেষ পর্যন্ত সকলের অনুরোধে, আর নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের আদেশে সেদিন সে গানগুলির সঙ্গে অর্গ্যান বাজিয়ে সকলকে বিস্মিত করে তুলেছিল।

শেষ জীবনে স্টার থিয়েটারের সঙ্গে সে যুক্ত ছিল। এ ছাড়া বহু বাংলা ছায়াছবিতেও সে আত্মপ্রকাশ করেছে। টাইপ-চরিত্রে রূপদান করার তার অসামান্য ক্ষমতা ছিল। এক সময়ে সে ছিল মাস-মাইনের আর্টিস্ট।

১৯৬২ সালে তাকে আমি স্টার থিয়েটারে নিয়ে আসি। এর আগে সে আমার একাধিক নাটকে ও আমার পরিচালিত ছায়াছবিতে রূপদান করেছে। স্টার থিয়েটারে আসার কিছুকাল পরে এখানে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড চালু করা হয়। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের ফর্মে Nominee করার একটি নির্দিষ্ট জায়গা আছে। আমি ফর্মটি তার হাতে দিয়ে রহস্যচ্ছলে বলেছিলাম—'তিন কুলে তো কেউ নেই। কাকে Nominee করবে?' উত্তরে বলেছিল—'কেন? আমার ছেলেকে!'

—ছেলে?

—কেন? বিশ্বাস হল না? কালই নিয়ে আসব আমার ছেলেকে।

তার পরের দিনে সত্যিই একটি ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আমার ঘরে ঢুকল।

—এই দেখুন আমার ছেলে।

তার নির্দেশে ছেলেটি আমাকে প্রণাম করল। সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলাম—কি করো তুমি?

—এবার বি.এ পরীক্ষা দিয়েছি।

বেশ সপ্রতিভ ছেলে, দেখে ভারী ভাল লাগল। এ-কথা সে-কথার পর, সে তার মায়ের অনুমতি নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—'ছেলেটি কে?' বললে—'আমার এক প্রতিবেশীর ছেলে। ব্রাহ্মণ। ওর পৈতের সময় ওকে আমি ভিক্ষেপুত্র নিয়েছি। ওর বাবা-মা-ভাই-বোন সকলেই আমাকে খুব দেখা-শোনা করেন। কর্মটা আমার খারাপ হতে পারে, কিন্তু জন্মটা তো খারাপ নয়। ওর বাবা-মা আমার সব খবরই রাখেন! তাই ওর বাবা-মাকে বলেছি ও যেন আমার শেষ কাজ করে।'

সেদিন তার সব কথা শুনে বলেছিলাম, 'তোমাকে কুড়িয়ে এনে মানুষ করে তোমার মা তোমার জন্যে কম অশান্তি ভোগ করেননি। তুমিও কি শেষে পরের ছেলেটার জন্যে—'

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলেছিল—'ও মেয়ে নয়, ছেলে। মা মেয়ে নিয়ে ভুগেছিলেন। কিন্তু মা-র শেষ জীবনে আমি যদি না থাকতাম, মা-র কি হত বলুন তো?' সত্যি। ও না থাকলে ওর মা-র যে কি হত! দীর্ঘকাল ওর মা রোগভোগ করেছিলেন। কি সেবা-যত্নটাই না ও করেছিল! মায়ের শেষ কাজ করা, গয়ায় পিণ্ডদান করা, কি না করেছে ও। শেষে মায়ের নামে পাথর লিখে আদ্যাপীঠের মন্দিরেও প্রোথিত করে রেখেছে।

ছেলেকে নিয়ে আসার মাসখানেক পরে একদিন একবাক্স মিষ্টি হাতে নিয়ে ও আমার ঘরে ঢুকল। জিজ্ঞাসা করলাম—'কি ব্যাপার বার-ব্রত কিছু ছিল নাকি?'

মুখে হাসির রেখা টেনে বললে—'না, ছেলে পাস করেছে।'

ছেলের জন্যে তার চিন্তা-ভাবনার অন্ত ছিল না। পূজার আগে ছেলের জুতো জামা কাপড় কেনার জন্যে মহাব্যস্ত। পাছে ছেলে জানতে পারলে রাগ করে, তাই তাকে লুকিয়ে পূজার বেশ কিছুদিন আগেই কেনা-কাটাটা করে রাখত।

সেদিন ছিল থিয়েটারের দিন। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আমার ঘরে এসে ঢুকল। হাতে মিষ্টির বাক্স। বললাম—'কি ব্যাপার?' ছেলেটি আমাকে প্রণাম করে বললে—'আমার চাকুরি হয়েছে।'

—বাঃ! বাঃ! কোথায়?

—রাইটার্স বিল্ডিং-এ।

ছেলেটির সরকারী অফিসে চাকরি হয়েছে শুনে ভারি খুশি হলাম।

এর বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা। স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সলিলকুমার মিত্র আমাকে ডেকে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড অফিসের একটি চিঠি দেখালেন। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড অফিস থেকে জানানো হয়েছে

নমিনীর সঙ্গে আবেদনকারিণীর সম্পর্ক সম্বন্ধে 'ভিক্ষেপুত্র' কথাটা লেখা হয়েছে। কিন্তু কোর্টের এফিডেবিট্ সহ দলিল পেশ না করলে প্রকৃত ওয়ারিশান বলে গ্রাহ্য করা হবে না। সলিলবাবুর ঘর থেকে ফিরে এসে ওকে ডেকে পাঠিয়ে বললাম সব কথা। আমার কথা শুনে সে বেশ চিন্তিত হয়ে উঠল। বললে—'তাহলে এখন উপায়?' বললাম—'কোন উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবস্থা কর।' এর কিছুদিন পরে সে একদিন এফিডেবিটের কপি নিয়ে আমার ঘরে ঢুকল। এফিডেবিটে 'ভিক্ষেপুত্র'র ইংরেজী শব্দ করা হয়েছে, Foster-son.

না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না যে এই foster-son তার শেষ জীবনে কি সেবা-যত্নই না করেছে। শুধু ছেলে নয়, ছেলের পরিবারের সকলেই।

পরিণত বয়েসে তার পেটে একটা বিরাট অস্ত্রোপচার করা হয়। অভিনেতা-চিকিৎসক শ্রীযুক্ত শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজে তার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করে দেন। সুস্থ হয়ে ফিরে এসে আবার অভিনয় শুরু করে, কিন্তু মাস কয়েকের মধ্যে পুনরায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে ও দীর্ঘদিন রোগভোগ করে। তাকে দেখতে গিয়ে মনে হয়েছে তার পালিতা মা-র জন্যে সে যা করেছিল, তার ভিক্ষেপুত্তুরও তার জন্যে বড় কম করছে না। তাকে দেখতে গিয়ে ভারী খুশি হয়েছিলাম তার foster-son-এর সেবা-যত্নের ব্যবস্থা দেখে।

বেশ কিছুদিন হ'ল সংসারের সকল জ্বালা-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সে ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেছে, রেখে গেছে শিল্পীলোকের অসংখ্য অনুরাগী বন্ধুদের। আর স্মৃতির পটে লেখা আছে তার জীবন-কাহিনী যা অনেকের মাঝে অনন্য। শেষ জীবনের শেষ বাসনা ছিল, কোন ব্রাহ্মণ-সন্তান যেন তার মুখাগ্নি করে—সে আশা তার পূর্ণ হয়েছিল। তার ভিক্ষেপুত্র শুধু মুখাগ্নিই করেনি, সেই সঙ্গে সাড়ম্বরে পারলৌকিক ক্রিয়াও সম্পন্ন করেছিল।

কথা প্রসঙ্গে আমাকে একদিন বলেছিল, 'আমার জীবনের সব কথাই

তো আপনাকে বলেছি, আমি যখন থাকব না, তখন যদি ইচ্ছে হয় আমার জীবন-কাহিনী লিখবেন।' বলেছিলুম—'লিখব তোমার জীবন-কাহিনী। আর সঙ্গে একথাও লিখব জন্ম তোমার ব্রাহ্মণ-বংশে, কর্ম তোমার শিল্প-কীর্তিতে সমুজ্জ্বল।'

এতক্ষণ যাঁর জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করলাম, তার নামটা জানতে, পাঠকদের আগ্রহ হওয়াই স্বাভাবিক। তাই জানাচ্ছি—এই বিড়ম্বিত জীবন যাঁর—তিনি হচ্ছেন মঞ্চ ও চিত্র-জগতের সর্বজন-পরিচিতা অভিনেত্রী শ্রীমতী আশা দেবী। আর তার পালিতা মা সে যুগের সু-অভিনেত্রী শ্রীমতী হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)।

॥ অভিনেত্রী প্রভা—কবি প্রভা ॥

সে যুগের প্রথিতযশা অভিনেত্রী বিনোদিনীর সাহিত্য কীর্তির বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁর লেখা কবিতা, গান এবং সর্বোপরি তিনি যে আত্ম-জীবনী লিখে রেখে গেছেন, তা নাট্যশালার শতাব্দীর ইতিহাসে একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। অভিনেত্রী তিনকড়ির কিছু কিছু লেখাও সে যুগের পুরোন পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়। সাধারণ নাট্যশালার প্রথম যুগে যে চারজন অভিনেত্রী সর্ব-প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন তাঁদের অন্যতমা গোলাপসুন্দরী, পরবর্তীকালে বিবাহিতা জীবনে যিনি সুকুমারী দত্ত নামে পরিচিতা হন, তাঁর লেখা "অপূর্ব্ব সতী" নামে একখানি নাটক তৎকালীন সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হয়েছিল। কিন্তু এ যুগের এক প্রখ্যাতা অভিনেত্রীর বহু রচনা যে এক সময়ে "নাচঘর" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তার খবর আজকের দিনে অনেকেই হয় তো রাখেন না।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের অন্যতমা শিষ্যা ও সর্বজন অভিনন্দিতা অভিনেত্রী শ্রীমতী প্রভা দেবী যে এক কালে সাহিত্যচর্চা করে গেছেন,

তার খবর কেউ রাখেন কি? তাঁর অভিনয় প্রতিভার কথা আজও অনেকেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। অসংখ্য নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে তিনি যে রূপদান করে গেছেন, তা আজও অনেকেরই মনের মধ্যে গেঁথে আছে। কিন্তু তাঁর এই শিল্পী-মনের মাঝে যে আর একটি কবি-মন লুকিয়ে ছিল, তার খবর আজ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু কাগজের বুকে কালির আঁচড়ে যা লেখা হয়, কাল তাকে ধরে রাখে। কালক্রমে কেউ তাকে জনমানসের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে।

শ্রীমতী প্রভা দেবীর সঙ্গে সুদীর্ঘকাল নাট্যশালার কাজে একসঙ্গে কাটানোর সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। শিল্পী জীবনে তিনি যেমন অভিমানশূন্য ছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনেও ঠিক তাই। কত নাটকে একসঙ্গে কতদিন কাজ করেছি, অথচ কোনদিন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি, তাঁর রচনাশক্তির কথা। তাঁর মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পরে, পুরানো পত্র-পত্রিকা ঘাঁটতে ঘাঁটতে সহসা একদিন আবিষ্কার করে ফেললাম কবি প্রভা দেবীকে।

হেমেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত "নাচঘর" পত্রিকার ১৯৩৪-৩৫ সালের একাধিক সংখ্যায় তাঁর রচিত গান প্রকাশিত হয়েছে। এখানে তাঁর রচিত দু'টি গান উদ্ধৃত করছি।

ঐ বাজে তার চরণ ধ্বনি—
আর তো তারে ছাড়বো না!
হৃদয় দিয়ে হৃদয় নেবো—
হিয়ার-হিয়ার হার-বোনা!
লোকে যে যাই বলে বলুক—
অটল পাহাড় টলে টলুক—
উজান পানে মন-তরণী—
আর ফিরাতে পারবো না!
অলখ্ পথের পথিক আমি—
চল্‌বো সোজা—

সাথের সাথী করব আমার
স্মৃতির বোঝা—
নীলাকাশ আজ হোক না কাজল
আসুক না ঝড়। আসুক না জল
সুমুখ পানেই চাইবো শুধু—
পিছনের ধার ধারব না!

এই গানের মাধ্যমে তিনি যে কথা বলতে চেয়েছেন, আমি জানি, ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি সেই কাজই করে গেছেন। সারাজীবন তিনি শুধু সুমুখ পানে চেয়েই পথ চলেছেন। পেছনের ধার তিনি কোন দিনই ধারেননি।

মুক্ত তুমি নও তো—আমার
স্বপন-কারায় বন্দী-গো!
সেই স্বপনের কারাতে আজ
তোমায়-আমায় সন্ধি গো!
বিরহে আজ মিলন-প্রীতি
ছায় দুলিয়ে গোপন স্মৃতি
মন-মরুতে ফুটায় কুসুম
রঙীন ও সুগন্ধি গো!
ওগো কিসের তবে ভয়
যদি সুখ-বিছানো নিঝুম নিশায়
স্বপন সহায় হয়!
নাই বা যদি কও গো কথা
নাইকো ক্ষতি নাইকো ব্যথা
স্বপন-রূপী তুমিই হবে
আমার প্রতিদ্বন্দ্বী গো।

—এই গানটির মাধ্যমে একদিকে উচ্চভাব ও অন্যদিকে কবিত্ব-

শক্তি প্রকাশ পেয়েছে। এই সময়ে প্রভা দেবীর রচনাগুলি যখন একের পর এক "নাচঘরে" প্রকাশিত হচ্ছিল—সেই সময়ে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করতে থাকেন, এ প্রভা দেবীর রচনা কিনা ? সামান্যা একজন অভিনেত্রীর পক্ষে এমন রচনা সম্ভব কিনা ? ১৯৩৫ সালের ২৯শে চৈত্র, "নাচঘরের" একটি সংখ্যায় প্রভা দেবী "রহস্যের চাবি" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি প্রকাশের এখানে অবকাশ নেই। আমি সেই প্রবন্ধের কিছু কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। "কেউ কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, কবিতা লিখতে শিখলাম আমি কবে।

অবাক হয়ে পাল্টা শুধোই, কবিতা আবার কবে লিখলাম ? মাঝে মাঝে কাগজে আমার যে লেখা বেরোয়, সে কি কবিতা ?—সে তো গান।

এতেই যে পাপ চুকে গেল, তা নয়। তাঁরা আবার জিজ্ঞাসা করেন, গান লিখতেই বা কবে শিখলাম। * * * কিন্তু যাঁরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁরা তো কেউ ঘাস খান না যে, এ সোজা কথাটা তাঁরা বোঝেন না, * * * যাঁরা আমাকে ঐ সব কথা জিজ্ঞাসা করেন তাঁরা সকলেই যে আমাকে লক্ষ্য করেন, তা নয়। অনেকে আমাকে উপলক্ষ্য করে কথাগুলো অভিনেত্রী-সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রয়োগ করতে চান। তাঁরা মনে মনে বলেন, আমরা পতিতা—ছেলেবেলা থেকে আমরা শিখে আসছি কেবল বিলাস-বিভ্রম। হ্যাঁ আমরা পতিতাও বটে, পাতিতাও বটে। পেটের দায়ে বিলাস-বিভ্রম শিখতে হয় বৈ কি! পেট তো যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না! পেটের দায়ে, ভালো-মন্দের বিচার ফেলে রেখে, অনেক লোককে তো অনেক কিছুই করতে হয়। উকিল-ব্যারিস্টারদের মুখে শুনেছি—হ্যাঁ, উকিল-ব্যারিস্টার। আশ্চর্য হবার কারণ কী আছে ? গণ্যমান্য ভদ্রলোকদের পায়ের ধুলো পড়ে বৈকি আমাদের বাড়িতে। যদিও বা আমরা তাঁদের বাড়ি থেকে তাঁদের ডেকে আনতে যাইনে

কখনো। আর গেলেই বা আমাদের ঢুকতে দেবে কেন? গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে। কারণ, আমরা যে ভদ্র-পদ বাচ্যের বাইরে। কিন্তু তাঁরা এলে তাঁদের তো তাড়িয়ে দিতে পারিনে—তাঁরা যে ভদ্রলোক! হাঁ, যে কথা বলছিলাম, উকিল-ব্যারিস্টারদের মুখে শুনেছি যে তাঁদের ব্যবসার খাতিরে এমন অনেক কিছু করতে হয়, যা নাকি বাপ্-বেটায় একত্রে করতে লজ্জা বোধ করে। এত করেও কিন্তু তাঁরা এখনো লজ্জার মাথা একেবারে খেতে পারেননি। আমার মনে হয় কেউ কখনো খেতে পারে না—আমরাও না।

যাক্, পেটের দায়ে যে যা করে করুক গে! কিন্তু বিদ্যাচর্চার সঙ্গে আমাদের কি সত্য সত্যই ভাসুর-ভাদ্দর-বৌ সম্পর্ক? আমার তো তা মনে হয় না। বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী বহুমার্গগা, সে কথা এখানে নাইবা তুললাম! কিন্তু আবহমান কাল থেকে ললিত কলার চর্চা যাদের হস্তে ন্যস্ত হোয়ে এসেছে, কম্ হোক্ বেশী হোক্, খানিকটা উন্নতিও যারা সাধন কোরেছে তারা যে বিদ্যার কোন ধার ধারে না একথা বোল্তে বা ভাবতে কি সঙ্কোচ হয় না? তা যদি সত্য হোত, তা হোলে ললিত কলা দেশ থেকে অনেক দিনই লোপ পেত।

সাতকাণ্ড রামায়ণ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু সীতা কার ভার্য্যা সে-কথা এখনো বলা হয়নি। আমি কেন গান লিখি, তার সার্থকতাই বা কোথায়? তা ঠিক জানিনে! আমি শুধু বন থেকে ফুল কুড়িয়ে এনে অন্তরের দেবতাকে নিবেদন করি, বিদুরের খুদ্-কণাও যাঁর কাছে ফেলা যায় নি। * * *

সুদীর্ঘকাল পূর্ব্বে অভিনেত্রী প্রভা তাঁর রচনা সম্পর্কে, সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদের কাছে তাঁর "রহস্যের চাবি" প্রবন্ধে যে কথা ব্যক্ত করে গেছেন, তার মধ্যে যেমন অন্তর্বেদনা আছে, তেমনি আত্ম-তৃপ্তিও আছে। সত্যিই বিদুরের খুদ-কণার মত তাঁর সঙ্গীত-রচনাও ব্যর্থ হয়নি। ফেলা যায় নি। কাগজের বুকে আজও তা জ্বল্ জ্বল্ করছে।

॥ একটি স্মরণীয় কাহিনীর বরণীয় নায়ক অমরেন্দ্রনাথ ॥

বাংলা রঙ্গমঞ্চেব ইতিহাসে অনেকগুলি পৃষ্ঠা সগৌরবে অধিকার করে আছেন নট নাট্যকার ও পরিচালক স্বর্গত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। সাধারণ রঙ্গালয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে তাঁর শুধু অদম্য উৎসাহই ছিল না, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল অনন্য-সাধারণ। রঙ্গালয়ের উন্নতিকল্পে অকাতবে অজস্র অর্থব্যয় করে শেষ জীবনে তিনি নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিলেন। আজকের দিনে রঙ্গজগৎ সম্পর্কিত অজস্র পত্র-পত্রিকার আবির্ভাব হয়েছে, দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে, এই সকল পত্র-পত্রিকার প্রথম প্রবর্তক অমরেন্দ্রনাথ।

১৯০১ সালে অমবেন্দ্রনাথ 'রঙ্গালয়' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটিব অনুষ্ঠান-পত্রে অমবেন্দ্রনাথ লেখেন :

'নানাবিধ কাবণে প্রায় সমস্ত বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদকগণের কোপদৃষ্টিতে আমরা পড়িয়াছি। তাঁহাদেব নিকটে উৎসাহ পাওয়া তো দূরে থাক, প্রতি পদে পদদলিত হইবার আশঙ্কা। যদি প্রয়োজন হয়, উক্ত মহাত্মাগণের মনোবিরাগের কারণ আমরা পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে প্রমাণ করিব। আপাতত স্থানোপযোগী হইবে না বলিয়া বিরত হইলাম। অনেকে সংবাদপত্রে রঙ্গভূমির অভিনয় সমালোচনা পাঠ করিয়া দোষ-গুণের সত্যাসত্য বিচার করেন। হয়ত কোন সম্পাদক লিখিয়াছে : 'অমুক স্থানটি ভাল হয় নাই।' কেন ভাল হইল না, মন্দ কোনখানটায় এবং সংশোধন করিয়াই বা কিরূপ হইবে, সে সকল কথা কেই-বা বলে আর কেই-বা শোনে? অথচ আমাদের এমন কোনও উপায় নাই, যাহার দ্বারা প্রতিবাদ চলে। সে অভাব দূর করিবার জন্য এবং বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চসমূহ সর্বসাধারণে উপকার কি অপকার সাধন করিতেছে, আরও কি করিয়া অভিনয় করিতে হয়, কিরূপ শিক্ষায় উচ্চাঙ্গের অভিনেতা হওয়া যায়, রঙ্গালয়ের উন্নতি বা অবনতি ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় পর্যালোচনা করিবার উদ্দেশ্যে 'রঙ্গালয়' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিত রূপে ক্লাসিক থিয়েটার হইতে প্রকাশিত হইবে।'

উক্ত অনুষ্ঠান-পত্রে ঘোষণা করা হয়েছিল, ৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯০১ 'রঙ্গালয়ে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবে; কিন্তু পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১লা মার্চ ১৯০১।

এই পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে অমরেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহচর পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। পূর্ণচন্দ্র সাহিত্য-কর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত না হলেও লেখক হিসেবে তাঁর কিছু পরিচিতি ছিল। পূর্ণচন্দ্র আশা করেছিলেন, অমরেন্দ্রনাথ যখন পত্রিকা-প্রকাশে উদ্যত হয়েছেন, তখন সে পত্রিকার তিনিই সম্পাদক হবেন। কিন্তু ব্যবসায়ের দিকে বিবেচনা করে, অমরেন্দ্রনাথ সেযুগের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'রঙ্গালয়ে'র সম্পাদক নির্বাচন করেন। পূর্ণচন্দ্র এ ব্যাপারে অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং অমরেন্দ্রনাথের সংশ্রব ত্যাগ করে 'নবযুগ' নামে অপর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

পাঁচকড়িবাবুর সম্পাদনায় 'রঙ্গালয়' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলাদেশে একটা সাড়া পড়ে যায়। নাট্যামোদীরা অত্যন্ত উৎসাহিত বোধ করেন। 'রঙ্গালয়' পত্রিকা প্রকাশের দিন হকারদের কাছে কাগজ কেনার জন্য তাড়াহুড়ো পড়ে যেত। প্রত্যেকটি সংখ্যা ছাপতে খরচ পড়ত ছ' পয়সা, আর বিক্রী হত মাত্র দু'পয়সায়, বার্ষিকমূল্য ছিল মাত্র আড়াই টাকা। আর্টপেপারে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ছবি ছাপানো হত। জনসাধারণ পত্রিকাকে সাদরে গ্রহণ করায় অমরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। লাভ-লোকসানের কথা তিনি বিচার করলেন না। পত্রিকার মাধ্যমে নাট্যশালাগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠুক, দিন দিন নাট্যশালায় দর্শক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাক—এইটেই ছিল তাঁর ঐকান্তিক কামনা। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, সে যুগে তিনি 'রঙ্গালয়ে'র গ্রাহক-সংখ্যা একলক্ষ করার বাসনায় 'রঙ্গালয়ে'র গ্রাহকদের গিরিশ-গ্রন্থাবলী, অমর-গ্রন্থাবলী, প্রভৃতি উপহার দেবার ব্যবস্থা করেন। শুধু তাই নয়, রঙ্গালয়ের গ্রাহকদের বছরে একদিন পত্রিকার চাঁদার রসিদ দেখিয়ে ক্লাসিক থিয়েটারে নাটকের অভিনয় দেখার সুযোগ করে দেন। ফলে

গ্রাহক-সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। শেষে এমন হল যে কেউ যদি বছরের প্রথমেই গ্রাহক না হয়ে দু'চার মাস পরে 'গ্রাহক হতেন, তাঁদের আর পুরনো সংখ্যাগুলি দেওয়া সম্ভব হত না। ফলে অমরেন্দ্রনাথ পত্রিকা মারফৎ ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন, যিনি যে-সংখ্যা থেকে গ্রাহক হবেন, তিনি সেই সংখ্যা থেকেই পুরো এক বছরের কাগজ পাবেন। অমরেন্দ্রনাথের গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধি করার এই প্রচেষ্টাকে কটাক্ষ করে সে যুগের এক বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র লিখেছিলেন—'কালে কালে কতই দেখিব আর কতই হইবে। সংবাদপত্রের গ্রাহক বৃদ্ধির চেস্টায় কোন সংবাদপত্র প্রথমে পুস্তক ও ছবি উপহার দিয়েছিলেন, এখন আবার বিনামূল্যে থিয়েটার দেখাইতেছে।' কিন্তু এ সব তীক্ষ্ণ সমালোচনায় অমরেন্দ্রনাথকে কেউ টলাতে পারেনি।

'রঙ্গালয়' পত্রিকা প্রকাশের জন্য তাঁকে ঘর থেকে বহু টাকা ব্যয় করতে হয়েছিল। তবে বহু গ্রাহক হওয়ায় আর সেই সঙ্গে বেশ কিছু বিজ্ঞাপন পাওয়ায়, ঋণের দায়ে তাঁকে দেউলিয়ার খাতায় নাম লেখাতে হয়নি।

অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার চালানোর ব্যাপারে সব সময় ব্যস্ত থাকতেন। নাটক রচনা, নাটকের মহলা দেওয়া, নিজে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করা, থিয়েটারের প্রচার-কার্য চালানো এবং সর্বোপরি থিয়েটারের আয়-ব্যয় প্রভৃতির হিসাব-নিকাশের ব্যাপারে অধিকাংশ সময়েই তিনি ব্যস্ত থাকতেন। 'রঙ্গালয়' পরিচালনার ব্যাপারে সময় দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। এইভাবে প্রায় চার বৎসর 'রঙ্গালয়' চলার পর, অমরেন্দ্রনাথকে নানারকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হল। ক্রমাগত গ্রাহকদের কাছ হতে অভিযোগ আসতে লাগল, তাঁরা নিয়মিত কাগজ পাচ্ছেন না, কাগজ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে না, ইত্যাদি। অমরেন্দ্রনাথ নিজেকে বড় বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। শেষে পাঁচকড়িবাবুকে ডেকে একদিন বললেন—'আমি আর 'রঙ্গালয়' প্রকাশের কোন ব্যাপারে থাকতে পারব না। এত অনুযোগ-অভিযোগ আমার আর সহ্য হচ্ছে না। কাগজ

আমি ভুলে দেব। তবে আপনি যদি সমস্ত দায়-দায়িত্ব ও ঝুঁকি নিয়ে কাগজ চালাতে চান তো চালাতে পারেন। কিন্তু দেখবেন, গ্রাহকদের কোন অভিযোগ যেন আমাকে শুনতে না হয়। যদি প্রয়োজন হয়, টাকা আমি দেব। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। এর বেশী আমার কাছে আর কিছু আশা করবেন না।' যাই হোক, এরপর পাঁচকড়িবাবু নিজ দায়িত্বেই কাগজ চালাতে লাগলেন। দরকার হলেই মধ্যে মধ্যে অমরেন্দ্রনাথ টাকা দিতেন। এইভাবে চার বছর কাগজ চালানোর পর অমরেন্দ্রনাথ হিসেব করে দেখলেন তাঁর ষাট হাজার টাকা লোকসান গেছে।

অমরেন্দ্রনাথ কোন ব্যাপারেই অর্থব্যয় করতে কার্পণ্য করতেন না। 'রঙ্গালয়' প্রকাশ এই ষাট হাজার টাকা লোকসানের জন্যে তিনি বন্ধ করে দিলেন না। এর মধ্যে তাঁকে দুটি মানহানির মামলার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যার ফলে, তিনি পত্রিকা-প্রকাশের কাজে বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিলেন।

ইতিপূর্বে অমরেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহচর পূর্ণচন্দ্র গুপ্তের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি আক্রোশবশতঃ তাঁর 'নবযুগ' পত্রিকায় অমরেন্দ্র-নাথের 'রঙ্গালয়' পত্রিকা, তথা পাঁচকড়িবাবুকে আক্রমণ করে ক্রমাগত প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন। অমরেন্দ্রনাথ যে বন্ধুকে একদিন নানাভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁর এ অসৌজন্যমূলক ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে শেষে পাঁচকড়িবাবুকে দিয়ে পূর্ণবাবুর বিরুদ্ধে এক মানহানির মামলা রুজু করেন। আর অপর মামলাটি হয় 'বসুমতী' পত্রিকার উপন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। উপেন্দ্রবাবুর সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। একদিন উপেন্দ্রবাবু তাঁর কাগজে ক্লাসিক থিয়েটারের মঙ্গল কামনা করে লিখেছিলেন—'অমর নাট্যশালা নামে স্থায়ী নাট্যশালা স্থাপিত হউক।' শেষে অমরেন্দ্রনাথের উপর তিনি বিরূপ হয়ে উঠলেন। 'বসুমতী' পত্রিকায় যেমন 'রঙ্গালয়ে'র বিরুদ্ধে লেখা বেরুতে লাগল, তেমনি 'রঙ্গালয়' ও 'বসুমতী'র বিরুদ্ধে লিখতে লাগলেন। শেষে 'রঙ্গালয়ে' উপেনবাবুর এক কার্টুন চিত্র প্রকাশিত হওয়ায়, উপেন্দ্রবাবু

'রঙ্গালয়ে'র বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনয়ন করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপেন্দ্রবাবু ও অমরেন্দ্রবাবুর এক শুভানুধ্যায়ী বন্ধুর চেষ্টায় মামলাটি আপসে মিটে যায়। কিন্তু পূর্ণবাবুর বিরুদ্ধে পাঁচকড়িবাবু যে মামলা করেন, তার শুনানী দীর্ঘকাল ধরে চলে এবং শেষ পর্যন্ত নিম্ন-আদালতে পূর্ণবাবুর কারাদণ্ড হয়। পূর্ণবাবু হাইকোর্টে আপীল করেন। হাইকোর্টের মামলার খরচ যোগাতে পূর্ণবাবুকে শেষপর্যন্ত ঋণগ্রস্ত হতে হয়।

হঠাৎ একদিন পূর্ণবাবু ক্লাসিক থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথের ঘরে এসে হাজির। অমরেন্দ্রনাথ তাঁকে দেখে সমাদরে বসালেন। থিয়েটার দেখতে এসেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে পূর্ণবাবু জানালেন, তিনি থিয়েটার দেখতে আসেন নি, এসেছেন ক্ষমা চাইতে। অমরেন্দ্র-নাথ পূর্ণবাবুকে আশ্বস্ত করে বলেন—'বেশ তো, এখুনি, এই রাত্রেই মিটমাট হয়ে যাক।' এই কথার পর পূর্ণবাবু সজল নেত্রে তাঁর দুর্দশার কথা ব্যক্ত করে জানালেন,—মামলা চালাতে গিয়ে আজ একবছরের ওপর তিনি বাড়ি-ভাড়া দিতে পারেননি। সপরিবারে পথে দাঁড়াবার অবস্থা। বন্ধুর কথা শুনে, অমরেন্দ্রনাথেরও চোখে জল এল। তৎক্ষণাৎ থিয়েটারের বুকিং-অফিস থেকে সেদিনের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত টাকা আনিয়ে তিনি পুরাতন বন্ধুর হাতে তুলে দিলেন।

অমরেন্দ্রনাথের কর্মবহুল জীবনের অনেক স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে এ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।